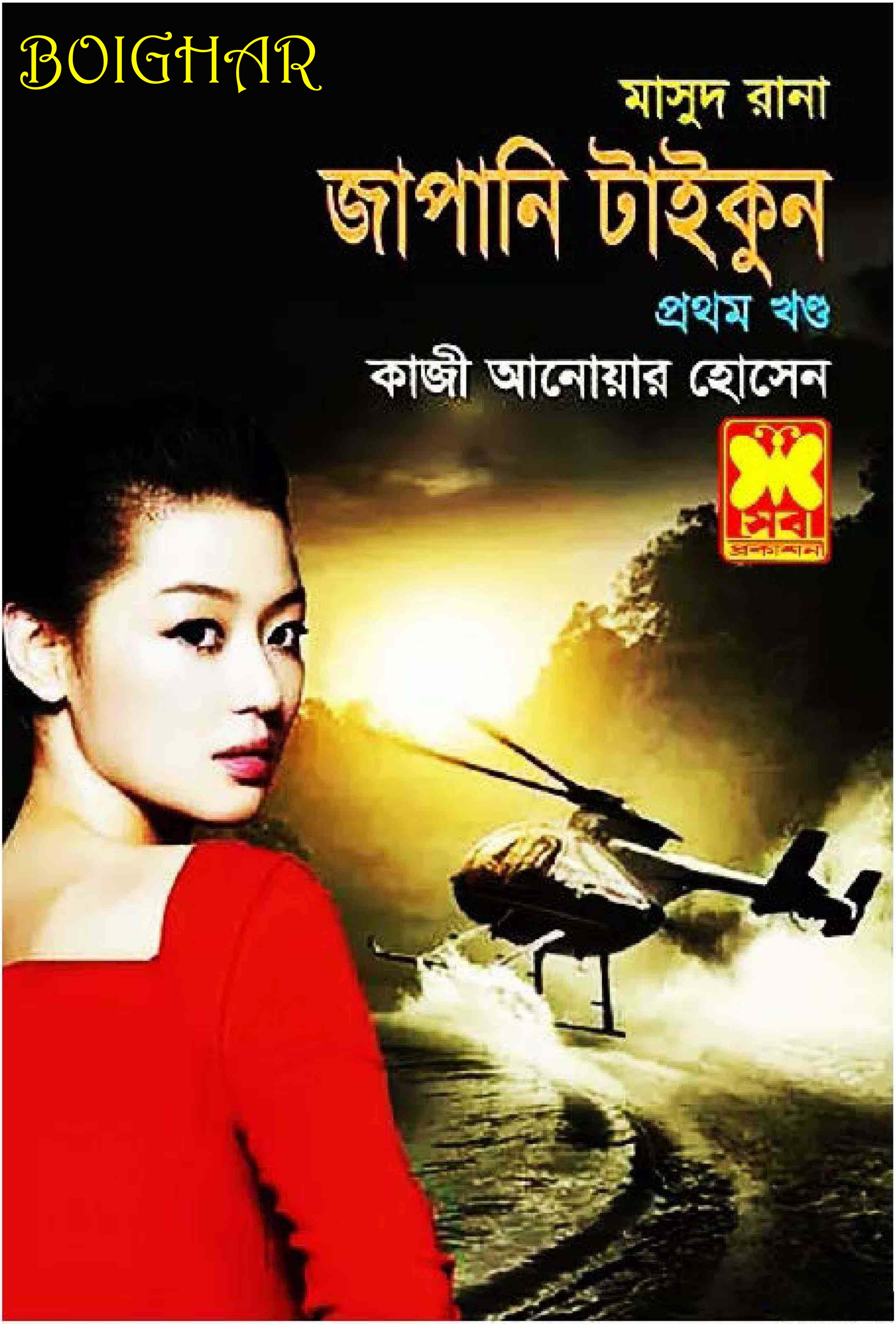

BOIGHAR
মাসুদ রানা
জাপানি টাইকুন
প্রথম খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০১৪

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ইসমাইল আরমান

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি ও বক্স ৮৫০
mail. alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭১৮-১৯০২০৩

সেবা প্রকাশনী

পঁচানব্বই টাকা

Masud Rana-436
JAPANI TYCOON
Part-I
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বি. দ্রঃ বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

এক

দুহুয়ো অকশন হাউস। প্যারিস, ফ্রান্স।

কারুকাজ করা রোস্টামের উপরে ঠকাস করে নেমে এল নিলাম-পরিচালকের হাতুড়ি। 'সোল্ড! সাতচল্লিশ হাজার ফ্রাঁ-র বিনিময়ে বিডার নাম্বার একশো আটাশ পেলেন আইটেমটা!'

মেঝে থেকে সামান্য উঁচু একটা মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, পাশে রয়েছে সুন্দরী তরুণী অ্যাসিসটেন্ট—উঁচু করে ধরে রেখেছে একটা প্রাচীন বই। মঞ্চের একপাশে ডিজিটাল বোর্ডে ভেসে উঠছে প্রতিটি বিডের এক্সচেঞ্জ রেট। বইটা যে প্রায় সাত হাজার ডলার দিয়ে কিনে নেয়া হয়েছে, তা জানতে পারছে সবাই... কিন্তু জানতে পারছে না ক্রেতার পরিচয়। অকশন হাউসেরই এক কর্মচারী প্লেস করেছে বিডটা, অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির হয়ে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এ-ধরনের নিলাম অনুষ্ঠানে অনেকের পক্ষেই অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না—হয় ব্যস্ততার কারণে, কিংবা গোপনীয়তা রক্ষার জন্য। কমিশনের বিনিময়ে অকশন হাউসের লোকেরা তাদের প্রক্সি হিসেবে নিলামে অংশ নেয়। এ-ধরনের বেশ ক'জন প্রতিনিধি বসে আছে জুরি-বক্সের মত একটা তিনদিক-ঘেরা বুথে—প্রত্যেকের সামনে রয়েছে একটা করে টেলিফোন ও ইন্টারনেট কানেকশন-সহ কম্পিউটার। বুথটাকে বাদ দিলে বাকি

হলঘরের পুরোটা জুড়ে রয়েছে গদিমোড়া সারি সারি চেয়ার—সশরীরে যে-সব ক্রেতা উপস্থিত হয়েছেন, তাঁদের বসবার জন্য।

প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য বইয়ের নিলাম চলছে আজ—তিনদিন-ব্যাপী বিশেষ নিলামের প্রথম দিন, আয়োজন করেছে নামকরা এক অ্যান্টিক লাইব্রেরি। আজকের স্টকে রাখা হয়েছে শিল্প-বিপ্লবের সময়কার বিভিন্ন বই ও নথিপত্র... দিনের শিরোনাম রাখা হয়েছে: *প্যাট্রিয়ার্কস্ অভ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এইজ।* আগামীকাল বিক্রি করা হবে রেনেসাঁ পিরিয়ডের বিভিন্ন আইটেম—ওগুলোই নিলামের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। প্রাচীন কয়েক কপি বাইবেল আর লিয়োনার্দো দা ভিঞ্চির স্বহস্তে লেখা একটা খাতা থাকবে ওতে, আশা করা হচ্ছে জিনিসগুলো কয়েক মিলিয়ন ডলারে বিকোবে।

পরবর্তী আইটেমটা মঞ্চে ওঠানোর আগে সামান্য বিরতি পড়ল নিলামে। হলঘর ভরে গেল আগ্রহী ক্রেতাদের গুঞ্জনে। ভেজা জুতোর মচমচ আওয়াজটা চাপা দেবার জন্য এই সময়টাই বেছে নিল মাসুদ রানা। সহজ পদক্ষেপে ঢুকে পড়ল হলঘরে। বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে দিল না। অবশ্য দোষটা ওর নয়। অসময়ের বৃষ্টিতে আক্রান্ত হয়েছে প্যারিস। অফিস থেকে বেরুবার সময়ও আকাশ পরিষ্কার ছিল, ছাতা বা রেইনকোটের প্রয়োজন বোধ করেনি ও। কিন্তু মাঝপথেই নামল তুমুল বর্ষণ। পার্কিং লটে গাড়ি রেখে অকশন হাউসে ঢুকতে ঢুকতেই ভিজে গেছে জামা-জুতো। রিসেপশনে ওভারকোটটা রেখে এসেছে, কিন্তু জুতো তো আর রেখে আসা যায় না!

নতুন একটা বই নিয়ে এসেছে তরুণী মেয়েটা, প্রজেক্টরের সাহায্যে মঞ্চের পিছনের স্ক্রিনে ওটার ছবি ভেসে উঠল। গুঞ্জন থামিয়ে ওদিকে মনোযোগ দিল ক্রেতারা। ফাঁকা একটা চেয়ার

বেছে নিয়ে বসে পড়ল রানা। মুহূর্তের জন্য চোখাচোখি হলো নিলাম-পরিচালক দুভাঁ-র সঙ্গে, ওকে দেখতে পেয়ে মৃদু হাসল সে, মাথা ঝোঁকাল। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে ফের শুরু করল তার সেলসম্যানসুলভ ভাষণ।

রানার পুরনো বন্ধু এই অগাস্ত দুভাঁ। নুমার উপদেষ্টা ও রানার আরেক বন্ধু সাগর-বিশারদ বিউ মরটনের সূত্রে তার সঙ্গে পরিচয়। দুভাঁর মাধ্যমেই ইয়োরোপ থেকে বেশিরভাগ পুরনো বইপত্র সংগ্রহ করে মরটন। কয়েক দফায় রানাকেও বেশ কিছু বই ও আর্টিফ্যাক্ট জোগাড় করে দিয়েছে সে। মাঝে একবার মস্ত বিপদে পড়েছিল দুভাঁ, কিডন্যাপ হয়ে গিয়েছিল তার এক বাচ্চা, তখন রানাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার করে তাকে। সেই থেকে দু'জনের মধ্যকার সম্পর্কটা গাঢ় হয়েছে আরও, রানার জন্য কিছু করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করে সে।

বন্ধুত্বের খাতিরে আজ রানাকে আসতে হয়েছে দুহুয়ো অকশন হাউসে—এক বন্ধুর অনুরোধে আরেক বন্ধুর কাছে। রানার কলেজ জীবনের বন্ধু আলী হায়দার, বর্তমানে নামকরা আর্কিয়োলজিস্ট, অনেকদিন থেকে সেন্ট্রাল আমেরিকার পানামায় একটা এক্সপিডিশন চালাচ্ছে—খুঁজে বেড়াচ্ছে ইনকা সাম্রাজ্যের লুকানো গুপ্তধন। সেই এক্সপিডিশনের জন্য প্রাচীন কিছু বই আর জার্নালের প্রয়োজন, রানাকে অনুরোধ করেছিল জোগাড় করে দেবার জন্য, রানাও কথাটা জানিয়ে রেখেছিল দুভাঁকে। অবশেষে তেমন একটা জার্নালের খোঁজ পাওয়া গেছে—গুদাঁ দু লিপিনে নামে আঠারো শতকের এক ফরাসি ইঞ্জিনিয়ারের ব্যক্তিগত ডায়েরি ওটা। পানামা খাল খননের ব্যর্থ ফরাসি প্রজেক্টের একজন ডিজাইনার ছিলেন ইনি। ওই এলাকা নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছিলেন ভদ্রলোক, সার্ভে করেছিলেন কয়েক হাজার বর্গমাইল। হায়দারের ধারণা, তাঁর ডায়েরিতে ওর

অনুসন্ধানে সহায়ক হবার মত প্রচুর তথ্য পাওয়া যাবে। আজ ডায়েরিটা নিলামে উঠবে—এ-খবর রানাকে দিয়েছে দুভাঁ। কাকতালীয়ভাবে রানাও এই সময়টাতেই প্যারিসে এসেছে ফ্রান্সে ওর ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির একটা নতুন শাখা খুলবার কাজ নিয়ে। খবর পেয়ে নিজেই চলে এসেছে নিলাম থেকে ওটা কিনে নেবে বলে।

রিসেপশন থেকে একটা ক্যাটালগ গুঁজে দেয়া হয়েছে হাতে, চেয়ারে হেলান দিয়ে তাতে চোখ বোলাল রানা। চকিতে পর্দায় চোখ বুলিয়ে লট নম্বর দেখে নিল। নিলামের অর্ধেকটা পেরিয়ে গেছে, তাতে সমস্যা নেই। ও যেটার জন্য এসেছে, সেটার সিরিয়াল আরও অনেক পরে। এ-মুহূর্তে বিখ্যাত ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার ফার্দিনান্দ দু লিসপস্-এর একটা ব্যক্তিগত ডায়েরি ওঠানো হয়েছে মঞ্চে। মিশরের সুয়েজ ক্যানাল তৈরি করেছিলেন এই ভদ্রলোক, এরপর ১৮৭৯ সালে হাতে নিয়েছিলেন পানামা খাল তৈরির দায়িত্ব। সেণ্ট্রাল আমেরিকায় সুয়েজের মত সাফল্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইনভেস্টরদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন বিশাল অঙ্কের অর্থ, কিন্তু কয়েক বছরের প্রচেষ্টার ফলাফল হিসেবে তেইশ হাজার শ্রমিকের মৃত্যু আর পুরো ফ্রান্সের অর্থনীতিকে টালমাটাল করে দেয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারেননি তিনি শেষ পর্যন্ত।

ডায়েরিটা আজকের নিলামের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আইটেমগুলোর একটি। আশা করা হচ্ছে বিশ হাজার ডলার দাম উঠবে ওটার—দুভাঁর কাছে তেমনটাই শুনেছে রানা। ক্যাটালগ বন্ধ করে সামনে মনোযোগ দিল ও। চোখ বোলাল অন্যান্য বিডারদের উপর। সবার ভিতরে এক ধরনের চাপা ক্ষোভ লক্ষ করল, কিন্তু তার কারণটা বুঝতে পারল না।

'বাষট্টি নম্বর আইটেম,' গমগমে গলায় লটের পরিচিতি

দিতে শুরু করেছে দুভাঁ। 'একশো সত্তর পৃষ্ঠার একটি ব্যক্তিগত জার্নাল—মালিক ফার্দিনান্দ দু লিসপস্। পানামা প্রজেক্টের সময়ে তাঁর স্বহস্তে লেখা দিনপঞ্জি। মেরুন রঙের চামড়ায় মোড়া খাতাটা চমৎকার কণ্ডিশনে পাচ্ছেন আপনারা...' একে একে ডায়েরির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে গেল সে। তার কথার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পিছনের পর্দায় ভেসে উঠল ওটার বিভিন্ন পৃষ্ঠার ছবি। সবশেষে বলল, 'পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ থেকে বিডিং শুরু করব আমরা। আছেন কেউ?'

একশো আটাশ নম্বর বিডারের প্রক্সি সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল। ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া করে উঠল বাকিরা, হলঘর ভরে গেল গুঞ্জনে। খানিক বাদেই তাদের ক্ষোভের কারণ পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে। শুরু থেকেই নিলামে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে অচেনা ওই বিডার। প্রতিটা আইটেম কিনে নিচ্ছে অস্বাভাবিক দাম হেঁকে। তার পাগলামির সঙ্গে পেরে উঠছে না কেউ, বসে থাকতে হচ্ছে খালি হাতে। লোকে খেপবে না কেন! রানার চোখের সামনেই মাত্র এক মিনিটের ভিতরে ডায়েরিটার দাম ত্রিশ হাজার ডলারে উঠে গেল, স্রেফ লোকটার একরোখামির কারণে। এরপরেও লেগে রইল কয়েকজন—সম্ভবত খেপে গিয়ে জিনিসটার দাম বাড়িয়ে চলেছে তারা... কিনতে না পারুক, রহস্যময় বিডারের পকেট থেকে যতটা পারে টাকা খসিয়ে মনের জ্বালা মেটাতে চায়। বিড পঞ্চাশ হাজারে পৌঁছুনোর পর প্রক্সিকেও বিব্রত হতে দেখা গেল, প্রাক্কলিত মূল্যের আড়াই গুণ হেঁকে নিজেই বোধহয় লজ্জিত।

শেষ পর্যন্ত রইল মাত্র দু'জন—রহস্যময় বিডার আর টেক্সাসের এক তেল-ব্যবসায়ী। মাঝবয়েসী টেক্সানকে চেনে রানা, বছরখানেক আগে আমেরিকার আরেকটা নিলামে দেখা হয়েছিল। স্রেফ টাকার কুমির নয়, লোকটা পড়াশোনাও করে।

লিসপসের জার্নালটা কিনতে চাইছে সত্যিকার বইপ্রেমী হিসেবে। কিন্তু বিড যখন পঁচাত্তর হাজারে পৌঁছুল, হতাশায় মাথা নাড়তে বাধ্য হলো... এই পাগলামি চালিয়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। ক্ষান্ত দিল সে।

'সোল্ড!' হাতুড়ি ঠুকে ঘোষণা করল দুভাঁ। কিন্তু বড় ধরনের বেচাকেনার পর যে-ধরনের উত্তেজনা দেখা যায় দর্শকদের মাঝে, তার ছিটেফোঁটাও লক্ষ করা গেল না কারও মাঝে। একশো আটাশ নম্বর বিডারের প্রক্সি মাথা নিচু করে ফেলল, ক্রুদ্ধ ক্রেতাদের দৃষ্টি এড়াতে চায়।

'বিশ মিনিটের বিরতি নেব আমরা,' সবার উদ্দেশে বলল দুভাঁ। 'বাইরের ফয়েই-এ শ্যাম্পেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, আপনারা আমন্ত্রিত।'

ভিড়ের সঙ্গে মিশে হলঘর থেকে বেরিয়ে এল রানা। ট্রে নিয়ে ওয়েইট্রেস এগিয়ে এলে একটা গ্লাস তুলে নিল, তারপর চলে গেল ফয়েই-র একপাশে। অপেক্ষা করতে থাকল দুভাঁর জন্য। খানিক পরেই উদয় হলো সে, কিন্তু রানার কাছে আসার আগে সৌজন্য বিনিময়ের জন্য থামল পূর্ব-পরিচিত ক্রেতাদের সামনে। কিছু মনে করল না রানা, কাজটা দুভাঁর পেশার অংশ... নামী-দামি লোকজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হয় তাকে। সব ছেড়েছুড়ে ওর কাছে ছুটে আসবে, এমনটা আশা করা অন্যায়। শ্যাম্পেনে অলস ভঙ্গিতে চুমুক দিতে থাকল ও।

মিনিট পাঁচেক পর দুভাঁকে এগিয়ে আসতে দেখল রানা। সামনে এসে লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'সরি, *মঁন দিউঁ*, তোমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি।' রানার চেয়ে ইঞ্চিদুয়েক লম্বা সে, নাদুসনুদুস। মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। চেহারা হাসিখুশি।

'আমি কিছু মনে করিনি,' হালকা গলায় বলল রানা। 'আমার

অফিসে গেলে তোমাকেও ওয়েইটিং রুমে অপেক্ষা করতে হতো।'

হেসে ফেলল দুভাঁ। 'তোমার সেন্স অভ হিউমার দেখছি আগের মতই আছে। কেমন আছ?'

'ভাল।'

'তা তো বুঝতেই পারছি। দিন দিন বয়স যেন কমছে তোমার! এমন ফিট থাকবার রহস্যটা কী?'

'তোমার বউয়ের মত পাকা কোনও রাঁধুনিকে বিয়ে না করা,' বলল রানা। 'ওর রান্না খেয়ে খেয়ে তো দেখছি শরীরটা গোলআলু বানিয়ে ফেলছ!'

'আর তুমি কার রান্না খাও?'

'নিজের। রান্নার কিচ্ছু জানি না আমি, কাজেই দু'চামচের বেশি মুখে তোলা যায় না। ফিট থাকবার রহস্য ওটাই—অল্প আহার!'

আবারও হাসল দুভাঁ। 'নাহ্! তোমার সঙ্গে কথায় পারা যাবে না।'

'এখানে হচ্ছেটা কী?' প্রসঙ্গ পাল্টাল রানা। 'সবাইকে বেশ খ্যাপা মনে হলো?'

'হবে না কেন? কেউ যদি একাই নিলামের সব আইটেম কিনে নেয়...'

'প্রক্সিকে দেখলাম। আসল লোকটা কে?'

'জনৈক জাপানি ধনকুবের। পরিচয় জানি না। ছোটখাট একটা রহস্য বলতে পারো তাকে। কেন যেন লোকটা পানামা ক্যানালের ব্যাপারে আগ্রহী। অকশনের আগেই সমস্ত আইটেম গোপনে কিনে নেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সফল হয়নি। তাই এখানে হানা দিয়েছে। অবস্থা তো দেখেছ... ক্যানালের সঙ্গে সামান্যতম সম্পর্ক থাকলেই প্রতিটা আইটেম কিনে নিচ্ছে

আকাশছোঁয়া দামে। আমার রেগুলার ক্লায়েন্টরা কিচ্ছু পাচ্ছে না। এই অবস্থা চলতে থাকলে আজ খালি হাতেই ফিরতে হবে সবাইকে।'

শঙ্কার ছায়া পড়ল রানার চেহারায়। লিপিনে-র ডায়েরিটাও পানামা ক্যানালের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ওটার দিকেও হাত বাড়াবে না তো ওই রহস্যময় বিডার?

'আরে, আরে, তুমি আবার দুশ্চিন্তা করছ কেন?' তাড়াতাড়ি বলল দুভাঁ। 'আমি আমার কথা রাখব—লিপিনে-র জার্নালটা তুমিই পাচ্ছ। আর কেউ ওতে হাত দিতে পারবে না।'

'ধন্যবাদ, দুভাঁ,' বলল রানা। 'কিন্তু আমি চাই না তুমি নিয়ম ভেঙে আমার জন্য কিছু করো।'

'আমি কোনও নিয়ম ভাঙছি না,' বলল দুভাঁ। 'অকশনের প্রতিটা আইটেমের রিজার্ভ প্রাইস আছে, বাছাই করা কিছু আইটেমের ক্ষেত্রে ওই দামে সরাসরি বিক্রি করার অধিকারও রাখি আমি। তা ছাড়া লিপিনে-র জার্নালটা এমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ আইটেম নয়, রিজার্ভ প্রাইসে বিক্রি করলে অকশন হাউস বা মূল মালিক মোটেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তাই আজকের প্রসিডিংস শুরু হবার আগেই আমি সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি, ওটা নিলামে উঠছে না। এখন তুমি রিজার্ভ প্রাইসটা মিটিয়ে দিলেই ওটার মালিক হতে পারো।'

'অ্যামাউন্টটা কত?'

'বেশি না। চার হাজার ডলার।'

'সত্যি?' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'কমিয়ে বলছ না তো?'

'কমিয়ে বলব কেন? আসলেই চার হাজার ডলার।' হলঘরের ভিতর থেকে ঘণ্টা বেজে ওঠায় ঘাড় ফেরাল দুভাঁ। 'আমাকে এবার যেতে হয়, রানা। নিলামের পরে দেখা করে ডায়েরিটা নিয়ে যেয়ো।'

'কী বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাব...'

'ও কিছু না,' মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল দুভাঁ। 'তোমার জন্য কিছু করতে পারলে আমি খুশিই হই। আসি তা হলে।'

রানাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে চলে গেল সে। পকেট থেকে নিজের সেলফোন বের করল রানা। স্মৃতি থেকে একটা নাম্বার ডায়াল করল। ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ হয়ে কানেকশন পেতে পুরো এক মিনিট লেগে গেল। দু'বার রিং হবার পর কলটা রিসিভ করা হলো।

'হোলা?' শোনা গেল নারীকণ্ঠ।

'হাই, কারমেন! রানা বলছি।'

'ওঅট আ প্লেয্যান্ট সারপ্রাইজ, রানা!' ল্যাটিন উচ্চারণে বলল মেয়েটি। 'কোথায় তুমি?'

কারমেন কপোলা পানামার মেয়ে, আলী হায়দারের স্ত্রী। মাসছয়েক হলো বিয়ে হয়েছে ওদের। এক্সপিডিশনে গিয়েই ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে হায়দারের, ফলাফল প্রেম-পরিণয়। ইমেইলে পাঠানো ছবিতে মেয়েটাকে দেখেছে রানা, এখন পর্যন্ত সামনাসামনি সাক্ষাৎ হয়নি.. তবে টেলিফোনে আলাপের সূত্রে ভাল সখ্য গড়ে উঠেছে।

'আমি প্যারিসে ' বলল রানা। 'হায়দার কি আছে আশপাশে? ওর জন্য একটা সুসংবাদ আছে।'

'না, রানা। ও এখন দারিয়েন প্রভিন্সে... এল্ রিয়ালের দক্ষিণে।' একটু বিরক্তি ঝরল কারমেনের গলায়। এক্সপিডিশনের কাজে প্রায়ই বাইরে থাকে হায়দার, সেটা ওর পছন্দ নয়। 'আবারও ওই নদীর ধারে গেছে। গত তিন সপ্তাহে ওর চেহারা দেখিনি আমি '

'যোগাযোগ করতে পারবে ওর সঙ্গে?'

‘তা পারব। বলতে গেলে রোজই রেডিওতে কথা হয়। আজও ঘণ্টাখানেক পরে হবে।’

‘ওকে বোলো, লিপিনে-র জার্নালটা আমি পেয়ে গেছি। কালই ওটা পাঠিয়ে দেব ওর কাছে।’

‘তা-ই?’ বলল কারমেন, খুব একটা উচ্ছ্বসিত মনে হলো না কণ্ঠটা। ‘পাঠিয়ে দেবে? নিজে আসবে না? হায়দার তো কবে থেকেই বলছে!’

‘আমি আসলে খুব ব্যস্ত, কারমেন,’ বলল রানা। ‘হাতে একদম সময় নেই। কথা দিচ্ছি, ছুটি পেলেই বেড়াতে আসব...’

‘এ-কথা শুনতে শুনতে কান পচে গেল। যেদিন সত্যি সত্যি আসবে, সেদিন বিশ্বাস করব। আসলে... আমার তো আর কিছু না, তোমার বন্ধুই পাগল হয়ে উঠেছে তোমাকে আনার জন্য। শেষবার যখন কথা হলো, ওকে বেশ উত্তেজিত মনে হয়েছে। বলল তোমাকে দেখাবার মত কী নাকি পেয়েছে। আমাকে বলে দিয়েছে, তুমি ফোন করলে যেন কথাটা বলি।’

‘তা-ই? ও চাইছে আমি ওর এক্সপিডিশন এরিয়ায় যাই?’

‘হ্যাঁ। আমাকে বলেছে তুমি এলে নিয়ে যেতে। জায়গাটা আমার চেনা। হায়দার কী নিয়ে দিনরাত খাটছে, দেখতে চাইলে চলে এসো।’

‘কৌতূহল যে হচ্ছে না, তা বলব না। কিন্তু পানামায় বেড়াতে যাবার মত সময় সত্যিই হাতে নেই।’

‘কিছু মনে করছি না। শাপে বর হয়েছে। দারিয়েন প্রভিন্স ভাল জায়গা না। ওখানে না গেলেই ভাল।’

‘কেন? সমস্যা কী?’

‘কলাম্বিয়ায় অ্যান্টি-ড্রাগ অপারেশন জোরেশোরে শুরু হয়েছে, তাই ড্রাগ কার্টেলের খুনে-বদমাশেরা সীমান্ত পেরিয়ে ওখানে ঘাঁটি গেড়েছে বলে শুনেছি। ওই এলাকায় হায়দারের

পড়ে থাকাটা এ-কারণেই পছন্দ নয় আমার।'

'ওর সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট কেমন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'বিপদ-আপদ দেখা দিলে মোকাবেলা করতে পারবে?'

'এই রে, তোমাকে বোধহয় দুশ্চিন্তায় ফেলে দিলাম,' লজ্জিত গলায় বলল কারমেন। 'হায়দারকে নিয়ে ভেবো না। অনেকদিন থেকে ওখানে কাজ করছে, ভাল অ্যারেঞ্জমেন্ট না থাকলে নিশ্চয়ই তা পারত না? রিল্যাক্স। রাখি, কেমন? যোগাযোগ রেখো।'

লাইন কেটে দিল কারমেন। রানা ফিরে গেল হলঘরে। দুভাঁ আবারও শুরু করেছে নিলামের কার্যক্রম। দর্শকের ভূমিকা নেয়া ছাড়া আর কিছু করবার নেই, তা-ই নিল রানা। অলস চোখে প্রত্যক্ষ করল নিলাম। এমনিতে নিস্তেজভাবে চলল কেনাকাটা, কিন্তু পানামা সংক্রান্ত কোনও ডকুমেন্ট মঞ্চে উঠলেই সরব হয়ে উঠল একশো আটাশ নম্বর বিডারের প্রক্সি। দ্বিগুণ, তিনগুণ দাম দিয়ে কিনে নিল প্রতিটা আইটেম। ধীরে ধীরে কৌতূহলী হয়ে উঠল রানা—কে এই রহস্যময় ক্রেতা? পানামার ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন তার? মন খুঁতখুঁত করতে থাকল ওর।

চারদিকে নজর বোলাল রানা। বুথে বসা প্রক্সি ছাড়া রহস্যময় ক্রেতাটি আর কোনও লোক পাঠিয়েছে কি না, বোঝার চেষ্টা করল। কিন্তু ভিড়ের মাঝে ওরিয়েন্টাল চেহারার কাউকে দেখা গেল না। এশিয়ান বলতে ও একা। তাই বলে ইয়োরোপিয়ান বা আমেরিকানদের মাঝে কেউ যে তার প্রতিনিধিত্ব করছে না কে বলবে!

সন্ধ্যা ছ'টা বাজার খানিক পরে শেষ হলো নিলাম। সবার সঙ্গে হলঘর থেকে বেরিয়ে এল রানা। রিসেপশনের কাছে ছোট এক জটলার মধ্যমণি অবস্থায় পাওয়া গেল দুভাঁকে, হাত মিলিয়ে বিদায় জানাচ্ছে সবাইকে। গুস্তাফ আইফেলের একটা ড্রয়িং

বাড়াবাড়ি দামে কিনে নিয়েছে বিডার নাম্বার একশো আটাশ, ফলে কপাল খুলে গেছে ওর বন্ধুটির। যেন অপ্রত্যাশিত ভাবে লটারি জিতেছে—ঝলমল করছে চেহারা।

ওকে দেখতে পেয়ে খুশি খুশি গলায় বলল, 'এসো, রানা। কী একটা দিন গেল, তাই না? রীতিমত রেকর্ড সেল হয়েছে আজ। অথচ নিলামের মেইন আইটেমগুলো এখনও তোলাই হয়নি মঞ্চে!'

'তা তো বটেই,' স্বীকার করল রানা।

'এসো, পরিচয় করিয়ে দিই,' পাশে দাঁড়ানো সুট-বুট পরা এক লোকের দিকে ইশারা করল দুভাঁ। 'এ হলো ফিলিপ অঁবিন—আমার চিফ অভ সিকিউরিটি। ফিলিপ, এ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাসুদ রানা। এর কথা আগেই বলেছি তোমাকে।'

'নাইস টু মিট ইউ, মি. রানা,' হাত বাড়িয়ে দিল অঁবিন। মাঝারি উচ্চতা, গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। নিখুঁতভাবে ক্ষৌরি করা রুক্ষ চেহারা। মাথার চুল ছেঁটেছে আর্মি সার্জেন্টের মত করে। 'আপনার সম্পর্কে আরও আগেই শুনেছি আমি। সিকিউরিটি সেক্টরে রানা এজেন্সির কথা কে না জানে!'

'থ্যাঙ্কস ফর দ্য কমপ্লিমেন্ট,' করমর্দন করল রানা। দুভাঁর দিকে তাকাল। 'ওই জাপানি টাইকুন তো দেখছি তোমার কপাল খুলে দিয়েছে, হে!'

'ঠিকই বলেছ,' হাসল দুভাঁ। 'ভাগ চাও? চলো, আজ ডিনার করবে আমার সঙ্গে। যা চাইবে, তা-ই খাওয়াব।'

'ওটা নাহয় পাওনা থাকুক। আজ আমি খুবই ক্লান্ত। হোটেলে গিয়ে শুয়ে পড়ব ভাবছি।'

'উঠেছ কোথায়? ক্রিলনে?'

'উঁহুঁ, জায়গা পাইনি। লেফট ব্যাঙ্কের আরেকটা হোটেলে উঠতে হয়েছে।'

'ভাল?'

'কাজ চলে যায়। আমি অল্পতেই সন্তুষ্ট।'

'মাফ করবেন, মসিয়ো দুভাঁ,' বলে উঠল অঁবিন। 'লিপিনে জার্নালটা কি নিয়ে আসব মি. রানার জন্য? আপনার সঙ্গে জরুরি একটা ব্যাপারে আলোচনাও করা দরকার... ওই যে, আপনাকে যেটার কথা বলেছিলাম।'

ক্ষণিকের জন্য যেন একটা কালো ছায়া পড়ল দুভাঁর চেহারায়, পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিল সে। তাড়াতাড়ি বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, লিপিনে জার্নাল... ওটা নিয়ে এসো।'

ভুরু কোঁচকাল রানা, কথাটা একটু জোরেই বলেছে ওর বন্ধুটি। আশপাশে এখনও রয়েছে নিলামে-আগত লোকেরা, সবাই এখনও বেরোয়নি। নির্ঘাত শুনতে পেয়েছে দুভাঁর কণ্ঠ।

'ওভাবে বলা কি উচিত হলো?' জিজ্ঞেস করল ও। 'জার্নালটা বিক্রি হবে না বলে জানিয়েছ... অথচ এখন দিয়ে দিচ্ছ আমাকে। লোকে সেটা জানতে পারলে অসন্তুষ্ট হবে না?'

'ওফ্‌ফো, বড্ড ভুল হয়ে গেছে,' বলল দুভাঁ। 'আসলে... অন্য একটা ব্যাপার নিয়ে ভাবছিলাম।'

'কোনও সমস্যা?'

'না, না... তোমাকে বলবার মত কিছু না। ছোট্ট একটা ব্যবসায়িক ব্যাপার। এই তো, ফিলিপ এসে গেছে।'

ব্রাউন পেপারে মোড়ানো একটা প্যাকেট রানার হাতে তুলে দিল অঁবিন। টাক্সিডো পরা এক অ্যাটেনডেন্টকে ডেকে রিসেপশনে রাখা নিজের ব্রিফকেসটা চাইল রানা, তারপর পকেট থেকে বের করল চেক বুক। জার্নালের দামের অঙ্কটা বসিয়ে সই করল, তারপর তুলে দিল দুভাঁর হাতে।

'ধন্যবাদ,' বলে ওটা পকেটে গুঁজল নিলাম-পরিচালক।

র‍্যাপিং খুলে জার্নালটা দেখে নিল রানা। চামড়ার মলাট

লাগানো মোটাসোটা একটা ডায়েরি। চাপা উত্তেজনা অনুভব করল ও—জিনিসটা হায়দারের কাজে তো লাগবেই, তারচেয়েও বড় কথা, নিজের সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা ব্রিলিয়াণ্ট এক ইঞ্জিনিয়ারের মনের কথা জানা যাবে এ-থেকে। ধীরে ধীরে কয়েকটা পাতা উল্টাল রানা, আবছা হয়ে আসা কালিতে গুটি গুটি হরফে লেখা প্রতিটি পৃষ্ঠা। কয়েক লাইন পড়ল ও, মনে মনে অনুবাদ করল ফরাসি শব্দগুলো। মোটামুটি সহজ ভাষাতেই লেখা। ডিকশনারির সাহায্য না নিয়েও কয়েক ঘণ্টায় পড়ে ফেলা যাবে। ডায়েরিটা ব্রিফকেসে ঢুকিয়ে ফেলল ও। পরে পড়বে।

'আসি তা হলে।'

হাত মেলাল দুভাঁ। 'আগামীকাল দেখা করতে পারবে?'

'সরি,' বলল রানা। 'সকালে একটা জরুরি মিটিং আছে। বিকেলের ফ্লাইটে দেশে ফিরছি—হেড অফিস থেকে তলব করা হয়েছে।'

'জার্নালটা দেশে নিয়ে যাচ্ছ?'

'নাহ্। ওটা স্পেশাল কুরিয়ারে পানামায় পাঠিয়ে দেব।'

'আমার পরিচিত ভাল লোক আছে,' বলল দুভাঁ। 'চাও তো ব্যবস্থাটা আমিই করে দিতে পারি।'

'না, না, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। এমনিতেই অনেক করেছ।'

কাঁধ ঝাঁকাল দুভাঁ। 'বেশ, তোমার যা মর্জি।' ঘড়ি দেখল। 'এবার যেতে হয়। বিদায়। সাবধানে থেকো।' শেষ অংশটা ঠিক কথার কথা নয়, অন্তত রানার তেমনই মনে হলো। বন্ধুর চোখে কীসের যেন ছায়া!

তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকাল রানা। 'হঠাৎ সাবধানতার কথা বললে কেন?'

'না, না, তেমন কিছু না,' তাড়াতাড়ি বলল দুভাঁ। 'দিনকাল

খারাপ তো! তোমার পেশাটাও তো বিপজ্জনক।'

শ্রাগ করল রানা। 'আমি সবসময়েই সতর্ক।'

বন্ধুর সঙ্গে আরেক দফা হাত মিলিয়ে অকশন হাউস থেকে বেরিয়ে এল ও। বাইরে তখনও অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। একছুটে পার্কিং লটে চলে গেল রানা, উঠে বসল নিজের সিত্রোঁ সেডানে। ইঞ্জিন চালু করবার আগে রুমাল বের করে মুছে নিল মাথা আর ভেজা মুখ-হাত। অভ্যাসবশত নজর বোলাল বাইরে। ছাতা মাথায় ফিলিপ অঁবিনকে পলকের জন্য দেখতে পেল, লটের এক প্রান্তের আরেকটা গাড়িতে উঠে গেল লোকটা। স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। রানাও ইগনিশনে চাবি ঢোকাল।

সন্ধ্যাবেলার রাশ আওয়ার শুরু হয়েছে, তার ওপর তুমুল বর্ষণ... চেষ্টা করেও ত্রিশের উপরে স্পিড তোলা গেল না। যানজটের মাঝ দিয়ে ঢিমেতালে এগিয়ে চলল রানার সিত্রোঁ, গন্তব্য লেফট ব্যাঙ্কের দঁফো-খুশহো হোটেল। ইল্ দে লা সিত্ পেরুনোর সময় চোখে পড়ল নটরডেম ক্যাথেড্রাল—ফ্লাডলাইটের কল্যাণে আলোকিত হয়ে আছে, আলোর প্রতিফলনে ঝলমল করছে ভেজা দেয়ালগুলো। ব্রিজ পেরিয়ে লেফট ব্যাঙ্কে পৌঁছুনোর পর ক্লান্তি অনুভব করল ও, যানজটের ভিতরে অন্য গাড়ির সঙ্গে ঘষা এড়াবার জন্য অতিমাত্রায় সতর্ক ভঙ্গিতে ড্রাইভ করতে হচ্ছে ওকে—ব্যাপারটা নার্ভের জন্য পীড়াদায়ক। স্টর্ম ড্রেনের উপচে ওঠা পানিতে তলিয়ে গেছে বেশ কিছু রাস্তা, সেগুলো এড়াবার জন্য এগোতেও হচ্ছে ঘুরপথে। বৃষ্টির অঝোর ধারার সঙ্গে যুদ্ধ করে পেরে উঠছে না উইণ্ডশিল্ডের ওয়াইপারদুটো, অনেকটা অনুমানের ভিত্তিতে রাস্তা খুঁজে নিতে হচ্ছে; পথ হারালেও অবাক হবার কিছু নেই। কোন্‌দিকে যাচ্ছে না যাচ্ছে, ঠিকমত ঠাহর করতে পারছে না রানা।

আবছাভাবে খানিক পরে প্রাচীন একটা অবজারভেটরি দেখতে পেল ও, সপ্তদশ শতাব্দীর নির্মাণশৈলী। পরিচিত মনে হলো জায়গাটা, ফরাসি সিনেটের অধিবেশন-ভবন... *লুক্সেমবার্গ প্যালেস*-এর পাশে রয়েছে এমন একটা অবজারভেটরি। সে-জায়গাই কি না দেখার জন্য সিটের উপর একটু ঘুরল রানা, আর তখুনি চোখ ধাঁধিয়ে গেল পিছনের উইণ্ডশিল্ড ভেদ করে ছুটে আসা একজোড়া হেডলাইটের আলোকরশ্মিতে। একটা ট্রাক... সোজা ছুটে আসছে রানার গাড়ির দিকে!

প্রতিক্রিয়ার কোনও সুযোগ পেল না রানা, দড়াম করে সিট্রোঁর পিছনে আঘাত হানল ট্রাক। রিয়ার-এণ্ড তুবড়ে গেল, সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা সেডানের পশ্চাৎদেশে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সিট্রোঁ—ভচকে গেল ওটাও। কপাল ভাল এয়ারব্যাগ ডেপ্লয় হয়েছে, স্টিয়ারিং আর ড্যাশবোর্ডের উপর মুখ থুবড়ে পড়েনি রানা, কিন্তু ভীষণ ঝাঁকি খেয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য চলৎশক্তি হারাল।

আবছাভাবে চারদিকে চিৎকার আর হৈচৈ শুনতে পেল ও। একটু পরেই দড়াম করে খুলে গেল প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজাটা, গাড়ির ভিতরে ঊর্ধ্বাঙ্গ ঢুকিয়ে দিল একজন মানুষ। কিন্তু রানাকে সাহায্য করল না সে, হাতড়াতে শুরু করল গাড়ির মেঝে। আচ্ছন্ন চোখে ওর দিকে তাকাল রানা—রোগা-পাতলা এক তরুণ, বিশ-বাইশের বেশি হবে না বয়স; মাথা কামানো, গায়ে চামড়ার জ্যাকেট... হাবভাবে ড্রাগ-অ্যাডিক্ট বলে মনে হচ্ছে। যা খুঁজছিল তা পেয়ে গেল শীঘ্রি, সিটের তলা থেকে বের করে আনল রানার ব্রিফকেস—ঝাঁকিতে ওটা নীচে পড়ে গিয়েছিল।

'অ্যাই, কী হচ্ছে?' গর্জে উঠল রানা।

ঝট্ করে জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল ছেলেটা।

বের করে আনল একটা পিস্তল। 'খবরদার!' ফরাসি ভাষায় হিসিয়ে উঠল সে। 'নড়বে না!'

হুমকিটাকে মোটেই পাত্তা দিল না রানা, এক দেখাতেই বুঝে ফেলেছে, ছোকরা একেবারেই আনাড়ি। বিদ্যুৎবেগে হাত নাড়ল ও, সর্বশক্তিতে থাবড়া মারল প্রতিপক্ষের হাতে। যা ভেবেছিল তা-ই ঘটল, ছোকরার মুঠো থেকে খসে পড়ল পিস্তল। ভড়কে গেল সে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল গাড়ি থেকে। ব্রিফকেস নিয়ে দৌড় লাগাল ঊর্ধ্বশ্বাসে।

সিটবেল্ট খুলতে গিয়ে মূল্যবান কয়েকটা সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল, তারপর রানাও নামল গাড়ি থেকে। ধাওয়া করল তরুণকে। 'অ্যাই, থামো!' চেঁচিয়ে উঠল ও।

কে শোনে কার কথা, ঝড়-বাদল উপেক্ষা করে পাগলের মত ছুটছে ছেলেটা। রানাও পিছু নিল। রাস্তা ছেড়ে সাইডওয়াকে উঠে পড়েছে ছেলেটা, বৃষ্টির কারণে ওখানে পথচারী নেই বললেই চলে, নির্বিঘ্নে ছুট লাগাতে পারছে। কিন্তু তাকে এত সহজে পালাতে দেবে না রানা, ব্রিফকেসের ভিতরে মহামূল্যবান লিপিনে জার্নালটা রয়েছে, শরীরের ব্যথা-বেদনা উপেক্ষা করে গোঁয়ারের মত ছুটছে ও-ও।

প্রতি কদমে কমে আসছে দু'জনের মধ্যকার দূরত্ব। সামনের রাস্তার ক্রস-সেকশন যখন মাত্র পনেরো গজ দূরে, ঠিক তখুনি ব্রেক কষে একটা মার্সিডিজ থমকে দাঁড়াল রাস্তার কোণে। ঝট্ করে খুলে গেল পিছনের দরজা... ছেলেটাকে তুলে নেবার জন্য। চমকে উঠল রানা, ছিঁচকে এক ছিনতাইকারী কি না মার্সিডিজে চেপে পালাতে চাইছে! ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয় মোটেই।

গাড়িটা দেখতে পেয়েই ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল তরুণ। কাছে গিয়ে তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলবে বলে ভাবছিল রানা, তা বুঝি আর সম্ভব হলো না। হতাশায় দমে যেতে বসেছিল মন,

কিন্তু আচমকা বদলে গেল পরিস্থিতি। চারদিক ভেসে আসা গাড়ির হর্ন আর বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়ে শোনা গেল আরেকটা শব্দ। অভিজ্ঞ কানে সেটা চিনতে অসুবিধে হলো না রানার।

গুলির শব্দ!

ছুটন্ত অবস্থাতেই হুমড়ি খেলো তরুণ ছিনতাইকারী, ধড়াম করে আছড়ে পড়ল সাইডওয়াকের উপর। হাত থেকে ছুটে গেল ব্রিফকেস। উপুড় হয়ে পড়া দেহটার তলা থেকে বেরিয়ে এল রক্তের ধারা, বৃষ্টির পানিতে মিশে ফিকে হয়ে গেল, গড়াচ্ছে ড্রেনের দিকে।

দুই

সচেতনভাবে নয়, স্রেফ ইনস্টিঙ্কটের বশে ডাইভ দিল রানা। একই সঙ্গে হাতে বেরিয়ে এসেছে শোল্ডার হোলস্টারে রাখা নাইন মিলিমিটার সিগ-সাওয়ার পিস্তলটা। সাইডওয়াকে শরীর মিশিয়ে দিয়ে মুখ তুলল ও, ঝটিতি জরিপ করে নিল পরিস্থিতি। নিস্পন্দ ভঙ্গিতে দশ ফুট দূরে পড়ে আছে তরুণ ছিনতাইকারী, বুকের বামপাশে বড়সড় একটা একজিট উণ্ড... ভারী ক্যালিবারের বুলেট শরীর এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে। ডানদিক থেকে এসেছে গুলিটা—স্নাইপার শট! কিন্তু কে করল?

ক্রল করে লাশটার দিকে এগিয়ে গেল রানা, ধরে ফেলল পেভমেন্টের উপর পড়ে থাকা ব্রিফকেসটার হাতল। আর তখুনি

সশব্দে খুলে গেল মার্সিডিজের সামনের দরজাটাও। অবিশ্বাস্য দ্রুততায় গাড়ি থেকে নেমে এল তিনজন অস্ত্রধারী লোক। পরনে ফিটফাট পোশাক, একজন ওরিয়েন্টাল এশিয়ান, বাকি দু'জন ইয়োরোপীয়। প্রমাদ গুনল রানা, নিহত ছিনতাইকারীর মত অ্যামেচার নয় এরা, নড়াচড়ার ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে, পাক্কা প্রফেশনাল। কাভার দেবার ভঙ্গিতে দু'জন দু'দিকে ঘুরে গেল, অন্যজন অস্ত্র তাক করে এগোতে শুরু করল রানার দিকে।

অযথা বীরত্ব দেখাবার কোনও মানে হয় না, সশস্ত্র তিনজন প্রফেশনাল খুনির সঙ্গে খোলা ময়দানে লড়াইয়ে নামাটা বোকামির নামান্তর। তা ছাড়া আশপাশে অনেক নিরীহ মানুষ রয়েছে, লড়াই বাধলে তাদের প্রাণহানির সমূহ সম্ভাবনা। এরই মধ্যে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে, যানজটে আটকে থাকা গাড়িগুলো থেকে ক্রমাগত হর্ন বাজাচ্ছে ভয়ার্ত চালকেরা, সামনের গাড়িগুলোকে যেন শব্দের ঠেলাতেই উড়িয়ে ফেলবে, যাতে ফাঁকা রাস্তা ধরে বিপজ্জনক এই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে। পরিবেশটা যুদ্ধ বাধাবার জন্য মোটেই আদর্শ নয়।

নিতান্ত অনন্যোপায় না হলে খুনোখুনিতে জড়াতে চায় না রানা, তাই পিস্তল তুলে অগ্রসরমান খুনির মাথার উপর দিয়ে একটা গুলি ছুঁড়ল। ডাইভ দিল লোকটা, তার দুই সঙ্গীও রিফ্লেক্সের বশে লাফ দিয়ে সরে গেছে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করল রানা, ব্রিফকেসটা মুঠোয় নিয়ে এক লাফে উঠে দাঁড়াল; ছুট লাগাল সবচেয়ে কাছের বিল্ডিংটা লক্ষ্য করে। পিছন থেকে গুলি করল খুনিরা, কিন্তু তুমুল বৃষ্টির মাঝে ছুটন্ত নিশানায় লক্ষ্যভেদ করা সহজ নয়, ওর পাশ দিয়ে চলে গেল গুলিগুলো।

ত্রিশ সেকেণ্ডের মাথায় পুরনো বিল্ডিংটার সামনে পৌঁছে গেল রানা। ওভারঅল পরা এক ওয়ার্কার দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে, হাতে চাবির গোছা, বোধহয় দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল,

গোলমাল লক্ষ করে স্থির হয়ে গেছে। ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে একপাশে সরিয়ে দিল রানা, দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল বিল্ডিঙের আবছায়া অভ্যন্তরে।

দৌড়ের উপর থাকলেও চিন্তা-ভাবনা ঠিকমতই কাজ করছে ওর। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, যা ঘটছে তা সাধারণ কোনও চুরি-ডাকাতির ঘটনা নয়। সুপরিকল্পিতভাবে ওর কাছ থেকে লিপিনে জার্নালটা ছিনিয়ে নিতে চাইছে এরা। ওর গাড়ির পিছনে ট্রাকের আচমকা গুঁতো, পরমুহূর্তে ছিনতাইকারীর আবির্ভাব, আর সবশেষে মার্সিডিজে চেপে তিন খুনির আগমন... এসব সেই সাক্ষ্যই দেয়। নাটের গুরু নিশ্চয়ই সেই জাপানি টাইকুন। লোকটা হঠাৎ এমন পাগল হয়ে উঠল কেন? আরেকটা ব্যাপার দুর্বোধ্য—কে খুন করল ছিনতাইকারী ছেলেটাকে? হামলাকারীদের কেউ নয়, নিজের দলের লোককে অযথা খুন করবে না ওরা, অন্তত ব্রিফকেসটা হাতে পাবার আগে নয়। নিশ্চয়ই তৃতীয় কোনও পক্ষ জড়িত আছে এর সঙ্গে।

এখুনি এ-নিয়ে মাথা গরম করবার কোনও মানে হয় না, খুনিরা চলে আসবে শীঘ্রি, আগে প্রাণ বাঁচানো দরকার। আশপাশে নজর বোলাল রানা। আবছা আলোয় লক্ষ করল, বিশাল এক হলঘরে দাঁড়িয়ে আছে ও। দেয়ালগুলো বয়সের ভারে বিবর্ণ, কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন। কামরার এক কোণে প্যাঁচানো একটা সিঁড়ি নেমে গেছে ভূগর্ভে। আলো-আঁধারিতে পাতালে নামার গর্তটাকে দেখাচ্ছে দানবের মুখের মত। কোথায় এসেছে বুঝতে পেরে ক্ষণিকের জন্য স্থির হয়ে গেল রানা।

আঠারো শতকের শেষ দিকে ভয়াবহ এক পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল প্যারিস। ভয়াবহ মহামারীতে অগণিত মানুষ মারা যাওয়ায় উপচে পড়ার দশা হয়েছিল গোরস্থানগুলোর, যত্রতত্র পচতে থাকা লাশের গন্ধে ভরে গিয়েছিল গোটা নগরী, সেই সঙ্গে

ওগুলোর কারণে দেখা দিচ্ছিল নিত্যনতুন রোগব্যাধি। এ-অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সমস্ত লাশ মাটির তলায় সরিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নেন শহরের কর্তারা। মুখ খোলা হয় রোমান আমলে খোঁড়া পরিত্যক্ত লাইমস্টোন খনিগুলোর। প্রায় একশো মাইল দীর্ঘ টানেলের শাখা-প্রশাখা ভরে দেয়া হয় ষাট লাখ মানুষের মৃতদেহ দিয়ে। প্যারিসের ভূগর্ভস্থ এই জগৎ হয়ে ওঠে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অসুয়ারি, অর্থাৎ মানব-দেহাবশেষের সংগ্রহশালা। প্যারিসের লোকেরা ওটাকে বলে *ল্য এম্পায়ার দে ল্য মর্ত*, মানে মৃতের রাজ্য। বর্তমানে জায়গাটা পর্যটকদের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত... আর এ-মুহূর্তে রানা সেই রাজ্যেরই প্রবেশপথের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

হলঘরে প্রতিরোধ গড়বার মত তেমন কোনও সুবিধে দেখল না রানা, নীচেই নামতে হবে। টানেলের ভিতরে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে, তবে সুইচ খোঁজার সময় নেই। একপাশে একটা কাউন্টার দেখতে পেয়ে ওখানে চলে গেল, খুঁজে পেল দুটো ফ্ল্যাশলাইট। একটা ভরে ফেলল পকেটে, অন্যটা জ্বেলে নিয়ে ধরল বামহাতে... ব্রিফকেসের হাতল-সহ। ডানহাতটা মুক্ত রাখল পিস্তল ব্যবহারের জন্য। তারপরেই সিঁড়ি ধরে আঁধার পাতালে নেমে গেল ও।

নীচে পা রাখতেই ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় রুক্ষ পাথরে গড়া দীর্ঘ একটা টানেল উদ্ভাসিত হলো। আবছাভাবে উপর থেকে ভেসে এল পায়ের আওয়াজ, তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে দিল রানা। পথ দেখে নিয়েছে ইতিমধ্যে, দ্রুতপায়ে ছুটতে শুরু করল ও, ডানহাত সামান্য প্রসারিত করে আঙুলের ডগা ছুঁইয়ে রেখেছে দেয়ালে। খানিক পরে বাঁয়ে মোড় নিল টানেল, ক্ষণিকের জন্য আলো জ্বেলে জায়গাটা দেখে নিল, তারপর মোড় নিয়ে ছুট লাগাল ফের।

পর পর আরও তিনটা বাঁক ঘুরতে হলো ওকে, শেষে পৌঁছুল বড়সড় একটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড চেম্বারে। আলো জ্বালতেই চোখে পড়ল অগণিত কঙ্কাল, পুরো চেম্বার ভরে আছে মানুষের হাড়-গোড়ে। কালের ছোবলে কালচে-হলুদ রঙ ধারণ করেছে ওগুলো, হাজারো খুলির মাঝে শূন্য অক্ষিকোটরগুলো যেন ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে রয়েছে রানার দিকে। ভয়ঙ্কর পরিবেশ... নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল রানা। দ্রুত পা চালিয়ে এগিয়ে গেল চেম্বারের অন্যপাশের এগজিটের দিকে।

কয়েক পা যেতেই আচমকা জ্বলে উঠল ক্যাটাকুমের সমস্ত বাতি—উপরের কন্ট্রোল সেন্টার থেকে সুইচ অন্ করে দিয়েছে খুনিরা। ছাত আর দেয়ালের বিভিন্ন জায়গায় কায়দা করে বসানো হয়েছে বাতিগুলো, শৈল্পিক ভঙ্গিমায় আলোকিত হয়ে উঠেছে চেম্বারের অভ্যন্তর। টানেলের দিক থেকেও আসছে আলোর আভা। এবার পরিষ্কারভাবে দেখা গেল সব। হাড়গোড় জোড়া লাগিয়ে চেম্বারের ভিতরে বানানো হয়েছে বিভিন্ন ধরনের ভাস্কর্য আর ক্রুশ। এমনকী মাথার খুলির সারি দিয়ে টাইলসের মত ঢেকে দেয়া হয়েছে চারপাশের দেয়াল। মানুষের দেহাবশেষের কী চরম অবমাননা! কিন্তু সে-দিকে মনোযোগ নেই রানার, খুনিরা চলে আসবে এখুনি, বেশিদূর এগোতে পারেনি ও... ভাবছে কী করা যায়।

সঙ্গে পিস্তল আছে, অ্যামবুশ পাতবে কি না ভাবল রানা। তবে তাতে কতটুকু লাভ হবে সেটাই প্রশ্ন। ও যে নিরস্ত্র নয়, তা খুনিরা জানে। অভিজ্ঞ প্রফেশনাল, বোকার মত অ্যামবুশে পা দেবে বলে মনে হয় না, সাবধানে এগোবে। কপাল ভাল হলে বড়জোর একজনকে ঘায়েল করা যেতে পারে, তা-ও অবশ্য মন্দ নয়। শত্রুর সংখ্যা তো কমবে! চেম্বার থেকে আর বেরুল না ও, হাড়গোড় দিয়ে গড়া একটা পিলারের আড়ালে পজিশন নিল,

সেফটি ক্যাচ অফ করে দিল পিস্তলের। ধীর লয়ে ফেলতে থাকল শ্বাস-প্রশ্বাস, শান্ত করল নার্ভকে। শুরু হলো প্রতীক্ষা।

খানিক পরেই ভেসে এল পদশব্দ, চেম্বারের এণ্ট্রান্সে চকিতে নড়ে উঠল একটা ছায়া। শক্ত করে পিস্তলের গ্রিপ ধরল রানা, অস্ত্রটা তাক করল ওদিকে। পরক্ষণে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঝড়ের বেগে চেম্বারে ঢুকল তিন খুনি—একসঙ্গে। ট্রিগার চাপার সুযোগ পেল না রানা, বুলেটবৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্য বসে পড়তে বাধ্য হলো মেঝেয়। কানে তালা লেগে গেল বদ্ধ চেম্বারে গোলাগুলির বিকট আওয়াজে। রানাকে দেখতে পায়নি খুনিরা, অন্ধের মত গুলি করছে চারদিকে, হাই-ভেলোসিটি বুলেটের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে চেম্বারে সযত্নে সাজিয়ে রাখা শতাব্দীপ্রাচীন খুলি আর অস্থিগুলো।

নাকে-মুখে হাড়ের গুঁড়ো ঢুকে যাচ্ছে, বহুকষ্টে হাঁচি ঠেকাল রানা, নইলে ওর অবস্থান ফাঁস হয়ে যাবে। হামাগুড়ি দিয়ে পুরনো পজিশন থেকে সরে গেল ও, ঠাঁই নিল এগজিটের কাছাকাছি... হাড় দিয়ে বানানো চারফুট উঁচু একটা ডিসপ্লের পিছনে।

মিনিটখানেক চলল তাণ্ডব, তারপর যতি পড়ল গুলিবর্ষণে। কাভার খুঁজে নিয়েছে খুনিরা, রিলোড করে নিচ্ছে অস্ত্র। আড়াল থেকে শরীরের একাংশ বের করে উঁকি দিল রানা, কয়েক সেকেণ্ড পরেই ইয়োরোপিয়ানদের একজনকে বেরিয়ে আসতে দেখল—পিস্তল উঁচু করে তল্লাশি চালাবার ভঙ্গিতে এগোচ্ছে। নির্দ্বিধায় গুলি করল ও। বুক বরাবর বুলেটের আঘাতে পিছনদিকে ছিটকে গেল লোকটা, গলা চিরে বেরিয়ে এল আর্তচিৎকার। পরমুহূর্তে শুরু হলো নতুন তাণ্ডব—রানার দিকে গুলি ছুঁড়ল বাকি দুই খুনি।

পজিশন ফাঁস হয়ে গেছে, খুনিদের মাজল ফ্ল্যাশ লক্ষ্য করে

আরও দুটো গুলি ছুঁড়ল রানা, তারপর কুঁজো হয়ে ছুট লাগাল চেম্বারের এগজিটের দিকে। কাছাকাছি গিয়েই ডাইভ দিল... তীরের মত বেরিয়ে এল ওখান থেকে। একটা ডিগবাজি খেয়ে সোজা হলো, উঠে দাঁড়িয়ে আবারও দৌড়াতে থাকল টানেল ধরে। কিছুদূর যেতেই কয়েক ভাগ হয়ে গেল টানেল। একপাশে একটা আর্চওয়ে দেখতে পেয়ে ওখানে ঢুকে পড়ল রানা। প্রার্থনাকক্ষের মত ছোট একটা প্রকোষ্ঠ পেরিয়ে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আরেকটা অসুয়ারি চেম্বারে পৌঁছে গেল ও। মসোলিয়ামের মত লাগল জায়গাটা। প্রবেশপথের পাশেই ফলক লাগানো আছে—এখানকার দেহাবশেষগুলো নেপোলিয়নের আমলের। চেম্বারের মাঝখানে হাড়গোড় দিয়ে বানানো চারকোনা একটা স্তম্ভ উঠে গেছে ছাতের দিকে। ভিতরে বাতির সংখ্যা কম, ইচ্ছাকৃতভাবে আবছায়া পরিবেশ তৈরি করে রাখা হয়েছে। তাও ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল না রানা, হাতড়ে হাতড়ে সামনে এগোতে থাকল। ধূলিধূসরিত মেঝের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাগ্যকে অভিসম্পাত দিল—পায়ের ছাপ পড়ছে স্পষ্টভাবে, ওকে খুব সহজেই অনুসরণ করতে পারবে শত্রুরা।

চেম্বারের একপাশে চলে গেল ও, হাঁটতে শুরু করল দেয়াল স্পর্শ করে, এগজিটটা খুঁজে নিতে চায়। কিন্তু সীমানার দুই-তৃতীয়াংশ অতিক্রম করতেই বুঝে ফেলল, এখানে ঢোকা আর বেরুনোর রাস্তা একটাই—প্রবেশপথটা। ফাঁদে পড়ে গেছে ও!

অস্থির হলো না রানা, আবছা আলোয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জরিপ করল সামনেটা। দেয়ালের গায়ে প্রাচীন একটা কাঠের দরজা দেখা যাচ্ছে—বিশাল এক ছিটকিনি লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ওটা, তার সঙ্গে ঝুলছে আদ্যিকালের পেল্লায় এক তালা। কী আছে ওপাশে কে জানে, কিন্তু আপাতত ওটাই পালানোর

একমাত্র পথ। কাছে গিয়ে দরজাটা পরীক্ষা করে দেখল—পুরনো হলেও যথেষ্ট মজবুত; ধাক্কাধাক্কি করে ভাঙা যাবে না। অগত্যা একপাশে সরে গিয়ে পিস্তল তুলল, এক গুলিতে উড়িয়ে দিল তালাটা। সন্দেহ নেই শব্দটা শুনতে পেয়েছে খুনিরা, এখুনি ছুটে আসবে এদিকে। তাড়াতাড়ি ছিটকিনি খুলল রানা, দরজার পাল্লা ঠেলে ঢুকে পড়ল ওপাশে।

চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার—গোলকধাঁধার পরিত্যক্ত অংশ এপাশটা, বাতি লাগানো হয়নি। ফ্ল্যাশলাইট জ্বালতেই চোখে পড়ল সংকীর্ণ এক টানেল... ঢালু হয়ে নেমে গেছে মাটির গভীরে। দেয়াল ঘেঁষে থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে অগণিত কঙ্কাল। ভাবনার সুযোগ নেই, ছুট লাগাল রানা, দেখা যাক টানেলটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়।

পিছু পিছু আসছে খুনিরা, এক সঙ্গীকে হারিয়ে ক্ষান্ত দেয়নি। দম নেবার জন্য থামলেই তাদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে রানা। চালু মাল, পিছিয়ে পড়ছে না মোটেই। তাড়া করে চলেছে ওকে। খানিক পরেই নতুন একটা প্যাসেজের সামনে পৌঁছুল ও, বেশ সরু, কাঁধ আটকে যাবে। গত্যন্তর না থাকায় কাত হয়ে ঢুকে পড়ল ওখানে। ঢালু হয়ে উপরদিকে উঠে গেছে প্যাসেজটা, ইঞ্চি ইঞ্চি করে ওটা ধরে এগিয়ে চলল রানা, সোজা ভঙ্গিতে দ্রুত ওঠা সম্ভব নয়। আলো জ্বালতে পারছে না, শত্রুরা দূর থেকে স্পট করে ফেলবে। কালিগোলা অন্ধকার চারদিকে, জমাট হয়ে আছে। ভয়াবহ পরিবেশ। ক্লস্ট্রোফোবিয়া নেই রানার, তারপরও কেন যেন দম আটকে আসতে চাইল। আঁধার যেন তরল কোনও পদার্থের মত ওর নাক-কান-মুখ দিয়ে ঢুকে পড়ছে শরীরের ভিতরে!

পঞ্চাশ গজ এগোবার পর একটা মোড় পাওয়া গেল, বাঁয়ে ঘুরে গেছে প্যাসেজটা। ক্ষণিকের বিরতি নিয়ে ফেলে আসা

পথের দিকে তাকাল রানা, আবছা একটা আভা দেখতে পেল প্যাসেজের মুখে। এলোমেলো ভঙ্গিতে নড়ছে আলোটা, খুনিরা বোধহয় বুঝতে পারেনি রানা কোথায় ঢুকেছে। তবে এই বিভ্রান্তি সাময়িক, খুব শীঘ্রি ফের পিছু নেবে ওরা। ত্রস্ত ভঙ্গিতে মোড় নিয়ে আবারও এগিয়ে চলল রানা।

কতটা সময় পেরিয়েছে বলতে পারবে না, হঠাৎ সরু প্যাসেজটা শেষ হয়ে গেল। খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ও। ঝুঁকি নিয়ে ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল, কোথায় পৌঁছেছে দেখে নেয়া দরকার। সামনে যে-দৃশ্য ভেসে উঠল, তাতে নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল রানা।

প্রায় ষাট ফুট চওড়া মস্ত এক কামরায় এসে ঢুকেছে ও। মেঝে বলে কিছু নেই, সবটাই ঢাকা পড়ে আছে ভাঙাচোরা অগণিত নরকঙ্কালে। সাজানো কঙ্কাল নয়, ডাম্প করা। কামরাটা আসলে হাড়গোড়ের আস্তাকুঁড়, অসুয়ারি তৈরির পরে অপ্রয়োজনীয় ও বাড়তি সমস্ত দেহাবশেষ এখানে ফেলে দেয়া হয়েছে। ভয়াবহ দৃশ্য... ছবিতে দেখা নাজি ডেথ ক্যাম্প আর কম্বোডিয়ার কিলিং ফিল্ডের কথা মনে পড়ে গেল ওর।

যে-পথে এসেছে, সেটা ছাড়া কামরা থেকে বেরুবার পথ আর একটিই—উল্টোদিকের দেয়ালে মুখ ব্যাদান করে থাকা একটা ফোকর। কিন্তু সেখানে পৌঁছুতে গেলে মেঝেতে পড়ে থাকা হাড়গোড়ের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। মানুষের দেহাবশেষ পা দিয়ে মাড়ানোর কোনও ইচ্ছে নেই রানার, হোক না ওগুলো কয়েকশ' বছরের পুরনো। কাজটা মৃতর জন্য অসম্মানজনক। কিন্তু এ-মুহূর্তে আর কোনও উপায়ও নেই। পিছন পিছন তাড়া করে আসছে মৃত্যু। বিড়বিড় করে অচেনা মানুষগুলোর আত্মার কাছে ক্ষমা চাইল ও, তারপর পা বাড়াল সামনে।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই অসহনীয় হয়ে উঠল পরিস্থিতি। প্রতি পদক্ষেপে পায়ের তলায় মড়মড় করে ভাঙছে পুরনো হাড়, পা ডুবে যাচ্ছে কঙ্কালের স্তূপে। এই মড়মড়ানিকে ঝরা পাতার আওয়াজ ভাবতে চাইল রানা, সে-আওয়াজ অনেক বেশি আনন্দদায়ক, কিন্তু পায়ের এখানে-ওখানে ভাঙা হাড়ের তীক্ষ্ণ খোঁচা ওকে বারবার বাস্তবে ফিরিয়ে আনছে।

প্যান্টের ঝুল ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেল খুব শীঘ্রি, গোড়ালির উপরে কয়েক ইঞ্চি চামড়ায় পড়ল আঁকাবাঁকা গভীর কিছু আঁচড়। ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে, টের পেল রানা, সেইসঙ্গে জ্বালাপোড়া। সবকিছু অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলল, আঘাতগুলো নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে, আগে এখান থেকে প্রাণ নিয়ে বেরুনো জরুরি।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল ও, পরক্ষণে আঁতকে উঠল। পিছনের টানেলে দু'-দুটো আলোর রেখা ফুটে উঠেছে। খুনিরা ঢুকে পড়েছে ওটায়। চলার গতি বাড়িয়ে দিল, সঙ্গে মড়াৎ করে ডান পা ঢুকে পড়ল একটা কঙ্কালের বুকের খাঁচায়, চামড়ায় গেঁথে গেল ধারালো হাড়ের ডগা। ককিয়ে উঠল রানা, পা তুলে পাগলের মত ঝাড়ল। শত বছরের পুরনো হাড়গুলো জয়েন্ট থেকে ছুটে গিয়ে ছিটকে পড়ল চারদিকে।

দৌড়াতে শুরু করল রানা, কামরার বাকি দৈর্ঘ্য পেরিয়ে এল খুব দ্রুত। খুনিদের ফ্ল্যাশলাইটের আলো যখন কামরার ভিতরে নড়তে শুরু করেছে, তখন উল্টোদিকের ফোকরটার ছ'ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেছে ও। ওখান থেকে ছুটন্ত অবস্থাতেই ঝাঁপ দিল, তীরের মত ঢুকে গেল ফোকরে। পিছনে এক খুনির গলার আওয়াজ পেল, ওকে শেষ মুহূর্তে দেখে ফেলেছে। তাড়াহুড়ো করে গুলি ছুঁড়ল লোকটা, কিন্তু লাগাতে পারল না।

ফোকরের ওপাশে আরেকটা প্যাসেজ, পাথুরে মেঝে ঢালু

হয়ে নেমে গেছে নীচে। উপুড় হয়ে সেখানে আছড়ে পড়ল রানা, পড়েই পিছলাতে শুরু করল ঢাল ধরে। জ্বলে উঠল বুকের কাছটা, পাথরের সঙ্গে ঘষা খেয়ে ছাল-চামড়া উঠে যাচ্ছে। দ্রুতবেগে নামছে ও, একদিক থেকে সেটা ভাল, কষ্টেসৃষ্টে ব্রিফকেসটা শরীরের নীচে নিয়ে এল, বুক তুলে দিল ওটায়। এবার মোটামুটি স্বচ্ছন্দে নামতে পারছে।

ঢালটা শেষ হলো পচা গন্ধঅলা পানিতে ভরা একটা অগভীর পুলের পাশে গিয়ে। শেষবারের মত ঝাঁকি খেয়ে ওখানে থামল রানা, সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য স্থির হয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে চোখ বোলাল চারদিকে। হাত থেকে ফ্ল্যাশলাইটটা ছুটে গিয়েছিল, কয়েক হাত দূরে পড়ে আছে ওটা। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেখা যাচ্ছে পানিতে পড়ে থাকা একটা কালচে নরকঙ্কাল। তবে এটা শত বছরের পুরনো নয়, কঙ্কালের গায়ে এখনও রয়েছে পোশাকের একাংশ—প্রিন্টের একটা শার্ট আর জিন্সের প্যান্ট। দেখে মনে হচ্ছে অল্প কয়েক বছরের পুরনো লাশ ওটা। সম্ভবত কোনও *ক্যাটোফাইল*-এর। এক ধরনের অ্যাডভেঞ্চারার এরা, প্যারিসের ভূগর্ভস্থ ক্যাটাকুমের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায় রোমাঞ্চের খোঁজে। পথ হারিয়ে এদের অনেকেই এখানে মৃত্যুবরণও করে—কাগজে পড়েছে রানা। এই লাশটা সম্ভবত তেমনই কারও। ক্ষণিকের জন্য শঙ্কা জাগল—ওরও একই দশা হবে না তো!

উঠে দাঁড়াল রানা। ব্রিফকেসটা বাড়তি বোঝার মত লাগছে। ভিতর থেকে দরকারি কয়েকটা কাগজ আর লিপিনে জার্নালটা বের করে পলিথিনের একটা এয়ারটাইট প্যাকেটে ঢোকাল—চাইছে না পানিতে ভিজে নষ্ট হোক ওগুলো। প্যাকেটটা জ্যাকেটের ভিতরে ঢুকিয়ে ফেলল ও, ব্রিফকেসটা ছুঁড়ে ফেলল একপাশে। ফ্ল্যাশলাইট কুড়িয়ে নিয়ে তারপর আবার

ছুটতে শুরু করল।

ক্যাটাকুমের এ-অংশটা প্রাচীন রোমান মাইনের অংশ নয়। দু'পাশের দেয়াল ইঁট দিয়ে গাঁথা; কিছুটা আধুনিক। খানিক পরেই টের পেল রানা, ক্যাটাকুম পেরিয়ে প্যারিসের বিশাল সিউয়ার সিস্টেমে ঢুকে পড়েছে ও। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলে তৈরি হয়েছে এই গোলকধাঁধা, ডিজাইন করেছিলেন তৎকালীন মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ার ব্যারন জর্জেস হাউসম্যান। প্রায় হাজার মাইল দীর্ঘ এই পয়ঃনিষ্কাশনের সুড়ঙ্গগুলো গোটা রাজধানীর তলায় জালের মত বিছিয়ে রয়েছে। পায়ের নীচে পানি ছপ ছপ করছে রানার। কপাল ভাল যে তুমুল বৃষ্টির কারণে বয়ে চলেছে এই পানি, কোথাও জমে নেই বিষ্ঠা বা আবর্জনার স্তূপ। তারপরও প্রকট দুর্গন্ধ ছেয়ে রেখেছে সুড়ঙ্গকে। খুব শীঘ্রি হাঁসফাঁস করে উঠল ও।

সুড়ঙ্গের মেঝেতে পলিমাটির মত জমে আছে পুরনো ময়লা, পা গেঁথে যেতে চায় ওতে। যতটা সম্ভব পাশে সরে এসে দৌড়াচ্ছে রানা, কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হচ্ছে না। খানিক পর পরই রয়েছে ড্রেনেজ পাইপের ওপেনিং, উপর থেকে নোংরা পানি আর বিষ্ঠা-আবর্জনা এসে আছড়ে পড়ছে সিউয়ার সিস্টেমের মূল টানেলে। বহু চেষ্টা করেও এড়ানো যাচ্ছে না ওগুলোকে। পানির ছিটার সঙ্গে গায়ে এসে পড়ছে বর্জ্যের কণা। বমি বমি লাগছে রানার।

দেয়ালে লাগানো কয়েকটা ল্যাডার পর পর পেরিয়ে এল রানা। ওগুলো দিয়ে উপরে উঠে যাওয়া যায়, ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে বেরিয়ে পড়া যায় প্যারিসের রাস্তায়... কিন্তু সময় নেই। বড়জোর মিনিটখানেক পিছিয়ে আছে দুই খুনি, ল্যাডার বাইতে গেলেই ওকে নাগালে পেয়ে যাবে ওরা, গুলি ছুঁড়তে

পারবে নিশানা করে।

দুর্গন্ধযুক্ত বাতাসে দম আটকে আসছে রানার—অক্সিজেনের অভাব। টলতে টলতে এগিয়ে চলল ও। পায়ের কাছ দিয়ে বেড়াল-আকৃতির কতগুলো ইঁদুর ছুটে গেল, দেখেও যেন দেখল না। কোথায় যাচ্ছে কিচ্ছু জানে না, অনুসরণ করছে শুধু পানির স্রোতকে। যেখান দিয়ে বেরুচ্ছে এই পানি, সেখান দিয়ে নিজেও বেরুতে পারবে বলে আশা করছে।

যত এগোল, ততই বাড়ল পানির গভীরতা। তীক্ষ্ণ একটা বাঁক পেরুতেই হাঁটু অবধি ডুবে গেল। সামনে গাছের মরা ডাল আর অন্যান্য নিরেট আবর্জনা জমে একটা অস্থায়ী বাঁধের মত সৃষ্টি হয়েছে, এ-পাশটায় থই থই পানি—পাক খাচ্ছে যাবার জায়গা না পেয়ে। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে বাঁধের কাছে গেল রানা, ব্যারিকেডের উপরে উঠে পড়ল। নামতে গিয়ে ঘটল বিপত্তি। ডালের ফাঁকে আটকে গেল এক পা, তাল হারিয়ে ঝপাস করে উল্টোদিকের নোংরা পানিতে আছড়ে পড়ল ও।

কাশতে কাশতে উঠে বসল রানা, দু'হাতে মুখের উপর থেকে সরাল ময়লার আস্তর। পেটের কাছটায় চুলকানি অনুভব করতেই দেখল, একটা ইঁদুর উঠে আসতে চাইছে ওর শরীর বেয়ে। ওটাকে একহাতে খপ্ করে ধরে দূরে ছুঁড়ে ফেলল ও। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ইঁদুরটার স্পর্শে। বাঁধের ও-পাশটা আলোকিত হয়ে উঠল এ-সময়। এসে পড়েছে দুই খুনি। টানেলের দেয়ালে শরীর মিশিয়ে দিয়ে ওদিকে পিস্তল তাক করল রানা। লোকদুটো বাঁধের উপরে উঠলেই গুলি করবে।

ওর আশা পূর্ণ হলো না। খুনিরা পুরোমাত্রায় প্রফেশনাল, অ্যামবুশ এড়াবার জন্য একজন পিছনে রইল, আরেকজন এগিয়ে এল বাঁধের দিকে। নিচু গলায় ভাগ্যকে গালমন্দ করল রানা, তারপর মনোযোগ দিল সামনের লোকটার দিকে। বাঁধের

উপরটা মাত্র বিশ ফুট দূরে—এই রেঞ্জে নিশানা ভেদ করা কোনও ব্যাপারই না। কিন্তু সমস্যা হলো, ঠাণ্ডা পানিতে কাঁপুনি ধরেছে ওর শরীরে... হাত ঠকঠক করে কাঁপছে।

প্রথম খুনির মাথার অবয়ব দেখতে পেয়েই ট্রিগার চাপল রানা। খুট করে মৃদু আওয়াজ হলো, কিন্তু কোনও গুলি বেরুল না। পানিতে ভিজে জ্যাম হয়ে গেছে ফায়ারিং মেকানিজম। মিসফায়ারের আওয়াজ পেয়েই ঝট্ করে বাঁধের ওপারে মাথা নামিয়ে নিল খুনি, খেদোক্তি বেরিয়ে এল রানার মুখ দিয়ে। পরক্ষণে অটোমেটিক ওয়েপনের এক ঝাঁক গুলি ছুটে এল বাঁধের উপর দিয়ে। বিকট আওয়াজে কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়!

অ্যামবুশ ব্যর্থ হয়েছে, এ-মুহূর্তে রানা সম্পূর্ণ অরক্ষিত। পাশ ফিরে নিরাপদ কাভারের খোঁজে ছুট লাগাল ও, পিছন থেকে ওকে ধাওয়া করল তপ্ত সীসা। চার টানেলের একটা ইণ্টারসেকশনে পৌঁছুতেই ওর মুখের সামনে দেয়ালের চলটা ওঠাল শত্রুর বুলেট। চোখ আর নাকে-মুখে ধুলো ঢুকে গেল, কাশতে কাশতে সাইড-টানেলে ঢুকে পড়ল রানা, অন্ধের মত। এদিকটা ঢালু হয়ে গেছে, পানি অনেক গভীর... কিছু বুঝে ওঠার আগেই গলা পানিতে আছড়ে পড়ল ও।

চারদিকে থিকথিকে বর্জ্য ভাসছে, তার স্পর্শ আর গন্ধে রি রি করে উঠল সর্বাঙ্গ। কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে সোজা হলো রানা, পিস্তলটা ত্রস্ত হাতে পানির উপরে তুলে পরিষ্কার করে নিল, এবার আর মিসফায়ারের ভয় নেই। সাবধানে একটু পিছিয়ে গেল ও, নোংরা পানিতে ডুবু ডুবু ভঙ্গিতে লুকিয়ে পড়ল। আবারও অ্যামবুশ করবার ইচ্ছে।

একটু পরেই আলোকিত হয়ে উঠল টানেলের ইণ্টারসেকশন, এগিয়ে আসছে খুনিরা। রানা কোন্ টানেলে ঢুকেছে, তা দেখতে

পায়নি ওরা, ওখানে পৌঁছে দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। নিচু গলায় নিজেদের ভিতরে পরামর্শ করে নিল তারা, তারপর দু'জন দু'দিকে যাবার সিদ্ধান্ত নিল। ওরিয়েন্টাল খুনিকে নিজের দিকে আসতে দেখে ডুব দিল রানা, তলিয়ে গেল আবর্জনাময় পানিতে। নীচ থেকে দেখল, সারফেসে ঘুরে বেড়াচ্ছে ফ্ল্যাশলাইটের আলোকরশ্মি—ওকে খুঁজছে খুনি। আলোটা অন্যদিকে ঘুরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর ধীরে ধীরে মাথা জাগাল।

টানেলের মুখে দেখা যাচ্ছে ওরিয়েন্টালকে, ফিরে যাচ্ছে ইন্টারসেকশনে। বোধহয় কল্পনাও করেনি এখানকার আবর্জনাময় পানিতে রানা লুকিয়ে থাকতে পারে। লোকটার পিঠে গুলি করবার ইচ্ছে বহু কষ্টে দমন করল রানা। এক হাতে মুখ মুছে নরম গলায় ডাকল, 'এক্সকিউজ মি, একটা তোয়ালে পাওয়া যাবে?'

পাঁই করে ঘুরে গেল ওরিয়েন্টাল খুনি, সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের মাঝখানটা লক্ষ্য করে সিগ-সাওয়ারের ট্রিগার চাপল রানা। শীতের কাঁপুনিতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, তবে পুরোপুরি নয়... বুকের বদলে খুনির কাঁধে আঘাত হানল বুলেট। আধপাক ঘুরে গেল সে। রানার পরের গুলিটা তার কপালের পাশ দিয়ে ঢুকল। তাল হারিয়ে পানিতে আছড়ে পড়ল খুনি, একটা খিচুঁনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল।

তৃতীয় খুনির অপেক্ষায় চুপচাপ বসে রইল রানা, আশা করছে গুলির আওয়াজ শুনে সে ছুটে আসবে। কিন্তু সে-আশার গুড়ে বালি। পাঁচ মিনিট পেরিয়ে যাবার পরেও তার চেহারা দেখল না ও। লোকটা কোন্ শ্রেণীর প্রফেশনাল, তা বোঝা যাচ্ছে এবার—একেবারে প্রথম শ্রেণীর। সহজাত ইন্সটিঙ্কট চাপা দিয়ে কাজ করতে জানে। সে-কারণেই পজিশন ছেড়ে নড়েনি।

জানে, গুলিদুটো যদি ওর সঙ্গী করে থাকে, তা হলে সে-২ ডাকবে তাকে। ডাক যেহেতু শোনেনি, এখন সে সতর্ক। বোকার মত পা দিচ্ছে না ফাঁদে।

আর অপেক্ষা করার মানে হয় না, উল্টো ঘুরে সাঁতরাতে শুরু করল রানা, এগিয়ে চলল স্রোতের সঙ্গে। গভীর অংশটা পেরিয়ে একটু পরেই আবার অগভীর টানেলে পৌঁছে গেল, ওখান থেকে শুরু করল হাঁটা। একের পর এক মোড় ঘুরল ও, এগোচ্ছে অন্ধের মত। পথ হারিয়েছে অনেক আগেই। যে-পথে এসেছে, সে-পথে আর ফিরতে পারবে না।

সামনে একটা ল্যাডার দেখতে পেয়ে থেমে দাঁড়াল রানা। বেশ কিছুক্ষণ হলো পিছনে আলো দেখতে পায়নি, সম্ভবত পিছিয়ে পড়েছে খুনি। সুযোগটা কাজে লাগাবে বলে ঠিক করল, পিস্তলটা কোমরে গুঁজে ল্যাডার বেয়ে তর তর করে উপরে উঠে গেল ও। ভারী একটা লোহার হ্যাচ বসানো আছে ল্যাডারের মাথায়, কয়েক বার ধাক্কা দিয়েই টের পেল, খুলবে না ওটা। জ্যাম হয়ে আছে... শেষ কবে খোলা হয়েছে কে জানে। হতাশায় ডুবে গেল মন। পরক্ষণে আঁতকে উঠল, টানেলের শেষ মাথায় আলো দেখা যাচ্ছে... এসে গেছে শত্রু। যতটা পিছিয়ে পড়েছে ভেবেছিল, আসলে ততটা পিছায়নি। কপালটাই মন্দ।

তাড়াতাড়ি ল্যাডার থেকে নেমে আবার হাঁটতে শুরু করল রানা। কিছুদূর যেতেই দেখা পাওয়া গেল শুকনো কিছু টানেলের। একটু অবাক হলো ও, এত বৃষ্টির পরেও টানেলগুলো শুকনো থাকে কী করে? তবে এ-নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে, নোংরা পানি থেকে মুক্তি পাওয়া যাচ্ছে, তা-ই ঢের। শুকনো একটা টানেলে ঢুকে পড়ল ও। পঞ্চাশ গজের মত এগোতেই পায়ের তলায় পানি উদয় হলো, চোখের পলকে গোড়ালি পর্যন্ত উঠে এল পানির ধারা, তারপরে কানে ভেসে এল স্রোতের

গর্জন। সামনে আলো ফেলতেই দেখল, হুড়মুড় করে ছুটে আসছে ময়লা পানির বিশাল এক দেয়াল।

সিউয়ার নেটওয়ার্কের টানেলগুলোর মাঝে অসংখ্য ভালভ আছে, ওগুলোর সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা হয় পানির প্রবাহ। মাঝে মাঝে সিউয়ারেজ ওয়ার্কাররা সেই ভালভ বন্ধ করে দেয়; অন্যপাশে যথেষ্ট পরিমাণ পানি জমে যাবার পর একসঙ্গে ছেড়ে দেয় সব, যাতে পানির প্রেশারে টানেলে আটকে থাকা ময়লার স্তূপ ভেসে চলে যায়। অমনই একটা টানেলে ঢুকেছে রানা।

উল্টো ঘুরে ছুট লাগানোর উপায় নেই, ওদিকে অপেক্ষা করছে খুনি। ঝট্ করে একপাশে সরে গেল রানা, ইঁটের খাঁজে আঙুল আটকে শরীর মিশিয়ে রাখল দেয়ালে। ওর গায়ের উপর আছড়ে পড়ল পানির ঢল, ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইল। কোনোমতে দেয়াল আঁকড়ে স্থির রইল রানা।

খানিক পর পানির তোড় কমে এল। হাঁটু গেড়ে বসে হাঁপাল ও কিছুক্ষণ। চকিতে পিছনে নজর বোলাল, আলোর দেখা নেই, তবে শত্রু খুব পিছিয়ে আছে বলে মনে হয় না। কয়েক সেকেণ্ড জিরিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, ছুটতে থাকল লঘু কদমে।

নতুন একটা জাংশানে এসে পৌঁছুল রানা, ওখানে এসে মিলিত হয়েছে বড় বড় অনেকগুলো সিউয়ারেজ টানেল। চারদিকে শোভা পাচ্ছে নানা ধরনের ভালভ আর গেইট। বড় একটা ভালভ কেসিঙের পিছনে লুকাল ও, আকারে ওটা মোটামুটি একটা লোকোমোটিভ বয়লারের সমান। সিগ-সাওয়ারের ম্যাগাজিন চেক করল, একদম খালি। বাড়তি অ্যামিউনিশনও নেই সঙ্গে। এগজিটের খোঁজে চোখ বোলাতে শুরু করল, আর তখুনি ঝড়ের বেগে জাংশানে ঢুকল অস্ত্রধারী লোকটা। একটুও হাঁপাচ্ছে না সে, নড়ছে চপল হরিণের মত।

তীক্ষ্ণ চোখে তাকাচ্ছে চারদিকে, একই সঙ্গে নড়ছে হাতে ধরা পিস্তল আর ফ্ল্যাশলাইট।

পা টিপে টিপে লোকটার ব্লাইণ্ড সাইডে চলে গেল রানা, দশ ফুট দূর থেকে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপরে। জাপটাজাপটি করে দুজনে আছড়ে পড়ল ভেজা মেঝেতে। খুনির হাত থেকে অস্ত্র আর আলোটা ছুটে গেছে, তাকে মাটিতে চেপে ধরল রানা। কিন্তু লোকটাও কম যায় না, এক ঝটকায় ওকে ফেলে দিল গায়ের উপর থেকে। তারপর গড়ান দিয়ে উঠে এল রানার গায়ের উপরে। রানার গলায় সাঁড়াশির মত চেপে বসল তার দু'হাত। বাতাসের অভাবে খাবি খেতে থাকল রানা, কণ্ঠনালী ভেঙে যাবে যে-কোনও মুহূর্তে। অন্ধের মত হাত নাড়ল ও, দু'হাতে চেপে ধরল প্রতিপক্ষের মাথা, বুড়ো আঙুলদুটো বসিয়ে দিল তার দু'চোখে, চাপ দিল সর্বশক্তিতে। কাতরে উঠে রানাকে ছেড়ে দিল লোকটা, পিছিয়ে গিয়ে উঠে দাঁড়াল। কাশতে কাশতে রানাও উঠে দাঁড়াল।

পরস্পরের দৃষ্টি এক হয়ে রইল কয়েক মুহূর্তের জন্য। প্রতিপক্ষের চোখে পরিষ্কার খুনের নেশা দেখতে পেল রানা। পরক্ষণে হুঙ্কার ছেড়ে লোকটা ছুটে এল ওর দিকে। বাউলি কেটে তাকে ফাঁকি দিল ও, পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এক হাতে মাপা কারাতে চপ বসাল খুনির ঘাড়ে। দড়াম করে মুখ থুবড়ে পড়ল লোকটা, পড়েই গড়ান খেলো, তারপরেই বিদ্যুৎগতিতে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল আবার। এবার তার চোখে সম্ভ্রম দেখা দিয়েছে—বুঝতে পারছে প্রতিপক্ষ আনাড়ি নয়। ঝুঁকি নিতে রাজি হলো না, চঞ্চল চোখে খুঁজে বের করল মেঝেতে পড়ে থাকা পিস্তলটা, ঝাঁপ দিল ওটাকে হাতে পাবার জন্য।

রানাও ঝাঁপ দিয়েছে, প্রায় একইসঙ্গে পিস্তলের পাশে আছড়ে পড়ল দুজনে। ছোঁ মেরে অস্ত্রটা তুলে নিতে চাইল খুনি, কিন্তু

রানার হাতের এক ঝাপটায় ওটা চলে গেল দূরে। পাশ ফিরে একটা ঘুসি চালাল লোকটা, থুতনির তলায় আঘাত পেয়ে গুঙিয়ে উঠল রানা। তাই বলে দমল না, প্রতিপক্ষকে ক্রল করে এগোতে দেখে হাত চালাল, খপ্ করে ধরে ফেলল তার কোমরের বেল্ট, একটানে আবারও নিয়ে এল নিজের কাছে।

শোয়া অবস্থাতেই হাঁটু চালাল খুনি। তলপেটে গুঁতো খেয়ে গড়িয়ে চলে গেল রানা কয়েক ফুট দূরে। চারপাশে যান্ত্রিক গুঞ্জন শোনা গেল—স্বয়ংক্রিয়ভাবে লোহার পাল্লা নেমে আসছে টানেলগুলোর মুখে। আবারও পানি জমিয়ে ছাড়া হবে। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। লক্ষ করল, উবু হয়ে পিস্তলটা কুড়িয়ে নিচ্ছে ইয়োরোপিয়ান খুনি। একটু নিচু হয়ে ছুটে গেল ও, কাঁধ দিয়ে সজোরে আঘাত হানল লোকটার পেটে। হুঁক করে একটা শব্দ করল সে, পিছিয়ে গেল কয়েক পা। সোজা হবার চেষ্টা করতেই সোলার প্লেক্সাসে রানার শক্ত হাতের একটা ঘুসি খেলো, হাঁসফাঁস করতে করতে পিস্তল তাক করতে চাইল ওর দিকে।

সর্বশক্তিতে লোকটার বুকে লাথি হাঁকাল রানা। তাল হারিয়ে আরও পিছাল সে, চলে গেল একটা টানেলের মুখে, চিৎ হয়ে পড়ে গেল। নড়বার সময় পেল না, তার আগেই উপর থেকে নেমে এল ভারী লোহার পাল্লা—সরাসরি তার বুকের উপর। মড়মড় করে হাড় ভাঙার আওয়াজ হলো, পাঁজর গুঁড়িয়ে দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে পাল্লাটা। চিৎকার বেরিয়ে এল খুনির মুখ দিয়ে, কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য... দেহটা দু'টুকরো হয়ে গেল, প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে আগেই।

হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল রানা। চল্লিশ মিনিট পর টানেল ইন্সপেকশনের জন্য আসা দুজন সিউয়ারেজ ওয়ার্কার উদ্ধার করল ওকে।

তিন

হোটেলে ফিরে সোজা বাথরুমে ঢুকল রানা। উদ্ধারকারীদেরকে নয়-ছয় বুঝিয়ে দিয়ে এসেছে—বলেছে খোলা ম্যানহোল দিয়ে সিউয়ারেজ লাইনের ভিতরে পড়ে গিয়েছিল। খুনিদের কাউকে দেখেনি ওরা, রানাকে পাবার আগেই পানিতে ভেসে গিয়েছিল তৃতীয় লোকটার লাশ... তারপরেও গল্পটা অবিশ্বাস্যই বটে। কিন্তু ওদেরকে কোনও ধরনের জেরা করবার সুযোগ দেয়নি রানা। একটা সেলফোন ধার করে রানা এজেন্সির প্যারিস শাখা-প্রধান অর্জন ফরহাদকে ফোন করেছিল, দশ মিনিটের মাথায় অকুস্থলে হাজির হয়ে রানাকে উদ্ধার করেছে সে। পৌঁছে দিয়েছে হোটেলে।

এক ঘণ্টা সময় নিয়ে ডেটল মেশানো গরম পানিতে গোসল করল রানা, গোটা একটা সাবান ঘষল শরীরে, মাথায় শ্যাম্পু করল, মুখ ধুল, দাঁত মাজল... সবশেষে সিকি বোতল সুগন্ধী মাখল গায়ে। দেহ পরিষ্কার হয়ে গেল এতে, সুবাস ছড়াল; কিন্তু তারপরেও ঘিনঘিনে ভাবটা দূর হলো না কিছুতেই। সিউয়ারেজের ময়লা যেন চামড়ার তলায় স্থায়ীভাবে ঢুকে গেছে, এখনও বিকট সেই দুর্গন্ধ নাকে লাগছে ওর। ব্যাপারটা কাল্পনিক, আর কিছু না... মনকে প্রবোধ দিয়ে একটা ড্রিঙ্ক নিয়ে বসল রানা। ঠাণ্ডা মাথায় গত কয়েক ঘণ্টার ঘটনাগুলো খতিয়ে দেখতে শুরু করল।

সুপরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয়েছিল ওর উপরে—গুদাঁ

দু লিপিনে-র ডায়েরিটা কেড়ে নেবার জন্য। জিনিসটার ব্যাপারে এত আগ্রহী কেন ওই রহস্যময় জাপানি কালেক্টর? সামান্য একটা ডায়েরি কবজা করবার জন্য তিন-তিনজন প্রফেশনাল খুনিকে মাঠে নামায় না কেউ—ব্যাপারটাকে হালকা চোখে দেখবার কোনও অবকাশ নেই। রহস্যের শেষ এখানেই নয়... ছিনতাইকারী ছেলেটাকে গুলি করল কে? কেন? কী তার স্বার্থ? জার্নালটা চায়? তা হলে তিন খুনির পিছু পিছু সেই লোকও রানাকে ধাওয়া করেনি কেন?

পুরো ব্যাপারটার পিছনে অগাস্ত দুভাঁর হাত আছে বলে মনে হচ্ছে। এটাও অস্বাভাবিক। দুভাঁকে খুব ভাল করে চেনে রানা—নিপাট ভালমানুষ, জেনেশুনে ওকে বিপদে ফেলবার লোক নয় সে, বেঈমানীও করবে না ওর সঙ্গে। তা হলে? বাধ্য করা হয়েছে দুভাঁকে? কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে যায়নি তো ওর বন্ধুটি?

টেলিফোনের রিসিভার তুলে দুভাঁর বাসায় রিং দিল রানা। ওপাশ থেকে ভেসে এল নারীকণ্ঠ। সোফি, দুভাঁর বউ।

'হ্যালো?'

'সোফি? আমি রানা বলছি।'

'হাই, রানা! কী খবর?'

'দুভাঁ আছে? ওর সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার।'

'সরি, রানা। ও তো ফেরেনি। আজ রাতে ফিরবেও না। কী নাকি একটা জরুরি কাজে ওকে প্যারিসের বাইরে যেতে হচ্ছে। ঘণ্টাখানেক আগে ফোন করেছিল।'

'জরুরি কাজ?'

'হ্যাঁ। আগামী দু'তিনদিন না-ও ফিরতে পারে। আমাকে দুশ্চিন্তা করতে মানা করেছে। আর হ্যাঁ... তোমাকে একটা মেসেজ দিতে বলেছে।'

'কী মেসেজ?'

'দুঃখ প্রকাশ করেছে... তোমাকে ঝামেলায় ফেলবার জন্য। ওর নাকি কিছু করার ছিল না। ব্যাপারটা কী, একটু বলবে? ও আমাকে কিছুই খোলাসা করে বলল না। কী ঝামেলায় ফেলেছে তোমাকে?'

'তেমন কিছু না,' প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল রানা। 'রিল্যাক্স। পরে কথা হবে, কেমন?' লাইন কেটে দিল ও।

ব্যস, আর কোনও সন্দেহ নেই। দুভাঁই ওকে টোপ বানিয়েছিল খুনিদের সামনে। এখন গা-ঢাকা দিয়েছে, কিংবা তাকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে, যাতে রানা ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে না পারে। কিন্তু কেন? কী আছে লিপিনের জার্নালে? জিনিসটা তো ওরও নয়, হায়দারের! দুশ্চিন্তা ভর করল রানার মাথায়। পানামায় হায়দারও বিপদে পড়েনি তো? কেন যেন ওখানে ছুটে যাবার তাগিদ অনুভব করছে, মনে হচ্ছে ওখানে গেলেই মিলবে সমস্ত প্রশ্নের জবাব। কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়। ঢাকায় ফিরে যাবার নির্দেশ পেয়েছে ও বিসিআই হেডকোয়ার্টার থেকে, বোধহয় নতুন কোনও অ্যাসাইনমেণ্ট গছাবে বুড়ো।

ড্রয়ার থেকে লিপিনে জার্নালটা বের করল রানা। প্লাস্টিকের প্যাকেটে মুড়ে রাখায় সিউয়ারেজের পানিতে তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি ওটার। মলাট আর চারপাশের কিনার মৃদু ভিজেছে কেবল, শুকিয়ে নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। হায়দার কি তা হলে ঠিকই ভেবেছে? এর ভিতরে কি লুকানো আছে ইনকা-গুপ্তধন পাবার কোনও সূত্র? সাবধানে কয়েকটা পাতা উল্টাল ও, পড়বার চেষ্টা করল। যদ্দূর বুঝল, এণ্ট্রিগুলো রুটিন গোছের... আলাদা কোনও বিশেষত্ব নেই ওগুলোর। অবশ্য ফরাসি ভাষার স্বল্প জ্ঞান নিয়ে লেখার অর্থ পুরোপুরি বোঝাও সম্ভব নয়। সাহায্য প্রয়োজন। তার আগে দরকার পরামর্শ।

খানিক ভাবনাচিন্তা করে টেলিফোনের রিসিভার আবার তুলে

নিল রানা, ডায়াল করল বিসিআই হেডকোয়ার্টারের সিকিওর্ড চ্যানেলে—সরাসরি চিফের নাম্বারে। খুটখাট আওয়াজের পর ভেসে এল গুরুগম্ভীর গলা।

'ইয়েস?'

দিব্যচোখে রানা দেখতে পেল, প্রায়ান্ধকার রুমটায় বসে আছেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান, চুরুটের ধোঁয়ায় ভরে আছে ঘরটা। কাঁচাপাকা ভুরুর নীচে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা এত দূর থেকেও যেন অনুভব করতে পারছে ও। পুরোটাই কল্পনা, তারপরও বুকটা কেন যেন ঢিব ঢিব করতে থাকল। কোনোরকমে নার্ভাসনেসটা কাটিয়ে বলল, 'রানা, স্যর।'

'ইয়েস, এমআরনাইন, কী খবর?'

সন্ধ্যার পুরো ঘটনা চিফকে খুলে বলল রানা, নিজের উদ্বেগ আর সন্দেহের বিষয়গুলোও তুলে ধরল তাঁর সামনে। সব শোনার পর গম্ভীর হয়ে গেলেন রাহাত খান। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'হুম, রহস্যটা জটিলই বটে। তোমার সঙ্গে আমি একমত, এর শেকড় লুকিয়ে আছে পানামায়।'

'এখন তা হলে কী করব, স্যর?'

'তোমার পিছনে তিনজন খুনি পাঠানো হয়েছিল... এ-ধরনের ঘটনা চুপচাপ বরদাশত্ করবার পক্ষপাতী নই আমি। তা ছাড়া জার্নালটা ড. আলী হায়দারের কাছ থেকেও একইভাবে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতে পারে ওই জাপানি কালেক্টর, ওর নিরাপত্তাও দরকার।'

আশায় দুলে উঠল রানার মন। 'আমি কি তা হলে, স্যর...'

'হ্যাঁ, পানামায় যাবে তুমি,' সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন রাহাত খান। 'ব্যাপারটা শুধু তোমার বন্ধু বা আমাদের দেশের একজন খ্যাতিমান আর্কিয়োলজিস্টের নিরাপত্তা বিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আমার ধারণা, তলে তলে আরও বড় কিছু ঘটছে ওখানে।'

‘এ-কথা বলছেন কেন, স্যর?’

‘কয়েকদিন আগে জর্জের সঙ্গে পানামা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল আমার,’ নুমা... অর্থাৎ ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সির ডিরেক্টর, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের কথা বলছেন বিসিআই চিফ, দুজনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হলেও গোপনে আমেরিকার ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্স হিসেবে কাজ করে নুমা। ‘ওখানকার পরিস্থিতি নিয়ে আমেরিকা সম্প্রতি বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। বিদেশি কিছু শক্তি পানামা খালের নিয়ন্ত্রণ নেবার চেষ্টা করছে বলে গোপন সূত্রে খবর পেয়েছে ওরা। খালটার গুরুত্ব নিশ্চয়ই জানো? উত্তর আর দক্ষিণ আমেরিকার সামুদ্রিক বাণিজ্যের একটা বিশাল অংশ পরিচালিত হয় পানামা খালের মাঝ দিয়ে। বাংলাদেশেরও অনেক জাহাজ ব্যবহার করে ওটা—আমেরিকার পূর্ব উপকূল আর ইয়োরোপের পশ্চিম উপকূলের বিভিন্ন দেশে রফতানির মালামাল পৌঁছে দেয় ওরা। ওখানে কোনও ঝামেলা দেখা দিলে আমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হব।’

‘জার্নালের সঙ্গে এই ব্যাপারটার সম্পর্ক আছে ভাবছেন কেন?’ একটু দ্বিধান্বিত হলো রানা।

‘স্রেফ ইনট্যুইশন,’ বললেন রাহাত খান, ‘তবে একেবারে অযৌক্তিক বলে মনে করি না। ছোট্ট দেশ পানামা... ওখানে একই সঙ্গে দু’-দুটো গোলমাল চলবার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। বিশেষ করে জার্নালটা যেহেতু পানামা খালের একজন প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ারের লেখা, এটাকে বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা বলে ভাবতে পারছি না কিছুতেই।’

‘আমারও তা-ই মনে হচ্ছে, স্যর,’ একমত হলো রানা।

‘জর্জ আগেই সাহায্য চেয়ে রেখেছে আমার কাছে—ব্যাপারটা তদন্ত করবার ব্যাপারে। পানামার সঙ্গে আমেরিকার কূটনৈতিক সম্পর্ক অত্যন্ত নড়বড়ে, নিজেদের কাউকে পাঠাতে পারছে না

ওরা। ছোটখাট ঘটনাও ওদের জন্য আন্তর্জাতিক স্ক্যাণ্ডালে পরিণত হতে পারে। তাই চাইছিল বাইরের কাউকে পাঠাতে। আমি অবশ্য এর সঙ্গে জড়াতে রাজি হইনি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে...' কথাটা আর শেষ করলেন না রাহাত খান। নির্দেশ দিলেন, 'যত তাড়াতাড়ি পারো রওনা হয়ে যাও। ডায়েরিটা পৌঁছে দাও তোমার বন্ধুর কাছে। এরপর ওর সঙ্গেই থেকো। আবারও কেউ ওটা ছিনিয়ে নিতে চাইলে বাধা দিতে পারবে... কারা এর পিছনে জড়িত, তাও হয়তো বা খুঁজে বের করতে পারবে। আমি এদিক থেকে জর্জকে জানিয়ে দিচ্ছি তোমার যাওয়ার খবর। প্রয়োজন দেখা দিলে ওর সাহায্য পাবে।'

'ঠিক আছে, স্যর।' একটু ইতস্তত করল রানা। 'ইয়ে... দুভাঁর ব্যাপারে কী করব? ও কোনও বিপদে পড়েছে কি না বুঝতে পারছি না।'

'এ-মুহূর্তে ড. হায়দার তোমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি,' বললেন রাহাত খান। 'দুভাঁর বিষয়ে রানা এজেন্সির প্যারিস ব্রাঞ্চ খোঁজখবর নিক। ও-দিকটা আমি দেখব। তুমি পানামায় যাও।'

'ওকে, স্যর।'

'সাবধানে থেকো, রানা। যদ্দূর বুঝতে পারছি... এক নয়, একাধিক প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করতে হবে তোমাকে। যে-কোনও মুহূর্তে বড় ধরনের বিপদে পড়তে পারো।'

'আমি সাবধানেই থাকব, স্যর।'

'বেস্ট অভ লাক, এমআরনাইন।'

চার

ছত্রিশ ঘণ্টা পর।

পানামার রিও টুইরা নদী ধরে ভটভটিয়ে এগিয়ে চলেছে মোটর বোট, ওটার প্রাচীন আউটবোর্ড ইঞ্জিন ক্রমাগত মরণডাক ছাড়ছে। বিকট আওয়াজে কান ঝালাপালা, এ-অবস্থায় কথা বলা সম্ভব নয়, তাই আরোহীরা নিশ্চুপ। বোটের পিছনের আলোড়িত পানির উপরে পাক খাচ্ছে এগজস্ট থেকে বেরুতে থাকা কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী—ইঞ্জিনটা রাক্ষসের মত তেল খাচ্ছে, কিন্তু ঠিকমত পোড়াতে পারছে না; কালো ধোঁয়া বানিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে পিছনে।

বাউয়ের কাছে বসে আছে রানা, কর্ণকুহরে চলতে থাকা অত্যাচারকে অগ্রাহ্য করে উপভোগ করছে নদীর নির্মল মুক্ত বায়ু। বাতাসে চুল উড়ছে, শুকিয়ে গেছে ঘামে ভেজা খাকি বুশ শার্ট, এখন গায়ে লাগছে স্বস্তির পরশ। পায়ের কাছে পড়ে আছে ডাফল ব্যাগ, তাতে রয়েছে বাড়তি কাপড়চোপড় আর টুকিটাকি দরকারি জিনিস। পকেটে রয়েছে মহামূল্যবান লিপিনে জার্নাল। ওর পিছনে পাটাতনে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে দুজন লোকাল গাইড, তৃতীয়জন ইঞ্জিন অপারেট করছে—ওদেরকে *এল্ রিয়াল* থেকে ভাড়া করা হয়েছে। বোটও ওখান থেকে নেয়া। হাজারতিনেক লোক বাস করে নদীতীরের শহরটায়, হায়দারের এক্সপিডিশন এরিয়ার সবচেয়ে নিকটবর্তী জনপদ ওটা। ওখানকার

এয়ারস্ট্রিপেই চার্টার করা বিমান থেকে নেমেছে ও আর কারমেন কপোলা।

ঘাড় ফিরিয়ে বন্ধুপত্নীর দিকে তাকাল রানা, উদাস ভঙ্গিতে ওর কয়েক হাত পিছনে বসে আছে মেয়েটা, বিরক্ত চোখে তাকিয়ে আছে নদীর ধারের জঙ্গলের দিকে। ইঞ্জিনের বিকট আওয়াজে ক্ষণে ক্ষণে ওখান থেকে উড়ে পালাচ্ছে পাখির ঝাঁক। ইমেইলে দেখা ছবির তুলনায় অনেকটাই ব্যতিক্রম কারমেন, মনে মনে ভাবল রানা। সুন্দরী, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু ছবিতে যতটা সারল্য অনুভব করেছিল, আদপে তা নয়। মধ্য আমেরিকার স্থানীয় তরুণী নয়, কারমেনের চলন-বলন আর সাজসজ্জা আমেরিকান আধুনিকাদের মত। ল্যাটিন মেয়েদের তুলনায় ফর্সা। মেদহীন আকর্ষণীয় ফিগার। মাথাভরা কোঁকড়া কালো কেশ, নেমে গেছে পিঠ ছাড়িয়ে; এখন অবশ্য বাতাসের অত্যাচার এড়াতে খোঁপা বেঁধে রেখেছে। চকচকে খাকি প্যান্ট-শার্ট পরেছে সে, রঙটা রানার খাকির তুলনায় কিছুটা গাঢ়। ফর্সা চামড়ার সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে গেছে পোশাকটা, ওকে দেখাচ্ছে টুম রেইডার ভিডিও গেমের নায়িকা লারা ক্রফ্টের মত।

কোস্টারিকা বর্ডারের কাছাকাছি ডেভিড নামের একটা শহরে রানার সঙ্গে মিলিত হয়েছে কারমেন, একটা চার্টার্ড বিমানে চেপে। বিমানটা রানাই পাঠিয়েছিল ওকে পিকআপ করবার জন্য। হায়দারের কাছে দ্রুত পৌঁছুতে চাইছে রানা, তাই প্যারিস থেকে সরাসরি ফ্লাইটে পানামা সিটিতে যায়নি, বরং খ্যাত-অখ্যাত চারটা কানেক্টিং ফ্লাইট ধরে ডেভিডে পৌঁছেছে, কারমেনকেও আনিয়ে নিয়েছিল ওখানে। ডেভিড থেকে আরেকটা বিমানে চেপে দারিয়েন প্রভিন্সের এল্ রিয়ালে আসায় টোটাল জার্নি টাইম প্রায় পনেরো ঘণ্টা কমিয়ে নিতে পেরেছে। ওর তাড়াহুড়ো লক্ষ করে একটু অবাক হলেও টেলিফোনে কোনও প্রশ্ন করেনি কারমেন।

বুদ্ধিমতী মেয়ে... আঁচ করে নিয়েছিল, নিশ্চয়ই এর পিছনে যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণ আছে; সময় হলে রানা নিজেই সেটা খুলে বলবে। ডেভিডে দেখা হবার পর সংক্ষেপে হায়দারের নিরাপত্তার বিষয়ে উদ্বেগের কথা তাকে জানিয়েছে রানা। লিপিনে জার্নালটা নিয়ে কী ধরনের বিপদে পড়েছিল, সেটাও বলেছে। ওর আশঙ্কা যে একেবারে অমূলক নয়, সেটাও বোঝা গেছে কারমেনের কথা শুনে। গত দু'দিন থেকে হায়দারের সঙ্গে ওর কোনও যোগাযোগ নেই... রেডিওতে ডাকাডাকি করেও সাড়া পাওয়া যায়নি। রানা যে লিপিনে জার্নালটা কিনতে পেরেছে, সে-খবর স্বামীকে জানাতে পারেনি কারমেন।

কারমেনকে যত দেখছে ততই বিস্ময় অনুভব করছে রানা। দু'দিন থেকে হায়দারের খোঁজখবর নেই, তারপর রানার মুখে বিপদের কথা শুনেছে... অথচ উদ্বেগের ছিটেফোঁটাও লক্ষ করা যাচ্ছে না মেয়েটির মধ্যে। ডেভিডের বিমানবন্দরে যখন বিমান থেকে নামল, মনে হচ্ছিল না স্বামীর খোঁজে গহীন জঙ্গলে যাচ্ছে; বরং সিল্কের বহুমূল্য ড্রেস, গলায় মুক্তোর মালা আর শরীর থেকে ভুর ভুর করে বেরুতে থাকা দামি অবসেশন পারফিউমের গন্ধে মনে হচ্ছিল কোনও ইভ্‌নিং পার্টির জন্য বেরিয়েছে সে। এল্‌ রিয়ালে পৌঁছুনোর পর পোশাক বদলেছে বটে, কিন্তু সময় নিয়ে মেকআপ চড়িয়েছে মুখে, লিপস্টিক দিয়েছে, চুল সাজিয়েছে। রীতিমত তাড়া দিতে হয়েছে রানাকে তখন। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। সাজসজ্জা নিয়ে অতিমাত্রায় সচেতন অনেক মেয়েকে দেখেছে রানা, কিন্তু এতটা নয়। মনের ভিতরে ক্ষীণ সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে—হায়দারকে কি আদৌ ভালবাসে কারমেন? একটুও শঙ্কা কেন দেখছে না ওর মধ্যে? এ-ধরনের উদাসীনতা শুধুমাত্র অপছন্দের কারও ক্ষেত্রেই আশা করা যায়। দাম্পত্য জীবন হয়তো সুখী নয় ওদের। প্রসঙ্গটা নিতান্তই ব্যক্তিগত বলে কিছু

জিজ্ঞেস করতে পারছে না রানা।

স্বামীর ব্যাপারে উদ্বেগ না দেখালেও কাজকর্ম ঠিকমতই করছে কারমেন। এল্ রিয়ালে আগেও এসেছে ও, স্থানীয় লোকজনকে চেনে। রানাকে কিছু করতে দেয়নি, নিজেই ভাড়া করেছে বোট আর গাইড। গাইডেরা বোটের মালিকের ভাইপো। তিনজনই সশস্ত্র—একটা করে এম-সিক্সটিন রাইফেল রয়েছে প্রত্যেকের সঙ্গে। কলাম্বিয়ান নার্কো-গেরিলাদেরকে মোকাবেলা করবার জন্য। ওদের ঘাঁটি অবশ্য অনেকটা উত্তরে বলে শুনেছে রানা, তবে গাইডেরা কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নয়।

দেড় ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে এল্ রিয়াল থেকে রওনা হবার পর। নদী ধরে জঙ্গলের অনেকটাই ভিতরে ঢুকে পড়েছে ওরা। সূর্য উঠে এসেছে মাথার উপর, কড়া রোদ প্রতিফলিত হচ্ছে কালচে পানির বুকে—সরাসরি তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। দু'পাশে ঘন অরণ্য, গায়ে গা ঠেকিয়ে রেখেছে বৃক্ষরাজি, উপরে তাদের শাখা-প্রশাখা আর পাতা দিয়ে তৈরি করে রেখেছে ঘন আচ্ছাদন। জলধারার উপরে ফিতের মত এক চিলতে আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখবার উপায় নেই। রঙ বলতে আকাশের নীল, পানির কৃষ্ণবর্ণ আর দু'পাশে সবুজে সবুজ। সেণ্ট্রাল দারিয়েন প্রভিন্স দুনিয়ার সেরা বার্ড-ওয়াচিং স্পটগুলোর অন্যতম। তার প্রমাণও দেখা যাচ্ছে ইঞ্জিনের আওয়াজে উড়ে যাওয়া পাখিদের দিকে তাকিয়ে। রঙ-বেরঙের হাজারো প্রজাতির পাখিদের স্বর্গরাজ্যে যেন পৌঁছে গেছে ওরা।

ইঞ্জিনের আওয়াজ বদলে গেল হঠাৎ। থ্রটল কমিয়ে দিয়েছে সারেং। আগের চেয়ে অনেক আস্তে যাচ্ছে এখন বোট। ভুরু কুঁচকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার... স্পিড কমাল কেন?'

কারমেন বলল, 'নদীর সামনের অংশটা বিপজ্জনক—অগভীর; ডুবোপাথরে ভরা। স্থানীয়রা এর নাম দিয়েছে খুনে পানি। পাথরে

ধাক্কা খেয়ে প্রায়ই নৌকাডুবি হয়। সাবধানে না এগোলে আমাদেরও একই দশা হবে।'

শ্রাগ করে আবার পানির দিকে তাকাল রানা। স্রোতের মাঝে খয়েরি কয়েকটা রেখা দেখা যাচ্ছে। ডানদিকে একটা খাল আছে, ওখান থেকে কাদা মেশানো পানির একটা ধারা মিশেছে নদীর এই শাখাটার সঙ্গে। পরিবেশটা অদ্ভুত লাগছে ওর কাছে। দু'দিন আগে লক্ষ-কোটি মানুষে ভরা মহানগরী প্যারিসে ছিল ও, আর এখন... ওরা পাঁচজন ছাড়া আর কোনও মানুষ নেই ত্রিসীমানায়। একেবারে নির্জন, জনমানবহীন এক অরণ্যের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলেছে অজানার উদ্দেশে। খারাপ লাগছে না, বরং ভিতর ভিতর রোমাঞ্চ অনুভব করছে। তবে কারমেনের মাঝে সেই রোমাঞ্চ নেই, তার চোখেমুখে রাজ্যের বিরক্তির ছাপ।

'তোমার মনে হয় পরিবেশটা ভাল লাগছে না,' মৃদু স্বরে বলল রানা।

ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল কারমেন। 'না। এসব আমার জন্য নতুন নয়।' ধীরে ধীরে ঘুরে বসল। 'প্রথম প্রথম হায়দারের সঙ্গে প্রচুর ঘোরাঘুরি করেছি এই এলাকায়। তখন অবশ্য মজাই লাগত...'

'এখন আর লাগে না?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কারমেন। 'হায়দারের টাকা আছে। দিনের পর দিন জঙ্গলে পড়ে থাকার কোনও প্রয়োজন নেই ওর। পানামা সিটিতে আমাদের একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে, গাড়ি আছে। ওখানকার জীবন অনেক বেশি আরামের।'

'বিয়ের আগে এসব ভাবা উচিত ছিল না? ওর পেশাটাই তো এমন।'

'জানি,' হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে আয়না আর লিপস্টিক বের করে ঠোঁটে রঙ চড়াতে শুরু করল কারমেন। 'আসলে তখন প্রেমে

হাবুডুবু খাচ্ছিলাম, বাস্তবতা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। ভাবিনি হায়দারের পেশাটা আমাদের দাম্পত্য জীবনে কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে।'

এর পরে প্রশ্ন এসে যায়, এখন ও ডিভোর্সের কথা ভাবছে কি না। কিন্তু নিজেকে সংযত করল রানা। ওদের ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক না গলানোই ভাল। প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে দেখাবার মত কী পেয়েছে হায়দার, জানো? ওই যে... সেদিন টেলিফোনে যেটা বলেছিলে?'

'আমি ঠিক শিয়োর না। নদীর উজানে একটা মরা আগ্নেয়গিরি আছে। জ্বালামুখের জায়গায় আছে বিশাল এক হ্রদ। ভলকানিক ওই লেক থেকেই নদীটার উৎপত্তি—জলপ্রপাত হয়ে নীচে নেমেছে। গত কিছুদিন থেকে ওখানে তল্লাশি চালাচ্ছিল হায়দার। হয়তো কিছু খুঁজে পেয়েছে।'

এরপর আর কথা হলো না। সামনে নজর ফেরাল রানা। পানির গভীরতা সত্যিই কমতে শুরু করেছে। সূর্যের আলোয় ক্ষণে ক্ষণে দেখা যাচ্ছে তলদেশ। একটু পর সংকীর্ণও হতে থাকল, চেপে এল দুই পাড়। পানির উপর ঝুঁকে থাকা গাছের ডালগুলো স্পর্শ করল পরস্পরকে, মাথার উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল আকাশ। পানির কাছাকাছি নেমে এসেছে লতাপাতা আর মাকড়সার ঝুল। কয়েক দফা মাথা নামাতে হলো ওগুলোর হাত থেকে বাঁচতে। আবছায়া পরিবেশ, আর্দ্রতাও বাড়ছে। ঘামতে শুরু করল আরোহীরা।

'পৌঁছে গেছি প্রায়,' ঘোষণার সুরে বলল কারমেন।

অনেকগুলো শাখা দেখা গেল নদীর দু'পাশে—ছোট-বড় সব আকারেরই আছে। কাদা মেশানো পানি বইছে ওগুলো থেকে। রানা লক্ষ করল, সামনের বেশ কিছু গাছের মাথা ন্যাড়া। যেন ঝড় বয়ে গিয়েছিল ওগুলোর উপর দিয়ে। নদীর খরস্রোতা

কয়েকটা অংশ পেরুল ওরা, পাথরে বাড়ি খেয়ে ওখানে সাদা ফেনা তুলছে পানি। একটু পরেই দু'ধারে ভাঙাচোরা পাথুরে দেয়াল চোখে পড়ল ওর। প্রাকৃতিক নয়, মনুষ্যনির্মিত। প্রাচীন, ক্ষয়ে যাওয়া... ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। দেয়ালের বিভিন্ন অংশ থেকে সম্প্রতি পরিষ্কার করা হয়েছে আগাছা আর শ্যাওলার স্তর, ফলে বহু শতাব্দী পর আবার রোদের স্পর্শ পাচ্ছে সারফেস।

ভাঙা দেয়ালের মাঝ দিয়ে ডানে মোড় নিয়ে একটা খালের ভিতরে ঢুকে পড়ল বোট। এটা আরও সরু, অন্ধকার।

'পিছনের দেয়ালগুলোর কারণে ওখানে দশ ফুট উঁচু একটা জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়েছিল,' বলল কারমেন। 'আসলে ওটা বাঁধ... নদীর প্রবাহ আটকাবার জন্য বহু বছর আগে তৈরি করেছিল কেউ। হায়দারের ধারণা, পাথরগুলো এখানকার নয়, দূরের কোনও পাথরখনি থেকে আনা। নদীর মুখ আটকে উজানের দিকে নৌকা চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল, যাতে উপত্যকার ভিতরে ঢুকতে না পারে লোকে।'

'কারা বানিয়েছিল ওই বাঁধ?' জিজ্ঞেস করল রানা। লক্ষ করল, উপত্যকার এ-অংশে গাছপালার সংখ্যা কম। বাঁধের কারণে এ-পাশটা বহুদিন পানির তলায় ডুবে ছিল, গাছপালা ঠিকমত জন্মাতে পারেনি।

'হায়দারের বিশ্বাস—ইনকা-রা। ওদের টোয়াইস-স্টোলেন ট্রেজারের গল্প সম্ভবত তুমি শুনেছ। হায়দার ভাবছে ওগুলো এদিকেই কোথাও পাওয়া যাবে। বাঁধের নির্মাণশৈলীতে ইনকাদের কারিগরি ছাপ আছে। ব্যাপারটা কো-ইনসিডেন্স হতে পারে না।'

গল্পটা রানার জানা। ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে মেক্সিকান আযটেকদের বিরুদ্ধে হার্নান কর্টেজের মহাবিজয়ের পর দক্ষিণ আমেরিকার ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠে স্প্যানিশ কংকুইস্টেডর-রা। ইনকা সাম্রাজ্যের বিশাল স্বর্ণ-ভাণ্ডারের উপর চোখ পড়েছিল ওদের।

একশো উনসত্তর জন সৈন্য আর সাতাশটা ঘোড়া নিয়ে রাজা প্রথম চার্লসের আশীর্বাদপুষ্ট কংকুইস্টেডর নেতা ফ্রান্সিসকো পিযারো ১৫৩১ সালে পেরুতে আসেন। ইনকা সাম্রাজ্যে তখন ভয়াবহ এক গৃহযুদ্ধ চলছে—ক্ষমতার লোভে লড়াই করছেন রাজপুত্র হুয়াস্কার ও তাঁর সৎভাই আতাহুয়ালপা।

১৫৩২ সালে পরাজিত হলেন হুয়াস্কার, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাজধানীর দখল নেবার জন্য রওনা হলেন আতাহুয়ালপা... আর তখুনি টালমাটাল পরিস্থিতির সুযোগ নিলেন পিযারো। কাহামারকা নামের এক শহরে আতাহুয়ালপা-র সঙ্গে দেখা করবার ছলে ঝটিকা আক্রমণ চালালেন, আটক করলেন সদ্য-বিজয়ী নতুন সম্রাটকে। তাঁর মুক্তিপণ হিসেবে বিশাল দুটো কামরা-ভর্তি সোনাদানা দেয়া হয়েছিল পিযারোকে, তবুও আতাহুয়ালপাকে মৃত্যুদণ্ড দেন তিনি, এরপর দখল করে নেন ইনকাদের রাজধানী কাযকো। কোনও বাধা পেতে হয়নি তাঁকে, কারণ এর আগেই হুয়াস্কারকে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছে আতাহুয়ালপার অনুসারীরা, ইনকা সাম্রাজ্য ছিল নেতৃত্বশূন্য। স্প্যানিশদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মত কেউ ছিল না। কাযকো দখলের পর আতাহুয়ালপার ভাই মাংকো কাপাক-কে পুতুল রাজা হিসেবে সিংহাসনে বসায় স্প্যানিশরা।

কয়েক বছর পর বিদ্রোহ ঘোষণা করেন মাংকো কাপাক। তবে সেই বিদ্রোহ সফল হয়নি। পালিয়ে গিয়ে ভিটকোস নামের এক পাহাড়ি এলাকায় আত্মগোপন করেন তিনি, ওখান থেকে চালাতে থাকেন চোরাগোপ্তা লড়াই। শেষ পর্যন্ত ১৫৪৪ সালে তাঁকে হত্যা করে স্প্যানিশরা। এর মাঝে ইনকা সাম্রাজ্যের প্রচুর সোনা-রূপা পাচার হয়ে গেছে ইয়োরোপে। লিমার সমুদ্রবন্দর থেকে জলপথে ওগুলো পানামা সিটিতে নিয়ে যাওয়া হতো, তারপর মালবাহী খচ্চরের বহরের সাহায্যে পাঠানো হতো

ক্যারিবিয়ান উপকূলের নম্‌ব্রে দি দিয়োস ও পোর্তো বেলো ট্রেডিং পোস্টে। বছরে দু'বার রাজকীয় গ্যালিয়নের বহর এসে সংগ্রহ করত সোনা-রূপা, নিয়ে যেত স্পেনে।

গেরিলাযুদ্ধের অংশ হিসেবে ছোট ছোট অনেকগুলো দলকে পানামায় পাঠিয়েছিলেন মাংকো কাপাক, গহীন অরণ্যের মাঝ দিয়ে যাবার সময় খচ্চরের বহর আক্রমণ করে ইনকাদের লুণ্ঠিত সোনা-রূপা উদ্ধার করত ওরা। ওগুলো সরিয়ে নিত অজ্ঞাত স্থানে। মাংকো কাপাক ভেবেছিলেন স্প্যানিশদেরকে দেশ থেকে হটানোর পর ওই ধনসম্পদ ইনকা সাম্রাজ্যের পুনর্গঠনে কাজে লাগবে। এ-সব সোনাদানাই টোয়াইস-স্টোলেন ট্রেজার নামে পরিচিত। মাংকো কাপাকের বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ায় লুকানো ওই সম্পদ আর কোনোদিন জনসমক্ষে আসেনি, পানামার জঙ্গলের কোনও অজ্ঞাত জায়গায় আজও পড়ে আছে আজকের বাজারমূল্যে কয়েক বিলিয়ন ডলারের সোনাদানা।

অবশ্য এই গল্পের পুরোটাই কিংবদন্তি। বিশ্বাসযোগ্য কোনও প্রমাণ বা আলামত নেই এর পিছনে। ইনকা ট্রেজার সম্পর্কিত সবচেয়ে বড় গল্পটি ছিল হুয়াস্‌কারের গুপ্তধনের, যা তার অনুসারীরা আতাহুয়ালপার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য লুকিয়ে ফেলেছিল। কয়েক বছর আগে সেই গুপ্তধন আমেরিকা-মেক্সিকো সীমান্ত থেকে উদ্ধার করেছে রানা*, এরপর আর কোনও ইনকা-গুপ্তধন কোথাও থাকতে পারে বলে কেউ বিশ্বাস করে না। পানামার জঙ্গলে স্প্যানিশ ক্যারাভান থেকে সোনাদানা লুঠ হতো বলে কিছু রেকর্ড আছে বটে, কিন্তু সেগুলো মিথ্যে রিপোর্ট হবারই সম্ভাবনা বেশি। লোভী স্প্যানিশ সৈন্যরা হয়তো নিজেরাই ওগুলো সরিয়ে লুঠ হয়েছে বলে প্রচার করত। এই এলাকায় কখনও

---

* *রক্তপিপাসা* দ্রষ্টব্য।

ইনকারা এসেছিল বলে প্রমাণ নেই। হায়দার অবশ্য ব্যতিক্রম, ওর চিন্তাধারা অন্য রকম। অ্যাকাডেমিক সার্কেলের মতামতকে উপেক্ষা করে মরীচিকার পিছনে ঘোরা ওর স্বভাব। আগেও বহুবার ঘুরেছে... এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছে।

তবে প্রাচীন বাঁধটা দেখার পরে ব্যাপারটাকে আর মরীচিকা বলে মনে হচ্ছে না রানার কাছে। যদ্দূর ও জানে, পানামার প্রি-কলাম্বিয়ান সভ্যতায় এ-ধরনের বাঁধ তৈরির কোনও নির্দশন নেই। এখানকার আদিবাসী কুনা সম্প্রদায় নিয়ে স্প্যানিশরাও কখনও মাথা ঘামায়নি, কারণ ওদের কাছে কোনোদিনই মূল্যবান কিছুই ছিল না। প্রায়-প্রস্তর যুগের মানুষ ছিল কুনা-রা, এ-রকম বাঁধ তৈরির মত কারিগরি জ্ঞান ওদের ছিল না। পাথরগুলো লক্ষ করেছে রানা—একেবারে চৌকো, এককেটার ওজন দেড় থেকে দু'টনের কম নয়। ডিজাইনেও কোনও স্প্যানিশ ছাপ নেই, বরং ইনকাদের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন মাচু পিচু শহরের দেয়ালগুলোর সঙ্গে বেশ মিল আছে। বাঁধটা ইনকাদের বানানো ভাবতে দোষের কিছু নেই। হায়দার সম্ভবত ঠিক পথেই এগোচ্ছে।

পানির বিপজ্জনক অংশটা পেরিয়ে এসেছে বোট, সারেং ফের থ্রটল বাড়াল। খাল ধরে দ্রুত বেগে ছুটে চলল জলযান। দু'পাশের ঝোপঝাড় অনেক জায়গায় কেটে ফেলা হয়েছে, মাটিও খোঁড়া হয়েছে বেশ কিছু স্পটে, উচুঁ হয়ে আছে ঢিবি। হায়দারের কাজ, অনুমান করল রানা।

দশ মিনিটের মত এগোল ওরা, তারপরেই কারমেনের ইশারা পেয়ে থ্রটল বন্ধ করে দিল সারেং। স্রোতের টানে এখন সামনে ভেসে চলেছে বোট।

'পৌঁছে গেছি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল কারমেন। 'ওই যে... ওই গাছের সারিটা পেরুলেই হায়দারের ক্যাম্প।' হাত তুলে কতগুলো গাছ দেখাল

ও। 'রিসার্চ অ্যাসিসটেন্ট আর ওয়ার্কার-সহ ওরা সতেরোজন থাকে ওখানে।'

বোটের আওয়াজ শুনে কেউ উদয় হলো না নদীর ধারে। আরেকটা ব্যাপার অস্বাভাবিক। সুনসান নীরবতা বিরাজ করছে চারদিকে। ইঞ্জিন বন্ধ হতেই চারপাশ থেকে বুনো আওয়াজ শুনতে পাবে বলে আশা করেছিল রানা—পাখির ডাক, পোকামাকড়ের ঝিঁঝিঁ, বানরের কিঁচকিঁচ, ইত্যাদি; কিন্তু বাস্তবে কিছুই কানে আসছে না। না, আউটবোর্ডের গগনবিদারী আর্তনাদ শুনতে শুনতে কানে তালা লেগে যায়নি... বোটের খোলে পানির ছলাৎছল পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে ও, শুনতে পাচ্ছে না কেবল প্রাণের কোনও সাড়াশব্দ। গাইডদের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে দেখল রানা, ওদেরও খটকা লাগছে। আকাশের দিকে তাকাল, অনেক উপরে অলস ভঙ্গিতে চক্কর দিচ্ছে একটা নিঃসঙ্গ শকুন।

ভয় ফুটল গাইডদের চেহারায়। উত্তেজিত গলায় কী যেন বলাবলি করল ওরা, তারপর হাত বাড়াল অ্যাসল্ট রাইফেল তুলে নেবার জন্য।

'কী বলছে ওরা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

লোকগুলোর সঙ্গে স্থানীয় ভাষায় কথা বলল কারমেন, তারপর রানার দিকে ফিরে বলল, 'বিপদের ভয় করছে... ফিরে যেতে চাইছে।'

'কোনোকিছু না দেখেই?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না, সেনিয়র,' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলে উঠল গাইডদের লিডার, তার নাম হুয়ান। 'এখানে খারাপ কিছু ঘটে গেছে। হয়তো হামলা করেছিল গেরিলারা। দেখছেন না, লোকজনের কোনও সাড়াশব্দ নেই?'

'এখনও কিছুই দেখিনি আমি,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'তা ছাড়া এত কাছে এসে ফিরে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। কিছু ঘটেছে

কি ঘটেনি, সেটা খুব শীঘ্রি জানা যাবে।'

'আপনি ভুল করছেন, সেনিয়র...'

'চুপচাপ এগোতে থাকো। খবরদার, বোট ঘোরাবার চেষ্টা করলে তোমাদের কপালে খারাবি আছে।'

জোর গলায় কথা বললেও মনের ভিতরে কুডাক ডাকছে রানার। দীর্ঘদিন বিপজ্জনক পেশায় কাটানোর ফলে ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, গোলমাল আছে এখানে... বড় ধরনের গোলমাল! গাইডদের দোষ দিতে পারল না—নার্ভাস ভঙ্গিতে রাইফেল আঁকড়ে ধরে রেখেছে তারা, ভয়ার্ত চোখে তাকাচ্ছে চারদিকে। স্রোতের টানে ভেসে চলা বোট ছাড়া আর কিছুই নড়ছে না। গাছের পাতাও স্থির। অশুভ পরিবেশ।

আরেকটু এগোতেই মৃদু একটা গন্ধ পেল রানা। পরিচিত গন্ধ... মৃত্যুর, মাংস-পচা! এই গন্ধ খুব ভাল করে চেনে ও। গাছের সারিটা পেরুতেই তার সত্যতা পাওয়া গেল।

নদীর ধারে বেশ খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে তৈরি করা হয়েছে ক্যাম্প, খাটানো হয়েছে ডজনখানেক তাঁবু। সেদিকে তাকাতেই রক্ত হিম হয়ে এল দর্শকদের। পুরো ক্যাম্পজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে মানুষের লাশ! এলোমেলোভাবে। আঁতকে ওঠার মত একটা আওয়াজ করল কারমেন। গাইডেরাও বিড়বিড় করে ঈশ্বরের নাম জপছে। শুধু রানা নিশ্চুপ। থমথমে চোখে কয়েক মুহূর্ত জরিপ করল দৃশ্যটা, তারপর সারেংকে নির্দেশ দিল, 'তীরে চলো।'

নাক ঘোরাতেই ভাসতে ভাসতে নদীতীরে গিয়ে থমকে দাঁড়াল বোট, তলা লেগে গেছে মাটিতে। লাফ দিয়ে নেমে পড়ল রানা। বোটের দড়ি নিয়ে বেঁধে ফেলল একটা খুঁটিতে। তীক্ষ্ণ চোখে চারদিক ভাল করে দেখল, বোঝার চেষ্টা করল আশপাশে

কেউ লুকিয়ে আছে কি না। জীবিত প্রাণী বলতে স্রেফ কয়েকটা শকুন দেখা গেল, লাশের গা ঠোকরাচ্ছে। পাথর ছুঁড়ে মারতেই ওগুলো বিরক্ত হয়ে উড়ে চলে গেল।

কারমেনকে বোটেই অপেক্ষা করতে বলল রানা, তিন গাইডকে নীচে নামাল। সতর্ক পদক্ষেপে ক্যাম্পে প্রবেশ করল চারজনে। লাশগুলো দেখে বিস্ময় অনুভব করল রানা—মনে হচ্ছে আচমকা মৃত্যু হানা দিয়েছে এখানে। যে-যেখানে ছিল, সেখানেই ঢলে পড়েছে। কয়েকজন পড়ে আছে পানির ধারে, পাশে বালতি... বোধহয় পানি আনতে যাচ্ছিল; কয়েকজনের সামনে পড়ে আছে আধ-খাওয়া খাবারের প্লেট। বোটকা গন্ধ ভাসছে বাতাসে।

নাকে রুমাল বেঁধে নিল রানা, হুয়ান ও তার দুই ভাইকে চারপাশ তল্লাশি করতে পাঠাল, তারপর নিজে এগোল মেইন টেন্টের দিকে। বাকিগুলোর চেয়ে ওটা আকারে বড়, বাইরে রেডিও অ্যান্টেনা আছে। অনুমান করল, হায়দারকে ওখানেই পাওয়া যাবে। কী অবস্থায় পাবে, তাও আন্দাজ করতে পারছে। প্যারিসের ঘটনার পর যে-আশঙ্কা করছিল, সেটাই সম্ভবত সত্যি হতে চলেছে। এখানকার সঙ্গে সুস্পষ্ট সম্পর্ক আছে ওটার। এক দেখাতেই বুঝতে পেরেছে, সাধারণ কোনও খুনোখুনি ঘটেনি এখানে। টাইমিংটাও অদ্ভুত। লাশগুলোর গায়ে পচনের পরিমাণ দেখে বোঝা যাচ্ছে, অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা আগে মারা গেছে এরা। প্যারিসে রানার উপরে আক্রমণটা ব্যর্থ হবার পরপরই। কিন্তু কেন? কিছু কি আবিষ্কার করে ফেলেছিল হায়দার? রানাকে কী যেন দেখাতে চাইছিল... কী সেটা?

ফ্ল্যাপ ঠেলে মেইন টেন্টে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল রানা। দৃশ্যটা অপ্রত্যাশিত নয়, তারপরেও প্রিয় বন্ধুকে এভাবে দেখবে বলে তৈরি ছিল না। ক্যানভাস বিছানো মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে

আছে আলী হায়দার—পরনে শর্টস্, টি-শার্ট আর বুট। প্রাণহীন। কপালে তৃতীয় নয়নের মত ফুটে আছে একটা বুলেটের গর্ত। দু'চোখ মেলা, দৃষ্টিতে শূন্যতা। পড়ে থাকার ভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছে কিছু বুঝে ওঠার আগেই মারা গেছে ও।

হাঁটু গেড়ে লাশের পাশে বসল রানা, হাত বুলিয়ে বন্ধ করে দিল বন্ধুর চোখের পাতাদুটো। নিজের অজান্তেই দাঁতে দাঁত চাপল। আসতে বড্ড দেরি করে ফেলেছে ও।

পাঁচ

কয়েক মিনিট মূর্তির মত বসে রইল রানা। এরপর আবেগের লাগাম টেনে উঠে দাঁড়াল। অদ্ভুত এক কাঠিন্য ভর করেছে ওর চেহারায়। এর জন্য যারা দায়ী, যেমন করে পারে তাদেরকে নিজ হাতে শাস্তি দেবে ও।

টেন্টের ভিতরে নজর বোলাল রানা। তছনছ করা হয়েছে সব। উল্টে ফেলা হয়েছে হায়দারের বিছানা, ব্যাগ খুলে বের করা হয়েছে সব কাপড়চোপড়, কাগজপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে চারদিকে। উল্টে-পাল্টে পড়ে আছে টেবিল-চেয়ার। কাণ্ডটা যে কলাম্বিয়ান গেরিলাদের নয়, তা পরিষ্কার। অন্তত লাখখানেক ডলারের কমিউনিকেশন আর সার্ভে ইকুইপমেন্ট পড়ে আছে টেন্টের ভিতরে, ওগুলোয় হাত লাগানো হয়নি। লুটপাটই যদি উদ্দেশ্য হতো, তা হলে জিনিসগুলো ফেলে রেখে যেত না খুনিরা।

তারমানে হায়দারকে হত্যা করা হয়েছে কোনোকিছু ধামাচাপা দেবার জন্য... কিংবা পথের কাঁটা সরাবার জন্য।

টেন্ট থেকে বেরিয়ে এল ও। হাঁটতে হাঁটতে তাকিয়ে দেখল চারপাশের নারকীয়তা। কাউকে রেহাই দেয়নি খুনিরা—হায়দারের টিমের সব সদস্যকে তো খুন করেছেই; ক্যাম্পের খোঁয়াড়ে রাখা ছাগল আর মুরগিগুলোকেও গুলি করেছে। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, মানুষ বা পশুপাখি... কারও শরীর থেকেই খুব বেশি রক্ত বেরোয়নি। কারণ কী!

বোটের কাছে যেতেই কারমেনের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির মুখোমুখি হতে হলো।

'আ... আমি দুঃখিত, কারমেন,' নিচু গলায় বলল রানা। 'হায়দার...'

বাকিটা বলার প্রয়োজন হলো না, নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে উঠল মেয়েটা। মুখ ঢাকল দু'হাতে।

'ওকে দেখতে চাও?' নরম গলায় জানতে চাইল রানা।

'না,' মাথা নাড়ল কারমেন। 'অমন দৃশ্য সহ্য করতে পারব না আমি।'

হুয়ান এগিয়ে এসেছে। রানাকে জানাল, আশপাশে জীবিত কাউকে খুঁজে পায়নি। হামলাকারীদেরও কোনও চিহ্ন নেই। লাশ গুনে দেখা হয়েছে—হায়দারের টিমের সবাই মৃত, কেউ বাঁচেনি। শুনে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'পুলিশে খবর দেয়া দরকার, সেনিয়র,' বলল হুয়ান।

'হ্যাঁ, তা তো বটেই।' কারমেনের দিকে ফিরল রানা। নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছে সে। রুমাল বের করে চোখ মুছে তাকাল ওর দিকে।

রানা বলল, 'পুলিশ না আসা পর্যন্ত হুয়ানকে নিয়ে আমি এখানেই থাকছি। তুমি বাকিদের নিয়ে এল্ রিয়ালে ফিরে যাও।

এয়ারস্ট্রিপে আমাদের বিমানটা আছে, পাইলটকে বললে তোমাকে পানামা সিটিতে পৌঁছে দেবে।'

'আর হায়দার?' ভেজা গলায় জিজ্ঞেস করল কারমেন।

'দেখি, পুলিশের সঙ্গে কথা বলে আজই লাশটা ছাড়িয়ে নিতে পারি কি না। দাফনের জন্য দেশে পাঠাতে হবে। তুমি সঙ্গে যেতে চাও?'

'না,' আবারও মাথা নাড়ল কারমেন। 'বললাম তো, ওসব আমার সহ্য হবে না।'

অবাক না হয়ে পারল না রানা। স্বামীকে শেষ দেখা দেখতে চাইছে না, দাফনের সময় উপস্থিত থাকতে চাইছে না... ব্যাপারটা কী! কিন্তু এ-মুহূর্তে প্রশ্নগুলো না তোলাই ভাল। অগত্যা কাঁধ ঝাঁকিয়ে কারমেনের কথা মেনে নিল ও।

'যা তোমার মর্জি।'

হুয়ান রয়ে গেল, বাকি দুই গাইডকে বাড়তি টাকাপয়সা দিয়ে কারমেন-সহ এল্ রিয়ালের পথে রওনা করিয়ে দিল রানা। ওরাই পুলিশ পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। তবে অন্তত ছ'ঘণ্টার আগে তারা পৌঁছুবে বলে মনে হয় না। বসে না থেকে সময়টা তদন্তের কাজে ব্যয় করবে বলে ঠিক করল রানা। জটিল এক রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে ও।

হত্যাকাণ্ডের মোটিভটা পরিষ্কার নয়। এর পিছনে যদি প্যারিসের সেই জাপানি ধনকুবেরের হাত থাকে, কেন সে পানামা নিয়ে উৎসাহী হয়ে উঠেছে... কেনই বা সতেরোজন মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে ব্যাপারটাকে কলাম্বিয়ান বিদ্রোহীদের কাণ্ড বলে দেখাতে চাইছে... তা অজানা। ক্যাম্পের সাজানো দৃশ্যের ভিতরেও প্রচুর অসঙ্গতি আছে। মানুষের পাশাপাশি গবাদি প্রাণীগুলোকে কেন গুলি করা হয়েছে? লাশের শরীর থেকে রক্তক্ষরণ এত কম হয়েছে কেন? নিহত মানুষগুলো যে-যেখানে

ছিল সেখানেই মারা গেল কীভাবে? গুলি খাবার আগে কেউ পালাবার চেষ্টা করেনি কেন? লড়াই করেনি কেন?

একে একে সবক'টা লাশ পরীক্ষা করল রানা। বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল, কয়েকজনের আঘাত মোটেই গুরুতর ছিল না... তারপরেও মারা গেছে এরা! ক্যাম্পের চারপাশের জঙ্গলে হানা দিল ও। এখানে-সেখানে মরে পড়ে আছে অনেক পাখি; কয়েকটা বানরের লাশও মাটিতে পড়ে থাকতে দেখল। ঠিকমত পচেনি ওগুলো... সবচেয়ে বড় কথা, লাশগুলোর উপর কীটপতঙ্গ হামলা করেনি। একটাই কারণ হতে পারে এর—লাশের গন্ধে দূর থেকে আসা শকুনের পাল ছাড়া পুরো এলাকাই প্রাণশূন্য... কীটপতঙ্গ বা জীবজন্তু, কিছুই বেঁচে নেই ত্রিসীমানায়!

কিচেন টেন্টে ঢুকতেই চোখে পড়ল চিৎ হয়ে পড়ে থাকা কতগুলো মরা তেলাপোকা... আর সঙ্গে সঙ্গে রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে। ন্যাড়া গাছের সারি, নৈঃশব্দ্য আর সব ধরনের জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গের আচমকা মৃত্যু... একটাই অর্থ হতে পারে এর। যে-ব্যাপারটা ধামাচাপা দেবার জন্য ক্যাম্পে গেরিলা আক্রমণের নাটক সাজানো হয়েছে, ওর সামনে তা এখন দিবালোকের মত স্পষ্ট।

ঘাতকের গুলিতে কেউ আসলে খুন হয়নি এখানে।

কয়েক ঘণ্টা পর দূর থেকে ভেসে এল ইঞ্জিনের আওয়াজ, রানা আর হুয়ান তখন গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। আওয়াজ পেয়ে দুজনে নদীতীরে গিয়ে দাঁড়াল। একটু পরেই দৃষ্টিসীমায় উদয় হলো তিনটি জলযান। সামনের বোটটা পরিচিত—যেটায় চড়ে এসেছে ওরা। হুয়ানের দুই ভাই ওটার সাহায্যে গাইড করে নিয়ে আসছে বাকি দুটোকে। দ্বিতীয় বোটের ডেকে দাঁড়িয়ে আছে ঘামে ভেজা ইউনিফর্ম পরিহিত পানামানিয়ান পুলিশের একটা

ছোট দল। তৃতীয় বোটটা মালবাহী, আকারেও বড়। সম্ভবত লাশ বয়ে নেবার জন্য সঙ্গে আনা হয়েছে ওটা। বোটগুলো একেবারে কাছে চলে আসার পর রানা লক্ষ করল, পুলিশ সদস্যদের মাঝে মার্কিন আর্মির ক্যামোফ্লাজ ইউনিফর্ম পরা একটি মেয়েও আছে। মাথার চুল বেরেট ক্যাপের তলায় ঢাকা পড়ে গেছে, কিন্তু আঁটসাঁট ড্রেসের নীচে দেহের লোভনীয় আঁকবাঁক প্রকট হয়ে আছে।

একে একে তিনটা বোট থেকেই দড়ি ছুঁড়ে মারা হলো, সেগুলো পাড়ে গাঁথা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলল হুয়ান। আরোহীরা সবাই নেমে এল তীরে। পুলিশ দলের সবাইকে নাক কোঁচকাতে দেখা গেল, বিবমিষা লুকানোর কোনও চেষ্টা করছে না কেউ। দলটার নেতৃত্ব দিচ্ছে থলথলে শরীরের এক কর্নেল, নাম রডরিগেজ—নাকের নীচে পুরু পাকানো গোঁফ, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। রানার দিকে ফিরেও তাকাল না, হাতছানি দিয়ে হুয়ানকে ডাকল কাছে। হড়বড় করে স্থানীয় ভাষায় কী যেন জিজ্ঞেস করল। হুয়ানও সমান দ্রুততায় জবাব দিতে থাকল তার প্রশ্নের। *মুয়ের্তো, গেরিলেরো, কলাম্বিয়া...* এ-ক'টা শব্দ শুধু আলাদা করতে পারল রানা। হায়দারের নামও শোনা গেল কয়েকবার।

'এক্সকিউজ মি,' পিছন থেকে রিনরিনে কণ্ঠ ভেসে এল। উল্টো ঘুরতেই ইউ.এস. আর্মির ড্রেস পরা মেয়েটিকে দেখতে পেল রানা, ওর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

মাথার ক্যাপ খুলে ফেলেছে সে, ঘাড়ের উপর নেমে এসেছে ববকাট চুল। বয়স খুব বেশি নয়, পঁচিশ পেরিয়েছে বলে মনে হয় না। মায়াময় চেহারা, ঠোঁটদুটো ফোলা ফোলা, লিপস্টিক ছাড়াই গোলাপি। চোখাচোখি হতেই তার চোখে খুঁত দেখতে পেল রানা—মণিদুটো দু'রঙের; একটা নীল, অন্যটা খয়েরি। তবে এই খুঁত তার সৌন্দর্য কমায়নি, বরং করে তুলেছে আরও আকর্ষণীয়। ছিপছিপে দেহের মাঝে উঁচু হয়ে আছে মানানসই মাঝারি

আকারের স্তনদুটো। মাথাকে উঁচু করে রেখেছে সুগঠিত, দীর্ঘ গ্রীবা। রোদে পুড়ে ব্রোঞ্জের রঙ পেয়েছে ফর্সা ত্বক। মিলিটারি ইউনিফর্ম তার আকর্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েক গুণ। সব মিলিয়ে অপূর্ব রূপসী।

'হাই!' সম্ভাষণ জানাবার ভঙ্গিতে বলল রানা।

কুশল বিনিময়ে কোনও আগ্রহ দেখাল না তরুণী। চাঁছাছোলা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কে আপনি?'

'রানা... মাসুদ রানা।' হাত বাড়িয়ে দিল রানা।

'আমি ক্যাপ্টেন নেফারতিতি শেফার্ড,' শক্ত মুঠোয় করমর্দন করল মেয়েটি, রানার চোখ থেকে চোখ সরাল না। নামের সঙ্গে মানানসই ব্যক্তিত্ব রয়েছে। রানি নেফারতিতি প্রাচীন মিশরের এক সম্রাজ্ঞী ছিলেন। 'এখানে আপনি কী করছেন, মি. রানা, জানতে পারি?'

'এক্সপিডিশনটার লিডার আমার পুরনো বন্ধু ছিল,' বলল রানা। 'ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।'

'ড. আলী হায়দার, রাইট?' নোটবুক চেক করল নেফারতিতি। 'আপনিও বাংলাদেশি?'

'হ্যাঁ।'

'হুয়ানের দুই ভাইকে আপনিই পাঠিয়েছেন পুলিশে খবর দিতে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। একটু অবাকই হলো, কথা বলার ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে হুয়ানকে ও আগে থেকেই চেনে। জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কি আপনার পূর্ব-পরিচিত?'

ক্ষীণ হাসি ফুটল সুন্দর ঠোঁটদুটোর মাঝে। 'ইউ.এস. কমাণ্ডের সঙ্গে পানামার অ্যান্টি-ড্রাগ অপারেশনের কো-অর্ডিনেশন করি আমি। হুয়ান আর ওর সঙ্গীরা আমাদের ইনফরমার। এল্ রিয়ালে একটা কাজে এসেছিলাম, হুয়ানের ভাই সিসিলিয়ো আর

জুয়ারেজ ফোন করে এখানকার খবর জানাল। ব্যাপারটা নিজ চোখে দেখার জন্য পুলিশের সঙ্গে চলে এসেছি। আপনার বন্ধু তো বোধহয় ট্রেজার হান্টার ছিলেন, তাই না?'

'উঁহুঁ, আর্কিয়োলজিস্ট। সরকারি পারমিশন নিয়ে এখানে বৈধ এক্সপিডিশন চালাচ্ছিল ও।'

'আপনিও আর্কিয়োলজিস্ট?'

'শৌখিন বলতে পারেন। আমি বেসিক্যালি একজন ইনভেস্টিগেটর... একটা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি চালাই। রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি।'

'নামটা পরিচিত মনে হচ্ছে,' ভুরু কোঁচকাল নেফারতিতি। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল চেহারা। 'জাস্ট আ মিনিট, আপনি কি নুমার সঙ্গে জড়িত?'

'অবৈতনিক উপদেষ্টার একটা পদ আছে বটে।'

'ওহ্ গড, তা হলে আপনার কথাই বলা হয়েছে আমাকে। কাল রাতে নুমা থেকে আনঅফিশিয়ালি আমাকে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশি একজন ইনভেস্টিগেটর বিশেষ কাজে পানামায় আসছেন... প্রয়োজনে আমি যেন তাঁকে সাহায্য করি। মেসেজে আপনার নামও ছিল, আমি তাড়াহুড়োয় ভুলে গিয়েছিলাম। বিদেশি নাম তো!'

'ইটস্ ওকে,' রানাও হাসল। 'এখন তো মনে পড়েছে।'

'আপনার বিশেষ কাজটা কী, আমাকে বলা যায়?'

'আমি এখনও শিয়োর নই, তবে সম্ভবত এখানকার সঙ্গে সম্পর্ক আছে। আসতে দেরি করে ফেলেছি আমি।'

'আপনার বন্ধুর জন্য আমি দুঃখিত, মি. রানা।'

'ধন্যবাদ।'

পুলিশদের উপর নজর চলে গেল নেফারতিতির, সময় নষ্ট না করে বড় বোটে লাশ তুলতে শুরু করেছে তারা। 'এক্সকিউজ মি,'

বলে কর্নেল রডরিগেজের দিকে এগিয়ে গেল সে। দূর থেকে দুজনকে তর্কাতর্কি করতে দেখল রানা। কয়েক মিনিট পর মুখ কালো করে ফিরে এল নেফারতিতি।

'কোনও সমস্যা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'মাথামোটা বেকুবের সঙ্গে কাজ করতে গেলে যা হয়,' চরম বিরক্তি ফুটল নেফারতিতির গলায়। 'পানামা সিটি থেকে ফরেনসিক টিম আনতে চাইছিলাম, ব্যাটা কিছুতেই রাজি হলো না।'

'কেন?'

'নিজেকে মহাজ্ঞানী ভাবে বেকুবটা। এক নজর দেখেই নাকি বুঝে ফেলেছে—ঘটনাটা কলাম্বিয়ান বিদ্রোহীদের, এখানে লুটপাট করবার জন্য এসেছিল। এতক্ষণে নির্ঘাত সীমান্ত পেরিয়ে পগার পার হয়ে গেছে, ওদের পিছনে খামোকা সময় নষ্ট করতে রাজি নয় সে।'

রানাও বিরক্ত হলো। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, খাটুনি এড়াতে চাইছে কর্নেল রডরিগেজ। তাড়াতাড়ি একটা রিপোর্ট জমা দিয়ে ফিরে যেতে চাইছে নিজের আরামদায়ক রুটিনে।

'তারমানে আর কোনও তদন্ত হবে না?'

'না,' বলল নেফারতিতি। 'এই কাণ্ডই ঘটিয়ে চলেছে কুঁড়ের বাদশাটা। গত চার মাসে দারিয়েন প্রভিন্সে চারবার গেরিলা অ্যাটাক হয়েছে... প্রতিবারই একই গল্প। সাধারণত অফিস ছেড়েই বেরোয় না ও; আজ যে ক্রাইম সিন দেখতে এসেছে, সেটাই বিরাট ব্যাপার।'

পুলিশের প্রতি ক্ষোভ দেখেই বোঝা যাচ্ছে দায়িত্বের প্রতি নেফারতিতি কতটা আন্তরিক। হোঁৎকা কর্নেলের কাছে নিজের সন্দেহের কথা বলে লাভ হবে না, তাই মেয়েটার কাছেই সাহায্য চাইবে বলে ঠিক করল রানা।

‘লোকটা সত্যিই ভুল করছে,’ বলল রানা। ‘এখানে আসলে কী ঘটেছে, জানতে চান?’

ভ্রূকুটি করে ওর দিকে তাকাল নেফারতিতি। ‘আপনি জানেন?’

মাথা ঝাঁকিয়ে ওকে একটু দূরে নিয়ে এল রানা। বলল, ‘কলাম্বিয়ান গেরিলারা খুন করেনি এক্সপিডিশন টিমকে। সত্যি বলতে কী... ওরা কেউ খুনই হয়নি।’ বড় করে শ্বাস নিল ও। ‘মানুষগুলো মারা গেছে অদৃশ্য কার্বন-ডায়োক্সাইডের বিষক্রিয়ায়। নদীর উজানে একটা ভলকানিক লেক আছে... আমার ধারণা, ওখান থেকেই নেমে এসেছিল গ্যাসের একটা বিশাল ঢল। লাশগুলোকে পরে গুলি করেছে কেউ। ব্যাপারটাকে গেরিলা অ্যাটাকের মত দেখাতে চেয়েছে।’

অবিশ্বাস ফুটল আমেরিকান ক্যাপ্টেনের চোখে। ‘কী বলছেন এসব?’

‘এখানে আসার পথে বেশ কিছু অসঙ্গতি লক্ষ করেছি আমি,’ বলে চলল রানা। ‘চারদিক একদম চুপচাপ—জঙ্গলে পশুপাখির কোনও আওয়াজ নেই। অথচ পাখির কিচিরমিচির আর বুনো জানোয়ারের ডাকে জায়গাটা সরগরম হয়ে থাকা উচিত। অনেক গাছও ন্যাড়া অবস্থায় দেখেছি—পাতা নেই, যেন ঝড় বয়ে গেছে ওগুলোর উপর দিয়ে।’

‘এসব আমিও লক্ষ করেছি,’ স্বীকার করল নেফারতিতি। ‘কিন্তু তাতে কী?’

‘শুরুতে আমিও বুঝিনি। কিন্তু আশপাশটা ভাল করে দেখার পর পরিষ্কার হয়েছে ব্যাপারটা। তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিল হামলাকারীরা, সব লাশের গায়ে গুলি করেছে বটে, কিন্তু কয়েকটা ইনজুরি মোটেই মারাত্মক ছিল না। অন্তত নড়াচড়া ছাড়াই মরবার কথা ছিল না মানুষগুলোর। ওদের রক্তক্ষরণও হয়েছে খুব কম,

কারণ লাশের শরীর থেকে খুব বেশি রক্ত বেরোয় না। ছাগল আর মুরগিগুলোকে গুলি করেছে অযথাই, গবাদি পশুপাখি মেরে কী লাভ হয়েছে ওদের?'

'মানছি এগুলো অস্বাভাবিক। কিন্তু গ্যাসের ব্যাপারটা বুঝলেন কী করে?'

'বলছি। বনের ভিতরে তল্লাশি চালিয়েছি আমি, অনেক পাখি আর বানরের লাশ পড়ে আছে ওখানে। শরীরে কোনও আঘাত নেই ওগুলোর, হঠাৎ মারা যাবার পিছনে কোনও যুক্তি নেই। ঠিকমত পচনও ধরেনি লাশগুলোয়, পোকা-মাকড় হামলা করেনি ওগুলোর উপর। ক্যাম্পের কিচেন টেন্টে ঢুকে দেখলাম সব তেলাপোকা মরে পড়ে আছে চিৎ হয়ে। সেখান থেকেই ধরতে পারলাম রহস্যটা।'

'কীভাবে?'

'আমার এক পতঙ্গ-বিশারদ বন্ধুর কাছে শুনেছি, পেটের একটা টিউবের সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয় তেলাপোকা। বিষ প্রয়োগ করা হলে ওরা উল্টে গিয়ে পরিষ্কার বাতাস পাবার চেষ্টা করে। কাজেই বুঝে গেলাম, এখানেও তেমনই কিছু ঘটেছে। বিষাক্ত কোনও গ্যাসে মারা গেছে সবাই। কাজটা গেরিলাদের হতে পারে না। ওরা যদি মর্টার বা গ্যাস-গ্রেনেড ব্যবহার করত, তা হলে ভয় পেয়ে পালাবার চেষ্টা করত ক্যাম্পের লোকেরা; যে-যেখানে যে-অবস্থায় ছিল, সেভাবেই মারা পড়ত না। এখানকার পরিস্থিতি শুধু কার্বন-ডায়োক্সাইডের বিষক্রিয়ার সঙ্গে মেলে।'

'আর কোনও গ্যাস হতে পারে না? কার্বন-ডায়োক্সাইড কেন?'

'কারণ ওটা বর্ণ-গন্ধহীন, বাতাসের চেয়ে ভারী, এবং প্রাকৃতিক উৎস থেকে সৃষ্টি হতে পারে। সাধারণ বাতাসের মত

ক্যাম্পের উপর দিয়ে বয়ে যেতে পারে ওটা, কেউ কিচ্ছু বুঝতে পারবে না, স্রেফ দম আটকে মারা পড়বে।' একটু থামল রানা। 'এ-ধরনের ঘটনা আগেও ঘটেছে।'

'কোথায়? কবে?'

'উনিশশো ছিয়াশি সালের আগস্টে... আফ্রিকার ক্যামেরুনে। নায়োস নামে একটা ভলকানিক লেকে আচমকা ইরাপশন ঘটেছিল, ছড়িয়ে পড়েছিল কয়েক হাজার টন কার্বন-ডায়োক্সাইড। সতেরোশ' লোক মারা গিয়েছিল ওখানে। আগ্নেয়গিরির ম্যাগমা চেম্বার থেকে উঠে এসেছিল ওই গ্যাস, মিশে গিয়েছিল লেকের পানিতে। পরে মৃদু ভূমিকম্পের কারণে পানি থেকে বেরিয়ে আসে ওটা... ব্যাপারটা অনেকটা কোকের ক্যান খোলার মত। ঝাঁকি খেয়ে পানির দ্রবণ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল গ্যাস। নীচের পাহাড়ি উপত্যকায় একটা গ্রাম ছিল, ভারী কার্বন-ডায়োক্সাইড ঢাল বেয়ে স্রোতের মত নেমে এসে আছড়ে পড়ে ওখানে, দম আটকে মারা যায় গ্রামের সব মানুষ। সেইসঙ্গে পশুপাখিও।'

'সত্যি?' চোয়াল ঝুলে পড়েছে নেফারতিতির। 'এমন দুর্ঘটনার কথা কোনোদিন শুনিনি তো!'

'খুব কম লোকই শুনেছে। কারণ ওই ধরনের ভলকানিক লেক সারা দুনিয়ায় আর মাত্র একটা আছে... অবশ্য দুটোও হতে পারে,' পাহাড়ের দিকে ইশারা করল রানা, 'যদি আমার অনুমান ঠিক হয় আর কী।'

কী যেন ভাবল নেফারতিতি। তারপর বলল, 'আপনার কথা একেবারে অবিশ্বাস করছি না। কিন্তু গুলির আঘাত? আপনি বলছেন কাজটা কলাম্বিয়ানদের নয়। তা হলে কাদের? কেনই বা লাশের উপরে একগাদা বুলেট অপচয় করেছে?'

'সবচেয়ে বড় প্যাঁচটাই এখানে।' হায়দার এখানে কীসের খোঁজ করছিল, তা ওকে খুলে বলল রানা। প্যারিসে লিপিনে

জার্নাল নিয়ে কী ধরনের বিপদে পড়েছিল নিজে, সেটাও জানাল।

'আপনি বলতে চাইছেন, কাজটা ওই জাপানি টাইকুনের? ইনকাদের টোয়াইস-স্টোলেন ট্রেজার খুঁজে বেড়াচ্ছে সে?'

'স্রেফ একটা থিয়োরি, লোকটার আসল উদ্দেশ্য আরও বড় কিছুও হতে পারে। তবে লাশগুলোকে কেন গুলি করেছে, সেটা কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে।'

'বলুন, আমি শুনছি।'

'হতে পারে হায়দারকে কিডন্যাপ করবার জন্য, কিংবা ওর রিসার্চের কাগজপত্র হাতানোর জন্য হানা দিয়েছিল লোকটা। কিন্তু তার আগেই ক্যাম্পের সবাই মারা গেছে। সে বুঝতে পেরেছিল, আগে হোক, পরে হোক লাশগুলো পাওয়া যাবেই... আর তখন এই অদ্ভুত ঘটনা তদন্ত করতে বিজ্ঞানী আর সরকারি লোকজনের ভিড় লেগে যাবে এখানে। গোপনে যে-কাজ লোকটা করতে চাইছে... ট্রেজার হাণ্ট বা আর কিছু... তাতে বাধা পড়বে এর ফলে। কিন্তু ভেবে দেখুন, ঘটনাটা কলাম্বিয়ান গেরিলা অ্যাটাকের মত করে সাজানোয় কতখানি ফায়দা হচ্ছে তার।'

'পুলিশ আর দশটা সাধারণ খুনোখুনির মত ডিল করছে এটাকে, আর কোনও ব্যাপারে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না,' চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল নেফারতিতির। 'লোকটা চাইলে আগামীকাল থেকেই কাজ করতে পারবে এখানে!'

'এগজ্যাক্টলি!' সায় দিল রানা।

ঘাড় ফিরিয়ে চুরুট টানতে থাকা কর্নেলের দিকে তাকাল নেফারতিতি। 'ওকে এসব বিশ্বাস করানো যাবে না। মাথায় ঘিলু বলতে কিচ্ছু নেই। নিজে যেটা বোঝে সেটার বাইরে আর কোনও কিছু শুনতে বা জানতে নারাজ।'

'সে-কারণেই কথাগুলো ওকে না বলে আপনাকে বললাম,' বলল রানা।

আবার ওর দিকে ফিরল নেফারতিতি। 'কিন্তু আমাকে বলেই বা কী লাভ? এখানে আমার কোনও অথোরিটি নেই। কী-ই বা করতে পারব আপনার জন্য?'

'নুমা যেটার আভাস দিয়ে রেখেছে—সাহায্য,' বলল রানা। 'আগামীকাল আমি ওই লেকটা ঘুরে দেখতে চাই, কয়েকটা স্যাম্পলও নেব। ওখানে যদি কার্বন-ডায়োক্সাইডের ডিপোজিট খুঁজে পাই, তা হলে বারো ঘণ্টার ভিতর ওয়াশিংটন থেকে নুমার একদল এক্সপার্ট নিয়ে আসা যাবে। ক্যামেরুনের লেক নায়োসে কাজ করেছে, এমন দুজন জিয়োলজিস্টকে চিনি; ওদেরকেও খবর দেব। সমস্যা হলো, এখানকার স্থানীয় ভাষা আমি জানি না, অথচ গাইডেন্স আর সিকিউরিটির জন্য হুয়ান আর ওর ভাইদেরকে সঙ্গে রাখা দরকার। দোভাষী চাই আমার—দিনদুয়েকের জন্য। কাজটা কি আপনি করবেন?'

'তাতে কোনও সমস্যা দেখছি না, কিন্তু আপনার আসল মতলবটা কী, বলুন তো?' দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে নেফারতিতির।

'কেন, বুঝতে পারছেন না? যা এড়াতে চাইছে ওই জাপানি লোকটা, যদি সেটাই ঘটে... যদি সত্যিই পুরোদস্তুর একটা সায়েণ্টিফিক টিম এসে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করে এখানে... কী ঘটবে তা হলে?'

'এখানে আর ফিরতে পারবে না সে... অন্তত সবাই চলে না যাওয়া পর্যন্ত তো নয়ই।' দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল নেফারতিতির। 'সুযোগটা কাজে লাগাবেন আপনি, তাই না? ওর মুখের গ্রাস কেড়ে নেবেন... খুঁজে বের করবেন ইনকাদের ট্রেজার। ঠিক?'

'ট্রেজারের ব্যাপারে আমার কোনও আগ্রহ নেই,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'কিছু আছে কি না তা-ই তো জানি না। আমি স্রেফ ওর প্ল্যানে বাগড়া দিতে চাই। যাতে মরিয়া হয়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে লোকটা, সেই সুযোগে ওর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া

করে নিতে পারি।'

'বোঝাপড়া?'

নিষ্ঠুর হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'প্যারিসে আমাকে খুন করবার চেষ্টা করেছে সে, এখানে আমার বন্ধুর লাশের উপর গুলি চালিয়েছে... ওকে তো আমি এমনি এমনি ছেড়ে দিতে পারি না! পারি?'

ছয়

আধঘণ্টার মধ্যে সমস্ত লাশ বোটে তুলে ফেলল পুলিশের লোক। এরপর দলবল নিয়ে ফিরতি পথে রওনা হয়ে গেল কর্নেল রডরিগেজ। রানা, নেফারতিতি আর তিন পানামানিয়ান গাইড রয়ে গেল ক্যাম্পে। রাতটা ক্যাম্পেই কাটাবে বলে ঠিক করেছে রানা—ময়নাতদন্ত আর অন্যান্য ফর্মালিটির কারণে অন্তত চব্বিশ ঘণ্টার আগে হায়দারের লাশ ফেরত পাওয়া যাবে না। এ-মুহূর্তে এল্ রিয়ালে ফিরে গিয়ে লাভ নেই কোনও। লেক সার্ভে করে আগামীকাল ফিরবে বলে ঠিক করেছে ও, তারপর ব্যবস্থা নেবে লাশটা দেশে পাঠাবার। নেফারতিতি কোনও আপত্তি করেনি, তিন গাইডও মোটা অঙ্কের টাকা পেয়ে খুশি... রাজি হয়ে গেছে থাকতে।

রডরিগেজ অবশ্য চরম বিরক্তি প্রকাশ করেছে ওদের সিদ্ধান্ত শুনে। তবে জোর-জবরদস্তি করবার অধিকার নেই তার, যাবার

আগে শুধু বলে গেছে—কিছু ঘটে গেলে ওদের লাশ উদ্ধারের জন্য সে আবার এই অভিশপ্ত জঙ্গলে ফিরতে পারবে না। জবাবে তাকে কড়া কয়েকটা কথা শুনিয়ে দিয়েছে নেফারতিতি, রেগে-মেগে চলে গেছে লোকটা।

সূর্যাস্তের আগেভাগে ঝাঁট দিয়ে ক্যাম্প পরিষ্কার করে রাত কাটাবার উপযোগী করা হলো। লাশ সরিয়ে নেয়ায় এখন আর দুর্গন্ধ নেই, তাঁবুগুলোও অক্ষত আছে... কিন্তু তারপরেও কেন যেন স্বস্তি পেল না রানা। সতেরোজন মানুষ মারা গেছে এখানে, তাদের মৃত্যুর স্পর্শ যেন এখনও লেগে আছে ক্যাম্পের সর্বত্র। এখানে না থাকলেই ভাল হতো, কিন্তু এক রাতের জন্য নতুন ক্যাম্প দাঁড় করানোর মানে হয় না। জায়গা খুঁজে বের করতে হবে, ঝোপঝাড় আগাছা কাটতে হবে, রান্নার আয়োজন করতে হবে... সবমিলিয়ে অনেক ঝামেলা।

সূর্য ডুবে যেতেই ঝপ্ করে নেমে গেল তাপমাত্রা। আঙিনায় অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে আগুন পোহাতে বসল রানা ও নেফারতিতি। কেউ কোনও কথা বলছে না। গম্ভীর হয়ে আছে রানা, সারাক্ষণই চোখে ভাসছে হায়দারের হাসিখুশি চেহারাটা। আর কোনোদিন সেই চেহারা দেখতে পাবে না ভাবলেই হু হু করে উঠছে বুক।

'কী ভাবছেন, মি. রানা?' অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভেঙে জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

'কিছু না,' সংবিৎ ফিরে পেল রানা। একটু হাসল। 'ফর্মালিটি এখন বোধহয় ত্যাগ করা যায়। একসঙ্গে কাজ করতে হবে আমাদেরকে, সম্পর্কটা বন্ধুত্বপূর্ণ হলে ভাল। বার বার *মিস্টার* ডাকলে নিজেকে কেমন যেন দূরের মানুষ মনে হয়। আমাকে শুধু রানা বলে ডাকলে খুশি হব।'

'বেশ তো,' নেফারতিতিও হাসল। 'তবে আমাকে নেফারতিতি ডাকা চলবে না, শুধু নেফি... বন্ধুরা তা-ই ডাকে।

নেফারতিতি বলতে গেলে জিভে জড়িয়ে যায়।'

'নামটা কে রেখেছে?'

'আমার বাবা। ঈজিপ্টোলজিস্ট ছিলেন। ফ্যাসিনেশন ছিল তাঁর রানি নেফারতিতির ব্যাপারে।'

'সুন্দর নাম রেখেছেন, কোনও সন্দেহ নেই। কফি চলবে, নেফি?'

'মন্দ হয় না।'

কিচেন টেন্ট থেকে আনা একটা কেতলিতে কফি চড়িয়ে দিল রানা। ওখান থেকে বিস্কুটের প্যাকেটও আনা হয়েছে, বের করল সেগুলো। বলল, 'আগামীকাল পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া এ-দিয়েই সারতে হবে। অন্যান্য খাবার কন্টামিনেটেড কি'না কে জানে।'

'আমি এখন কিছু খাব না,' বলল নেফারতিতি। 'খিদে নেই।'

রানারও নেই। হুয়ানকে ডেকে তিন গাইডের জন্য বিস্কুট পাঠিয়ে দিল, ওরা ক্যাম্পের পেরিমিটার পাহারা দিচ্ছে। কফি হয়ে গেলে দুটো মগে ঢেলে নেফারতিতির পাশে গিয়ে বসল।

'একটা কথা জিজ্ঞেস না করে পারছি না,' ওর হাত থেকে কফির মগ নিতে নিতে বলল নেফারতিতি। 'লেক থেকে আরেকবার গ্যাসের ইরাপশন হবার সম্ভাবনা কতখানি? আমরা এখানে নিরাপদ তো?'

'ইরাপশনে যাবার মত কার্বন-ডায়োক্সাইডের বিল্ড-আপ হতে প্রচুর সময় লাগার কথা,' বলল রানা। 'সম্প্রতি এক দফা যেহেতু হয়ে গেছে, খুব শীঘ্রি আর হবার ভয় নেই। নিশ্চিন্তে থাকতে পারো।'

'আর ওই জাপানি টাইকুনের লোকেরা? ওরা যদি ফিরে আসে?'

'খুব শীঘ্রি ফিরবে বলে মনে হয় না। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হয়েছে কি না, তা বোঝার জন্য দু'-চারদিন অন্তত অপেক্ষা করবে।

সেটাই স্বাভাবিক।'

'এতটা শিয়োর হচ্ছ কীভাবে?'

'ওদের জায়গায় আমি থাকলে তা-ই করতাম।'

'যদি উল্টোটা ঘটে? ঝুঁকি নিয়ে ওরা যদি আগেই চলে আসে?'

'তাতেও ক্ষতি নেই। আমাদের সঙ্গে অস্ত্র আছে। জঙ্গলের লড়াই অত্যন্ত কঠিন, শুধু লোকবল বেশি থাকলেই জেতা যায় না। গেরিলা ট্যাকটিক্স খাটিয়ে ওদেরকে নাস্তানাবুদ করে দিতে পারব আমরা।'

রানার নিরুত্তাপ কণ্ঠ শুনে একটু অবাক হলো নেফারতিতি। 'আমি ইউ.এস. আর্মির ক্যাপ্টেন... এসব তো আমি বলব! তোমার মধ্যে ভয়-ডর দেখছি না কেন, বলো তো? আর কেউ হলে তো এতক্ষণে এখান থেকে কেটে পড়বার জন্য অস্থির হয়ে উঠত।'

'এককালে আমিও আর্মিতে ছিলাম,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'রিটায়ার্ড মেজর।'

'রিটায়ার করেছ কেন? বয়স তো বেশি নয় তোমার।'

'সে এক লম্বা কাহিনি, পরে নাহয় কখনও বলা যাবে,' প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল রানা। বিসিআই-এ যোগ দেবার জন্য আর্মি থেকে অব্যাহতি নিতে হয়েছে ওকে, কথাটা সবাইকে জানানো চলে না।

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল ও, তার আগেই ক্যাম্পের দিক থেকে ভেসে এল একটা গুলির আওয়াজ। নেফারতিতির রিঅ্যাকশনটা হলো দেখার মত—রানা কিছু করবার আগেই এক লাফে উঠে দাঁড়াল ও, লাথি দিয়ে মাটি ছিটিয়ে দিল আগুনের উপর, চোখের পলকে কোমরের হোলস্টার থেকে বের করে আনল পিস্তল। বিপদ মোকাবেলার জন্য তৈরি। রানাও একই

ভঙ্গিতে একই সময়ে বের করে এনেছে নিজের পিস্তল।

দূর থেকে হুয়ানের কণ্ঠ ভেসে এল, খানিক পরে বাচ্চা একটা ছেলেকে টানতে টানতে কিচেন টেন্টের পিছন থেকে বেরিয়ে এল সে। বাকি দুই গাইডও ততক্ষণে আঙিনায় ছুটে এসেছে।

স্থানীয় ভাষায় কী যেন বলল হুয়ান, নেফারতিতি সেটা অনুবাদ করে শোনাল। 'কিচেন টেন্টের ভিতরে ওকে চুরি করে ঢুকতে দেখেছে হুয়ান। ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে আটক করেছে।'

শান্ত চোখে ছেলেটাকে জরিপ করল রানা। বয়স আট-দশ বছরের বেশি নয়। রোগা। স্থানীয়। সারা গায়ে ময়লার আস্তর। চোখে আতঙ্ক ফুটে আছে।

'কে ও?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'এখানে কোত্থেকে এল?'

ছেলেটার সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল নেফারতিতি। স্থানীয় ভাষাতে পরিচয় জানতে চাইল।

'আমি ইংরেজি জানি,' বলল ছেলেটা। 'আমার নাম পিন্টো।'

'হ্যালো, পিন্টো!' নরম গলায় বলল নেফারতিতি। 'আমি নেফি। এরা আমার বন্ধু—রানা, হুয়ান, জুয়ারেজ আর সিসিলিয়ো।'

ওর কথা বলার ভঙ্গি শুনে একটু যেন আশ্বস্ত হলো ছেলেটা। বলল, 'আমার খিদে পেয়েছে, সেজন্যেই ওখানে ঢুকেছিলাম। সত্যি বলছি, চুরি করতে না!'

ওকে একটা বিস্কুটের প্যাকেট দিল রানা। 'এখানে তুমি কী করছ, পিন্টো? কোত্থেকে এসেছ?'

'হায়দার আঙ্কেলের সঙ্গে কাজ করত আমার পাপা আর মাম্মা। কাল ওরা সবাই হঠাৎ করে ঘুমিয়ে পড়ল... আমি আর কিছুতেই ওদেরকে জাগাতে পারিনি।'

খারাপ লাগল রানার... অবোধ শিশু, মৃত্যু কী জিনিস তা জানে না বেচারা। সাবধানে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ঘুমাওনি কেন?

ওরা যখন ঘুমাল, তখন তুমি কোথায় ছিলে?'

মুখে একসঙ্গে দুটো বিস্কুট ঢোকাল পিন্টো। চিবাতে চিবাতে আঙুল তুলল, 'ওই যে... ওই পাহাড়ে আমি খেলতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ তুফান উঠল, পরে এখানে ফিরে এসে দেখলাম সবাই ঘুমিয়ে গেছে। তারপর গতকাল বিকেলে... গতকাল বিকেলে...' কথা আটকে এল তার।

'আমরা জানি কী ঘটেছে,' ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল নেফারতিতি। 'কয়েকজন লোক এসেছিল এখানে, তাই না? গোলাগুলি করেছে। ওরা কতজন ছিল, বলতে পারবে?'

চারটা আঙুল দেখাল পিন্টো।

'তুমি কি তখন জঙ্গলে লুকিয়ে পড়েছিলে?'

মাথা ঝাঁকাল পিন্টো। 'ওদের হাতে বন্দুক ছিল। বন্দুকঅলা লোকরা খারাপ। ওদের কাছে যেতে আমাকে মানা করেছে পাপা আর মাম্মা। তোমাদের কাছেও সেজন্যে আসিনি।'

'আমরা খারাপ নই,' রানা বলল। 'আমরা তোমার হায়দার আঙ্কেলের বন্ধু।'

দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল ছেলেটার। 'সত্যি? আঙ্কেল তো খুব মজার লোক... খুব ভাল লোক। আমাকে অনেক আদর করত, মজার মজার অনেক গল্প বলত। তুমি গল্প জানো?'

'উঁহুঁ, তবে আমি কাগজ দিয়ে পুতুল বানাতে পারি।'

'আমাকে বানিয়ে দেবে?'

'নিশ্চয়ই।'

হায়দারের টেন্ট থেকে এক টুকরো কাগজ নিয়ে এল রানা। ঝটপট কয়েক ভাঁজ দিয়ে বানিয়ে ফেলল একটা অরিগামি ঘোড়া। হাততালি দিয়ে উঠল পিন্টো।

'আরও বানাও।'

'পরে। আগে তুমি খাওয়া-দাওয়া করো, বিশ্রাম নাও।

তারপর নাহয় দেখা যাবে।'

খাবার আর আদর পেয়ে পনেরো মিনিটেই পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে গেল পিন্টো। খাতির জমিয়ে ফেলল সবার সঙ্গে। খিলখিল করে হাসতে থাকল। শেষ পর্যন্ত জোর করে ওকে নিজের কোলে মাথা রেখে শোয়াল নেফারতিতি। নিচু গলায় গান গাইতে গাইতে ঘুম পাড়িয়ে দিল। তাঁবু থেকে একটা কম্বল এনে ছেলেটার গায়ে বিছিয়ে দিল রানা, বসল নেফারতিতির পাশে।

'চমৎকার সামলেছ,' প্রশংসার সুরে বলল ও। 'তোমার বাচ্চা-কাচ্চা আছে?'

'বিয়েই করিনি,' বলল নেফারতিতি। 'তুমিও তো কম যাও না। অত সুন্দর অরিগামি বানানো শিখেছ কোথায়?'

'জাপানি এক বন্ধুর কাছে। স্রেফ শখের বশে শিখেছিলাম। ও-জিনিস দিয়ে কোনও বাচ্চার মন ভোলানো যাবে বলে ভাবিনি।'

'বাচ্চারা খুব অল্পতেই সন্তুষ্ট হতে জানে। আমাদের মত নয়।'

নেফারতিতির কণ্ঠে বিষাদের সুর। হয়তো মনের ভিতরে গোপন কোনও কষ্ট আছে ওর। কিছু জিজ্ঞেস করল না রানা, তাকাল পিন্টোর ঘুমন্ত মুখের দিকে। নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে ছেলেটা। দুনিয়াটা যদি ওর মত সরল আর নিষ্পাপ হতো, তা হলে কতই না ভাল হতো! বিপজ্জনক এই পেশা বেছে নিতে হতো না রানাকে, পদে পদে নিতে হতো না মৃত্যুর ঝুঁকি। পৃথিবীর সব মানুষ সুখে-শান্তিতে বাঁচতে পারত। কেন হলো না অমন? কেন এত হানাহানি দিলেন সৃষ্টিকর্তা? কেন এই অবুঝ শিশুটিকে নিজ চোখে দেখতে হলো ওর বাবা-মায়ের লাশের উপর গুলি চালানোর দৃশ্য?

'ভাগ্যিস তুমি এখানে থেকে যেতে চেয়েছিলে!' বলে উঠল

নেফারতিতি। 'নইলে তো পিন্টোর খোঁজ পেত না কেউ। একাকী জঙ্গলে পড়ে থাকত ও।'

তা হলে ছেলেটার কী পরিণতি হতো, তা আর ভাবতে চাইল না রানা।

'ওকে নিয়ে কী করবে, কিছু ঠিক করেছ?' জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

'আত্মীয়স্বজন আছে নিশ্চয়ই,' বলল রানা। 'ভাবছি কাল সকালে গাইডদের একজনের সঙ্গে এল্ রিয়ালে পাঠিয়ে দেব। বাকিরা এদিককার কাজ সারব।'

'আর যদি ওর কোনও আত্মীয়কে খুঁজে পাওয়া না যায়?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

রাতে কে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, কেউই বলতে পারবে না; তবে সকালে প্রায় একসঙ্গেই সবার ঘুম ভাঙাল প্রকৃতি। চোখ মেলবার আগেই পাখির কলরব শুনতে পেল রানা, উপত্যকায় ফিরে এসেছে প্রাণের সাড়া। মৃতদের জায়গা নেবার জন্য চলে এসেছে নতুনেরা। শুধু পাখি নয়, অন্যান্য বুনো জানোয়ার আর কীটপতঙ্গের আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। খুব শীঘ্রি ন্যাড়া গাছগুলোয় নতুন পাতা দেখা দেবে, পুরনো সাজে ফিরে যাবে অরণ্য; বোঝাই যাবে না এখানে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেছিল।

পাশ ফিরে নেফারতিতির দিকে তাকাল রানা। পিন্টোকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে সে, একটা হাত চলে এসেছে রানার গায়ে। অপূর্ব চোখদুটো বন্ধ, মাথার চুল এলোমেলো, তাই বলে চেহারার আকর্ষণ কমেনি একবিন্দু। বরং আরও সুন্দর দেখাচ্ছে ঘুমন্ত মুখশ্রী। কয়েক মুহূর্ত পর ধীরে ধীরে খুলে গেল পাতাজোড়া, রানার চোখে চোখ রাখল। মিষ্টি এক টুকরো হাসি ফুটল ঠোঁটের মাঝে।

'গুড মর্নিং!' সম্ভাষণ জানাল রানা।

নেফারতিতি সম্ভাষণের উত্তর দেবার আগেই নিভে যাওয়া অগ্নিকুণ্ডের ওপারে জেগে উঠল হুয়ান আর জুয়ারেজ। চোখ লাল হয়ে আছে... পালা করে রাতভর পাহারা দিয়েছে ওরা। এ-মুহূর্তে পাহারায় আছে সিসিলিয়ো। শব্দ করে কাশল ওরা, থুতু ফেলল। ফস করে সিগারেট ধরাল এরপর। সকালের শান্ত পরিবেশ আর বজায় থাকল না ওদের কারণে।

সাবধানে পিন্টোর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে উঠে বসল নেফারতিতি। বিরক্ত সুরে বলল, 'দেখেছ অবস্থা? মানুষ তো নয়, যেন শীতনিদ্রা থেকে কোনও ভালুক জেগে উঠল। সাতসকালে এত আওয়াজ করে কেউ?'

'আমাকে বোলো না,' রানা ঠাট্টা করল, 'আমি খুব সতর্ক—নিঃশব্দে বিছানায় ওঠানামা করি।'

'করবে না-ই বা কেন? ভালুকের ভূমিকা তো কাল রাতেই নিয়েছিলে তুমি,' ঠাট্টায় যোগ দিল নেফারতিতি। 'বাপ রে বাপ! ওভাবে নাক ডাকায় কেউ?'

কপট ক্ষোভ দেখাল রানা। 'অসম্ভব! কক্ষনো আমার নাক ডাকে না। যদি ডেকেও থাকে, জেনে রাখো, নাক ডাকানো পৌরুষের লক্ষণ।'

'তা হলে যে-হারে নাক ডাকিয়েছ, তাতে তোমাকে শুধু পুরুষ না, মহা... মহা-পুরুষ বলতে হবে।' হাসিতে ভেঙে পড়ল নেফারতিতি।

রানাও হেসে ফেলল। গতকাল থেকে বিরাজমান থমথমে পরিবেশটা সহজ হয়ে এল এতে। হঠাৎ রানার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই লজ্জায় আরক্ত হলো নেফারতিতি। টের পেয়েছে, দুজনের মধ্যকার ঘনিষ্ঠতার তুলনায় খুনসুটিটা একটু বেশিই হয়ে গেছে। প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে সুপুরুষ যুবকটির প্রতি তার দুর্বলতা। ওকে

দেখার পর থেকেই অদ্ভুত এক আকর্ষণ অনুভব করছে সে, কেন তা নিজেও জানে না।

অস্বস্তি কাটাবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল ও। পিন্টোকে ঘুম থেকে জাগিয়ে নিয়ে গেল হাত-মুখ ধোয়াতে। রানাও উঠল। গাইডদের পাঠিয়ে দিল লাকড়ি আনতে। নিজে কিচেন টেন্টে ঢুকল ব্রেকফাস্টের আয়োজন করতে। টিন ঘেঁটে এক প্যাকেট শুকনো নুডলস্ পেয়ে যাওয়ায় খুশি হয়ে উঠল। যাক, অন্তত বিস্কুট খেয়ে দিন কাটাতে হবে না। আগুনের উপরে নুডলস্ আর কফি বসিয়ে দিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে নিল ও, তারপর মগ আর প্লেট নিয়ে খাবার পরিবেশনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

একটু পরেই ফিরে এল নেফারতিতি। পিন্টোকে শুধু হাত-মুখ ধোয়ায়নি, নদীর পানিতে নামিয়ে গোসলও করিয়ে এনেছে—খাঁটি মাতৃসুলভ আচরণ। নিজেও মাথা ধুয়ে এসেছে, খুলিতে লেপ্টে রয়েছে ববকাট চুল, টি-শার্টের সামনের অনেকখানি অংশ ভিজে গেছে চুল থেকে গড়িয়ে নেমে আসা পানিতে, বুকের উপর সেঁটে রয়েছে পোশাকটা, প্রকট হয়ে উঠেছে তলায় লুকিয়ে থাকা স্তনযুগল। এক নজর তাকিয়েই ঢোঁক গিলল রানা, তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল।

টি-শার্টের উপরে ইউনিফর্মের শার্ট পরে নিল নেফারতিতি, তারপর বসল রানার পাশে। বলল, ‘ছোট্ট একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। গোসল করাবার ফাঁকে পিন্টোর সঙ্গে কথা বলেছি, এই দেশে ওর কোনও আত্মীয় নেই। নানা-দাদারা অনেক আগেই মারা গেছেন, থাকার মধ্যে স্রেফ নাকি এক চাচা আছে; কিন্তু সে আমেরিকায় থাকে বলে শুনেছে ও। ড. হায়দারের টিমে যোগ দেবার আগে ওরা পানামা সিটিতে থাকত, কিন্তু এ-মুহূর্তে তো ওখানে খোঁজ নেয়া সম্ভব না।’

কপালে ভাঁজ পড়ল রানা। ‘তারমানে আপাতত ও একদম

একা?'

'তেমনটাই মনে হচ্ছে।'

'তা হলে তো ওকে এল্ রিয়ালে পাঠানো যাবে না। সমস্যাই বটে।'

'আমাদের সঙ্গেই থাকুক না,' পিন্টোকে একটা প্লেটে নুডল্‌স্ বেড়ে দিতে দিতে বলল নেফারতিতি। 'আমরা তো আজকের দিনটাই শুধু থাকছি এখানে, ওকে সামলাতে পারব না? আগামীকাল ফিরে গিয়ে নাহয় ওর ব্যাপারে খোঁজখবর নেব।'

'বাচ্চা-কাচ্চা হ্যাণ্ডেল করতে জানি না আমি,' বলে দিল রানা। 'দায়িত্বটা তোমাকেই নিতে হবে।'

'অসুবিধে নেই,' পিন্টোর মাথায় হাত বোলাল নেফারতিতি। 'লক্ষ্মী ছেলে... জ্বালাতন করবে বলে মনে হয় না।'

'তা হলে নাশতা সেরে নাও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লেকটা দেখে আসতে চাই। সম্ভব হলে আজ বিকেলেই ফিরে যাব এল্ রিয়ালে।'

এক ঘণ্টা পর মোটরবোট নিয়ে পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছুল ওরা। সিঁড়ির মত অনেকগুলো ধাপ পেরিয়ে বিশাল এক জলপ্রপাত নেমে এসেছে ওখানে, ওটাই সৃষ্টি করেছে নদীর। নীচ থেকে প্রায় দুইশ' ফুট উঁচু জলপ্রপাতটা জরিপ করল রানা—একেকটা ধাপের উচ্চতা পনেরো থেকে বিশ ফুট, প্রবল আক্রোশে জলরাশি নেমে আসছে লাফিয়ে লাফিয়ে, গোড়ায় কুয়াশার মত ভাসছে জলকণা। যেখান দিয়ে পানি নামছে, সেখানটা প্রায় খাড়া হলেও উপত্যকার চারপাশের অন্যান্য পাহাড়ের ঢালগুলো বেশ ঢালু।

নিরাপদ দূরত্বে বোটটা তীরে ভেড়ানো হলো, বড় একটা গাছের ছায়ায়। ওখানে নেমে পড়ল সবাই। হায়দারের ক্যাম্প থেকে প্রয়োজনীয় ইকুইপমেণ্ট নিয়ে এসেছে রানা; নেফারতিতি

আর পিন্টোকে অপেক্ষা করতে বলে তিন গাইডকে নিয়ে এগিয়ে গেল জলপ্রপাতের গোড়ার দিকে। ওখানটায় ঘন হয়ে জন্মেছে ঝোপঝাড়। মাচেটি আর কোদাল ব্যবহার করে দ্রুত খানিকটা অংশ পরিষ্কার করে ফেলা হলো। এরপর শাবল দিয়ে মাটি খোঁড়া হলো, নদীর কিনার থেকে সয়েল-স্যাম্পল সংগ্রহ করল ও, ভরে রাখল একটা প্লাস্টিকের পাউচে।

দ্বিতীয় দফায় রানা একাই জলপ্রপাতের পাশের খাড়া দেয়াল বেয়ে কিছুদূর উঠে গেল। কাজটা কঠিন, আর্দ্র বাতাসের কারণে দরদর করে ঘামছে ও, প্রতি মুহূর্তে বাধার সৃষ্টি করছে পানির ঝাপটা। কিন্তু ক্ষান্ত দিল না, কসরত করে উঠে গেল প্রায় বিশ ফুট, ওখানকার ধাপটার পাশে পৌঁছে থামল। একাই ঝোপঝাড় কেটে মাটি খুঁড়ল ও, সংগ্রহ করল নতুন স্যাম্পল, শেষে নেমে এল নীচে।

পরের কাজটা সহজ। নদীর পানিতে একটা অ্যালুমিনিয়ামের প্যান ভাসাল রানা, তাতে ধীরে ধীরে এমনভাবে স্যাম্পলের মাটি ঢালল যাতে পিরামিডের মত একটা আকৃতির সৃষ্টি হয়। এরপর হায়দারের পার্সোনাল গিয়ার থেকে আনা একটা প্রোট্র্যাক্টরের সাহায্যে কৌণিক মাপ নিল পিরামিডের ঢালের। দু'জায়গার স্যাম্পল দিয়ে দু'বার পরীক্ষা করল ও, ফলাফলের হেরফের হলো না। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে চৌত্রিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রয়েছে পিরামিডের ঢালগুলো। মাটিতে কোনও অস্বাভাবিকতা থাকলে মাপটা বাড়ত বা কমত।

হতাশ ভঙ্গিতে পাহাড়ি ঢালের দিকে তাকাল রানা। এক্সপেরিমেন্টটা ঠিকমত করতে চাইলে লেজার রেঞ্জ-ফাইণ্ডার, অলটিমিটার আর ত্রিকোণমিতির ছক দরকার... কিন্তু এ-মুহূর্তে তার কোনোটাই নেই ওর হাতে।

নেফারতিতি এগিয়ে এল ওর দিকে। 'কিছু বুঝতে পারলে?'

'উঁহুঁ, সময় নষ্ট হলো,' বলল রানা। 'উপরে গিয়ে লেকটাই দেখতে হবে। পাহাড় বাইতে পারবে? নাকি পিন্টোকে নিয়ে থেকে যাবে নীচে?'

'আমি যাব... আমি যাব!' রানার কথা শুনতে পেয়েই লাফাতে লাগল পিন্টো। 'ওখানটা আমার কাছে খুব ভাল লাগে। হায়দার আঙ্কেল আর পাপা-মাম্মার সঙ্গে অনেকবার গেছি ওখানে। আমি রাস্তা চিনি।'

'তা-ই?' হাসল রানা। 'তা হলে তো তোমাকে সঙ্গে নিতেই হয়!'

জলপ্রপাতের ধারে ওদেরকে নিয়ে গেল পিন্টো—ঝোপঝাড় ছেঁটে ফেলা ছোট্ট একটা স্পটে। এখান দিয়েই ওঠানামা করত এক্সপিডিশন টিম, তুলনামূলকভাবে কম খাড়া একটা রুট বেছে নিয়েছিল ওরা। কোথাও কোথাও পাথুরে ক্লিফের গায়ে ছোট-বড় খাঁজও কেটে রাখা হয়েছে, যাতে হাত-পা বাধিয়ে সহজে ক্লাইম্ব করা যায়। জঙ্গল ছাড়িয়ে উঠে আসতে খুব বেশি সময় লাগল না। গাছগাছালির স্তর পেরুতেই কমে গেল আর্দ্রতা, বাতাসটা মিষ্টি লাগল। গরম অবশ্য খুব একটা কমল না, আগ্নেয়গিরির ন্যাড়া অংশটায় সরাসরি আঘাত হানছে বিষুব অঞ্চলের সূর্য... চামড়া পুড়িয়ে দিচ্ছে একেবারে।

চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছে নীচের উপত্যকার দিকে তাকাল রানা। কিছুদূর গিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেছে নদীটা—ঘন অরণ্য যেন গিলে খেয়েছে ওটাকে। চারদিকের পাহাড়ি ঢালকে গ্রাস করতে পারেনি গাছপালা, বিশেষ করে চূড়ার অংশগুলোয় মুখ ব্যাদান করে রেখেছে ধূসর পাথর, তারপরেও নীচের ওই সবুজ জগৎটাকে দেখে সম্ভ্রম জাগে, ওটাকে দুর্ভেদ্য... অজেয় মনে হয়।

আগ্নেয়গিরির প্রাচীন জ্বালামুখের পাড়ে উঠে এল ওরা আধঘণ্টা পর। সোজা হয়ে তাকাতেই চোখে পড়ল হ্রদটা।

জ্বালামুখের পুরো খাদ জুড়ে ওটার আয়তন, দেখাচ্ছে অতিকায় একটা পেয়ালার মত। ঠিক মাঝখানটায় ছোট্ট একটা দ্বীপ আছে, তাতে অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে কতগুলো গাছ। রানা অনুমান করল, লেকটা আধমাইল চওড়া; গভীরতা কত কে জানে... পাহাড়ের উচ্চতার চাইতেও যদি বেশি হয়, অবাক হবার কিছু থাকবে না। পানি হয়তো ভূপৃষ্ঠের কয়েক মাইল ভিতর থেকে উঠে আসছে। পানির সীমানায় বালিময় একটা সৈকতের মত আছে, বলয়ের মত ঘিরে রেখেছে পুরো লেককে। উঁচু পাড়ের একটা অংশ ভাঙা, ওখান দিয়ে প্রবল বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে পানি, জলপ্রপাত হয়ে নীচে নামছে, তারপর নদী হয়ে বয়ে যাচ্ছে উপত্যকার বুক চিরে।

জ্বালামুখের পাড় থেকে সৈকতে নেমে এল রানা ও তার সঙ্গীরা। বাতাস এখানে গুমোট, চারদিকে উঁচু পাড়ের কারণে বায়ুপ্রবাহ বাধা পাচ্ছে।

ডানদিক দেখিয়ে পিন্টো বলল, 'হায়দার আঙ্কেল ওইদিকে কাজ করত। মাটি খুঁড়ে সোনাদানা খুঁজত।'

ক্লান্ত পায়ে হাঁটতে শুরু করল সবাই, দুইশ' ফুট ক্লাইম্বের পর টের পেল টনটন করছে দেহের সমস্ত পেশি। পানির কিনার ধরে চারভাগের একভাগ দূরত্ব পেরুবার পর পাওয়া গেল হায়দারের এক্সক্যাভেশনের চিহ্ন। অনেকগুলো শাফট খোঁড়া হয়েছে... কোনোটাই বিশ থেকে ত্রিশ ফুটের কম গভীর নয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হলো, ওগুলো থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু পাওয়া যায়নি। একটু অবাক হলো রানা—এভাবে আগ্নেয়গিরির ডগায় শাফট খোঁড়ার মানেটা কী? কী পাবে বলে ভাবছিল হায়দার? দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছে, হ্রদের মোটামুটি তিনটে পাশই ঝাঁঝরা করে ফেলা হয়েছে এ-ধরনের শাফট খুঁড়ে। সবগুলোই চেক করে দেখা দরকার।

দুপুরে লাঞ্চের ব্রেক-সহ প্রায় সাত ঘণ্টা লেগে গেল লেকের

বিভিন্ন অংশ থেকে পানির স্যাম্পল নিতে আর হায়দারের খোঁড়া শাফটগুলো দেখতে। বিভিন্ন স্পটে জ্বালামুখের পাড়েও উঠল ওরা, বোঝার চেষ্টা করল অন্যপাশের ঢালে কী আছে। উল্লেখযোগ্য কিছুই আবিষ্কার করা গেল না। কেন হ্রদের কিনারে গুপ্তধন পোঁতা থাকতে পারে বলে ভেবেছিল হায়দার, পাওয়া গেল না তার কোনও সদুত্তর। দেখার বাকি রইল কেবল পানির মাঝে ভেসে থাকা দ্বীপটা। ওখানে যাবার জন্য এক্সপিডিশন টিম একটা ক্যানু তুলে এনেছিল উপরে, লেকের কিনারে বাঁধা আছে ওটা, সবার জায়গা হবে না। পিন্টো আর নেফারতিতিকে নিয়ে ক্যানুতে চড়ল রানা, গাইডদেরকে নির্দেশ দিল সৈকতে আগুন জ্বেলে ক্যাম্প করতে। বিকেল গড়িয়ে গেছে, সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমাকাশে। আজ আর এল্ রিয়ালে ফেরা সম্ভব নয়, রাতটা এখানেই কাটাবে বলে ঠিক করেছে ও।

শান্ত পানি কেটে তরতর করে এগিয়ে চলেছে ক্যানু, ছন্দময় ভঙ্গিতে দাঁড় বাইছে রানা। বাউয়ের কাছে উপুড় হয়ে পানিতে হাত ভেজাচ্ছে পিন্টো। নেফারতিতি বলল, 'কী সুন্দর পরিবেশ! তাই না?' রানার দিকে তাকাল। 'মাঝি, গান গাইছ না কেন?'

'আমার গলা খুব খারাপ,' পাল্টা রসিকতা করল রানা। 'তুমিই গাও না কেন? কাল রাতে তোমার ঘুমপাড়ানি গান শুনেছি... গলা তো খুবই মিষ্টি।'

'ওই একটা গানই পারি আমি। তুমি যদি ঘুমিয়ে পড়ো, দাঁড় বাইবে কে?'

হাসিঠাট্টা করতে করতে দ্বীপের পাশে পৌঁছে গেল ওরা। মাটিতে ক্যানুর নাক ঠেকলে এক লাফে নেমে পড়ল রানা। দুই সঙ্গীকে সাহায্য করল নীচে নামতে। এরপর টান দিয়ে ক্যানুটাকে উঠিয়ে আনল ডাঙায়, যাতে ভেসে না যায়। মাটিতে পা রেখেই ছোটাছুটি শুরু করল পিন্টো, খুব মজা লাগছে ওর।

দ্বীপটার আয়তন আধ-একরের মত। মাটি নয়, পাথরে গড়া, পানি ফুঁড়ে উঠে এসেছে বিশ ফুট উপরে। কালের প্রবাহে মাটির আস্তর পড়েছে গায়ে, সেখানে জন্মেছে হাজারো প্রজাতির লতাগুল্ম, শ্যাওলা আর আগাছা। ঠিক মাঝখানটায় কয়েকটা রোগা গাছ দাঁড়িয়ে আছে... পাথরের গায়ে কীভাবে এরা টিকে আছে সেটাই আশ্চর্য। উঁচু হয়ে থাকা পাথরের মাঝে একটা প্রাকৃতিক গুহা পেল ওরা, তার ভিতরে শাফট খুঁড়েছে হায়দার। তীরের শাফটগুলোর মত গভীর নয় ওটা, বোধহয় কাজটা শেষ করবার সময় পায়নি। গুহার ভিতরে এখনও পড়ে আছে খোঁড়াখুঁড়ির যন্ত্রপাতি।

আশপাশে নজর বুলিয়ে নেফারতিতি বলল, 'মনে হচ্ছে অযথাই এসেছি এখানে। কিছুই তো নেই।'

'আরও খারাপ,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'যদ্দূর বুঝতে পারছি, খামোকা প্রাণ দিয়েছে হায়দার আর ওর সঙ্গীরা। পুরনো বাঁধের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া এই এলাকায় ইনকাদের উপস্থিতির আর কোনও প্রমাণ নেই। বাঁধটাও যে ওদেরই তৈরি, সেটাই বা জোর দিয়ে বলি কী করে? গুপ্তধন তো আরও অনেক পরের কথা।'

মন খারাপ হয়ে গেছে ওর। হায়দার নাহয় নিজের স্বপ্নকে তাড়া করতে গিয়ে জীবন দিয়েছে, কিন্তু বাকিরা? দরিদ্র, খেটে খাওয়া মানুষ ছিল ওরা, পিন্টোর বাবা-মা'র মত। কাজ করে পেটের আহার জোগাতে এসেছিল। অকালমৃত্যু প্রাপ্য ছিল না ওদের... প্রাপ্য ছিল না মৃত্যুর পর গুলির আঘাত।

গুহামুখে গিয়ে দাঁড়াল রানা। আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সূর্য ডুবতে বেশি দেরি নেই, নেফি। আমাদের ফিরে যাওয়া দরকার।'

'ইয়ে...' ইতস্তত করে বলল নেফারতিতি, 'আমাকে একটু সময় দেবে? দু'দিন থেকে গোসল করিনি, সারা গা কুট কুট

করছে। দশ মিনিট সময় পেলে লেকের পানিতে একটু গা ভিজিয়ে নিতে পারি। তীরে গেলে হুয়ানদের সামনে সেটা সম্ভব হবে না।'

বাঁকা চোখে ওর দিকে তাকাল রানা। 'আমার সামনে বুঝি হবে?'

'খবরদার!' চোখ রাঙাল নেফারতিতি। 'উঁকি-ঝুঁকি দেবে না। দ্বীপের উল্টোপাশে থাকবে তুমি!'

'জো হুকুম,' হাসল রানা। 'কিচ্ছু ভেবো না। ভদ্রলোক আমি, গোসলের সময় মেয়েদের দিকে তাকানোর অভ্যাস নেই আমার।'

'তা হলে তো ভালই। নইলে আমার সঙ্গে একটা নাইন মিলিমিটার আছে,' হুঁশিয়ার করল নেফারতিতি। 'পিন্টোকেও সামলে রেখো। আফটার অল, ওর শরীরেও পুরুষের রক্ত বইছে।'

'ইয়েস, ম্যা'ম।'

দ্বীপের পিছনদিকে গিয়ে দ্রুত কাপড় ছাড়ল নেফারতিতি, ঝাঁপ দিল লেকে। সাবলীল ভঙ্গিতে সাঁতার কাটতে শুরু করল। সারাদিনের রোদে পানির উপরিভাগ উষ্ণ হয়ে আছে, আরামদায়ক একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল নগ্ন দেহে। শরীরে জমে থাকা ঘাম আর ময়লা পরিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কেটে যাচ্ছে অবসাদ। চিৎ হয়ে ভাসতে ভাসতে অস্তগামী সূর্যের রোদ আর ঈষদুষ্ণ পানির স্পর্শ উপভোগ করতে শুরু করল। ভুলে যেতে চাইল জীবনের হাজারো জটিলতার কথা... অন্তত কিছুটা সময়ের জন্য হলেও।

ইচ্ছের বিরুদ্ধে হঠাৎ করেই চোখের সামনে ভেসে উঠল রানার সুদর্শন মুখটা। যত সময় যাচ্ছে, ততই যুবকটির প্রতি আকর্ষণ তীব্রতর হচ্ছে ওর মধ্যে। কিন্তু কেন? জীবনে অনেক সুদর্শন পুরুষই দেখেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কাউকে তো এতটা মনে ধরেনি! তা-ও আবার এত অল্প সময়ের ভিতরে! প্রেম-ভালবাসা নিয়ে কখনও মাথাই ঘামায়নি ও। বরং জ্ঞানবুদ্ধি

হবার পর থেকেই এড়িয়ে চলেছে ওসব ঠুনকো আবেগ। মেয়েদের জন্য রূপকে সবচেয়ে বড় শত্রু বলে মনে করে ও, এই রূপের কারণেই সুন্দরীরা কখনও প্রাপ্য মর্যাদা পায় না, হয়ে ওঠে স্রেফ কামনার বস্তু... ভোগের সামগ্রী। দুনিয়ার এই রীতিকে ভুল প্রমাণ করবার জন্য সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে নেফারতিতি, নিজের মেধা আর যোগ্যতা দিয়ে উঠে এসেছে আজকের অবস্থানে। কোনও পুরুষ প্রেম নিবেদন করলেই ফিরিয়ে দিয়েছে নিষ্ঠুরভাবে। অথচ আজ ওরই বুকে অজানা-অচেনা এক বিদেশি যুবকের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠছে। এর মানে কী!

অবশ্য অস্বীকার করবার উপায় নেই যে মাসুদ রানা ওর দেখা আর সব পুরুষের চেয়ে ব্যতিক্রম। আশ্চর্য লোকটার ব্যক্তিত্ব, মাথা অত্যন্ত ঠাণ্ডা, বাড়াবাড়ি বলে কোনও জিনিস তার ভিতরে নেই। অনাথ একটি শিশুর প্রতি ওর হৃদয় যেমন কোমল, অচেনা শত্রুটির জন্য ঠিক ততখানিই কঠোরতা পুষে রাখা হয়েছে ওখানে। এ এক অদ্ভুত মিশেল। আর চোখ দুটো... সেখানে যেন জাদু আছে। তাকালেই হারিয়ে যায় নেফি—কী অদ্ভুত মায়া মণিদুটোতে, দেখলেই মনে হয় এই লোককে বিশ্বাস করে কখনও ঠকবে না কেউ।

কে এই মাসুদ রানা? ওর প্রেমহীন রুক্ষ জীবনে হঠাৎ করে কোত্থেকে উদয় হলো? এমন কারও জন্যই কি তা হলে এতগুলো বছর অপেক্ষা করছিল সে? জানে না নেফারতিতি, জিজ্ঞেস করতে ভয় হয়। লোকটাকে দেখলেই মনে হয় কোনও বাঁধনে জড়াবার জন্য জন্ম হয়নি তার, তাকে আটকানোর চেষ্টা করা বৃথা। ওর ভিতরের নারীসত্তা ওকে ফিসফিস করে জানিয়ে দিয়েছে, যে-অল্প সময়ের জন্য রানাকে কাছে পাচ্ছে, সেটাকেই পরম পাওয়া বলে ভাবতে হবে... হোক সেটা এই গহীন জঙ্গলে, হোক সেটা এই অনিশ্চিত পরিবেশে। এই উপলব্ধি ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

বড় করে শ্বাস নিল নেফারতিতি, বাধাহীনভাবে শরীরকে ডুবে যেতে দিল পানিতে। যেন কিছুটা সময়ের জন্য নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চাইছে কঠিন বাস্তবতা থেকে। স্কুবা ট্রেইনিঙের কারণে দম ধরে রাখতে জানে, ডুবন্ত অবস্থায় মনে মনে এক থেকে একশো পর্যন্ত গুনল—স্ট্রেস-রিলিফের এক ধরনের কৌশল এটা। লেকের তলার শান্ত-সমাহিত পরিবেশ শুষে নিল ওর মনের অস্থিরতা। সন্তুষ্ট হয়ে নড়ল ও, হাত-পা নেড়ে ভুস করে ভেসে উঠল সারফেসে।

চোখ থেকে পানি মুছতেই চমকে উঠল নেফারতিতি। পানির ধারে দাঁড়িয়ে আছে রানা! বারণ না মেনে এদিকে চলে এসেছে বলে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু দূরাগত একটা আওয়াজ কানে আসায় স্থির হয়ে গেল ও। বুঝে ফেলেছে, রানা এমনি এমনি আসেনি।

দুপ দুপ করে ভেসে আসছে ছন্দোবদ্ধ আওয়াজটা—হেলিকপ্টারের রোটর!

'তাড়াতাড়ি উঠে এসো!' নেফারতিতিকে দেখতে পেয়ে চাপা গলায় ডাকল রানা।

হাত-পা ছুঁড়ে তাড়াতাড়ি তীরে ফিরল নেফারতিতি, গা মোছার জন্য সময় নষ্ট করল না, মাটিতে ফেলে রাখা পোশাক পরতে শুরু করল ত্রস্ত হাতে। রানা ইতিমধ্যে উল্টো ঘুরে দাঁড়িয়েছে। প্যান্ট পরা হলে বুট আর পিস্তল বেল্ট কুড়িয়ে নিল ও, রানাকে বলল, 'চলো।'

একটা পাথরের পিছনে অপেক্ষা করছিল পিন্টো, ওর হাত ধরে গুহার দিকে ছুটল রানা। নেফারতিতি অনুসরণ করল ওকে। দ্রুত ওখানে ঘাপটি মারল তিনজনে।

'কোন্‌দিক থেকে আসছে ওরা?' বুট পরতে পরতে জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

‘পশ্চিম দিক থেকে,’ বলল রানা। ‘তবে তার আগে উপত্যকার চারদিকে সম্ভবত একটা চক্কর দিয়ে নিয়েছে।’

‘কী ধরনের হেলিকপ্টার?’

‘বেল্ জেটরেঞ্জারের মত লাগল। শরীর কুচকুচে কালো।’

‘কোনও মার্কিং দেখেছ?’

‘উঁহুঁ। অবশ্য এতদূর থেকে দেখা যাবার কথাও না।’

‘হুয়ানদেরকে সতর্ক করে দেয়া দরকার...’

‘ওরা বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ডাকাডাকি করেছি, শুনতে পায়নি। ক্যানু নিয়ে ফিরে যাওয়াও সম্ভব নয়, তার আগেই এসে পড়বে হেলিকপ্টার।’

‘তোমার কি ধারণা ওটা...’

‘ধারণা নয়,’ থমথমে গলায় বলল রানা, ‘আমি জানি ওটা ওদেরই।’

কোনও সন্দেহ নেই রানার মনে, কপ্টারটাকে হায়দারের ক্যাম্পের উপরে হোভার করতে দেখেছে ও। শত্রুপক্ষ ছাড়া আর কেউ ও-কাজ করবে না। নিশ্চয়ই উপত্যকার পরিস্থিতি দেখতে এসেছে... বুঝতে চাইছে এখানে ফিরে আসা নিরাপদ কি না।

রোটরের আওয়াজ বাড়তে শুরু করেছে। হামাগুড়ি দিয়ে গুহামুখের কয়েক গজ সামনে চলে গেল রানা, উঁকি দিল ক্যাম্পের দিকে। অবশেষে নড়তে শুরু করেছে তিন গাইড, বিকট শব্দে ঘুমে ব্যাঘাত ঘটেছে ওদের। কিন্তু তারপরেও দেরি করে ফেলেছে ওরা, পুরোপুরি সজাগ হবার আগেই আচমকা জ্বালামুখের ওপার থেকে উঠে এল আকাশযানটা। সাধারণ হেলিকপ্টার নয়, দু’পাশে হেভি মেশিনগান বসিয়ে গানশিপে পরিণত করা হয়েছে। লেকের উপরে এসে থামল ওটা, একটা পাশ ঘুরে গেল ক্যাম্পের দিকে। সাইড ডোর খুলে গেল, এরপর কী ঘটবে তা বুঝে ফেলল রানা। এয়ার-অ্যাসল্টের নিখুঁত কৌশল অনুসরণ করছে শত্রুরা।

এম-সিক্সটিন রাইফেল তুলে দ্রুত দুটো গুলি ছুঁড়ল হুয়ান, কিন্তু রোটরের তলায় চাপা পড়ে গেল ওটার আওয়াজ। পরক্ষণে আগুন ঝরাল কপ্টারের মাউন্টেড মেশিনগান। বুলেটের প্রথম পশলা তিন পানামানিয়ানের দশ ফুট দূরে বালি ওড়াল। উঠে দাঁড়াল ওরা, পড়িমরি করে ছুট লাগাল প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে। কিন্তু আশপাশে কোনও কাভার নেই। হোভার করে ওদের পিছু পিছু চলল কপ্টারটা। নিশানা ঠিক করে নিয়েছে গানার, আবার গুলি ছুঁড়ল।

ধাবমান গাইডদের পিছনে ধুলোর রেখা তৈরি হলো, প্রতিটা বুলেট আগেরটার চেয়ে কাছে গিয়ে লাগছে। দৌড়াতে দৌড়াতেই শরীর বাঁকাল সিসিলিয়ো, অসম্ভব একটা অ্যাঙ্গেল থেকে গুলি করতে চাইল হেলিকপ্টারের উদ্দেশে। লাভ হলো না, বরং গতি কমে যাওয়ায় ওর নাগাল পেয়ে গেল বুলেটের ঝাঁক। সুতোয় বাঁধা পুতুলের মত তাকে ঝাঁকি খেতে দেখল রানা, জামাকাপড় ভিজে উঠল রক্তে, তারপরেই বালির উপর আছড়ে পড়ল প্রাণহীন দেহটা—ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

আততায়ীর পরের গুলিতে মাথার একপাশ উড়ে গেল জুয়ারেজের। ছুটন্ত অবস্থাতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল লাশটা। হারিয়ে গেল উড়তে থাকা ধুলোর আড়ালে। হুয়ানও ততক্ষণে ধুলোর ভিতরে অদৃশ্য। হেলিকপ্টার গানশিপ এগিয়ে এল, রোটরের ধাক্কায় ধুলো সরে গেলে আবার দেখা গেল তাকে। না, পালাচ্ছে না। হাঁটু গেড়ে পজিশন নিয়েছে, রাইফেলের বাট কাঁধে ঠেকানো। সশব্দে দু'বার ফায়ার করল সে, কপ্টারের গায়ে আগুনের ফুলকি ওড়াল তার বুলেট। এরপর আবার গর্জে উঠল মেশিনগান। মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল দুঃসাহসী পানামানিয়ান।

আঁতকে ওঠার মত একটা আওয়াজ করল নেফারতিতি, ক্রল করে রানার পাশে চলে এসেছে ও। মুখ না ঘুরিয়েই রানা নির্দেশ

দিল, 'গুহায় ফিরে যাও... কুইক! পিন্টোকে সামলে রাখো, ও যেন বাইরে না বেরোয়।'

'আর তুমি?'

'আমিও আসছি। যাও তো!'

ক্রল করে আবার পিছিয়ে গেল নেফারতিতি। রানার দৃষ্টি তখন চুম্বকের মত আটকে আছে কপ্টারের দিকে। ছোট কোনও চিহ্ন... একটা চেহারা হলেও দেখতে হবে ওকে। নইলে এদের পরিচয় জানতে পারবে না, ভবিষ্যতে খুঁজে বের করতে পারবে না। মাথায় আগুন জ্বলছে ওর—নিরীহ তিনজন মানুষকে অকারণে খুন করেছে ওরা, এর একটা বিহিত করতেই হবে ওকে।

এখনও হোভার করছে গানশিপ, মেশিনগানটা নড়েনি। বোধহয় বোঝার চেষ্টা করছে আশপাশে আর কেউ আছে কি না। কয়েক মুহূর্ত পর সন্দেহটা সঠিক বলে প্রমাণিত হলো, সৈকতের কাছাকাছি নিচু হলো ওটা, লাফ দিয়ে নেমে এল কালো পোশাকধারী কয়েকজন সৈনিক। দূর থেকে তাদের চেহারা বা জাতীয়তা বোঝা যাচ্ছে না। এক্সক্যাভেশন সাইটে ঢুঁ মারতে শুরু করল ওরা। খানিক পর সন্তুষ্ট হয়ে আবার উঠে পড়ল হেলিকপ্টারে। যান্ত্রিক ফড়িংটা এরপর দ্বীপের দিকে উড়ে এল।

হামাগুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি পিছাতে শুরু করল রানা, তবে আকাশের দিক থেকে চোখ সরায়নি। কপ্টারটা কাছাকাছি হওয়ায় বুঝতে পারল, কালো রঙটা ওটার স্বাভাবিক রঙ নয়। পরিচয় লুকানোর জন্য ওভাবে পেইন্ট করা হয়েছে। দ্বীপের একেবারে কাছে চলে আসার পর আণ্ডারক্যারিজ দেখতে পেল, সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটল ওর। পেইন্টিঙের কাজটা যত্ন নিয়ে করা হয়নি, আণ্ডারক্যারিজের কালো আস্তরের তলা থেকে আবছাভাবে ফুটে আছে কপ্টারের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার। ব্যস, আর কী চাই? ওটাকে ট্র্যাক করা আর কোনও ব্যাপারই নয়।

তাড়াতাড়ি গুহায় ঢুকে পড়ল রানা। নেফারতিতি আর পিন্টোকে বলল মাটিতে শরীর মিশিয়ে শুয়ে পড়তে, বাইরে থেকে উঁকি দিলেও যেন প্রথম দর্শনে ওদেরকে দেখা না যায়। রোটরের আওয়াজ শুনতে পাবার পর পর ক্যানুটাও উঠিয়ে এনেছে গাছের তলায়। গোধূলির স্বল্প আলোয় আকাশ থেকে ওটাকে স্পট করা যাবে না। কপাল ভাল হলে হয়তো বেঁচে যাবে এ-যাত্রা, দ্বীপে পা রাখবে না খুনিরা।

পাঁচটা মিনিট দম বন্ধ করা উত্তেজনায় কাটল। আওয়াজ শুনে বোঝা গেল, দ্বীপের উপরে চক্কর দিচ্ছে কপ্টারটা। পিন্টো কয়েকবারই নড়ে উঠতে চাইল, কথা বলতে চাইল, দক্ষতার সাথে তাকে সামলাল নেফারতিতি। ফিসফিস করে ওকে বোঝাল, ওরা লুকোচুরি খেলছে। আর বিরক্ত করল না ছেলেটা।

ধীরে ধীরে কমে এল রোটরের আওয়াজ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। এরিয়াল সার্ভে করেই সন্তুষ্ট থেকেছে শত্রুরা, বোধহয় কল্পনাও করেনি দ্বীপে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে। তবে একেবারে চলে যায়নি ওটা, কাছাকাছিই আছে। হামাগুড়ি দিয়ে গুহা থেকে আবার বেরিয়ে এল ও, উঁকি দিল কী ঘটছে দেখবার জন্য। ওর পিছু পিছু এল নেফারতিতি।

সৈকতে আবার নেমেছে সৈনিকরা, হেলিকপ্টারে তুলে নিচ্ছে তিন পানামানিয়ান গাইডের লাশ। ওদের অস্ত্রগুলোও কুড়িয়ে নিল, সেইসঙ্গে সমস্ত বুলেটের খোসা। প্লাস্টিকের প্যাকেটে ভরা হলো রক্তমাখা বালি। এরপর হোভার করে পানির উপরে এল যান্ত্রিক ফড়িংটা, দরজা খুলে একে একে নীচে ফেলে দেয়া হলো লাশতিনটে। লাশের গায়ে ভারী কিছু বাঁধা হয়েছে, পানিতে পড়েই তলিয়ে গেল ওগুলো। নিখুঁত ক্লিনআপ অপারেশন, নিহত মানুষগুলোকে আর কোনোদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না... কেউ জানবে না ওদের ভাগ্যে কী ঘটেছে। কোনও প্রমাণ রইল না।

এরপরেও নড়ল না কপ্টারটা। গানারের পজিশনের উল্টোপাশের দরজা খুলে যেতে দেখল রানা, সেখান দিয়ে একে একে দুটো লোহার ব্যারেল নীচে ফেলা হলো। ঝপাস করে পানিতে আছড়ে পড়ল ওগুলো।

'ওগুলো কি...' প্রশ্নটা অসমাপ্ত রয়ে গেল নেফারতিতির ঠোঁটে।

'ডেপথ চার্জ,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা।

'ক... কিন্তু কেন?'

জবাব দেবার সুযোগ পেল না রানা, বজ্রপাতের মত গুরুগম্ভীর একটা আওয়াজ হলো। হ্রদের গভীরে বিস্ফোরিত হয়েছে সত্তর পাউণ্ড এক্সপ্লোসিভ ভরা প্রথম চার্জটা। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের ভিতরে সারফেসে উঠে এল শকওয়েভ। পঞ্চাশ ফুট উঁচু পানির ফুলঝুরি ছিটকাল চারদিকে। কয়েক সেকেণ্ড পর ফাটল দ্বিতীয়টা, এটা আগেরটার চেয়ে শক্তিশালী... যেন ভূমিকম্প বয়ে গেল ছোট্ট দ্বীপটার উপর দিয়ে।

তীর বেগে হেলিকপ্টারটা তার আগেই সরে গেছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দিগন্তে হারিয়ে গেল ওটা, যেন পড়িমরি করে পিঠটান দিয়েছে। রোটরের আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ায় চারদিক আবার সুনসান, নিস্তব্ধ।

রানাও ছুট লাগিয়েছে, ফিরে এসেছে গুহায়। এক্সক্যাভেশন টিমের ফেলে যাওয়া জিনিসপত্র ঘাঁটছে পাগলের মত। নেফারতিতি হতভম্ব গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এসবের মানে কী, রানা? ওরা ডেপথ চার্জ ফাটাল কেন?'

'বাইরে গিয়ে একটু তাকিয়ে দেখো, তা হলেই বুঝতে পারবে,' মাথা না ঘুরিয়ে জবাব দিল রানা। 'পিন্টোকে ধরে রেখো, ও যেন কোথাও চলে না যায়।'

পিন্টোর হাত ধরে এক ছুটে বেরিয়ে এল নেফারতিতি। চঞ্চল

দৃষ্টি বোলাল চারপাশে।

'কী হয়েছে, আণ্টি?' জিজ্ঞেস করল পিণ্টো। 'হুয়ানরা কোথায় গেল?'

জবাব দিল না নেফারতিতি। ওর দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে লেকের সারফেসে। ফুটন্ত পানির মত বুদবুদ উঠছে বিভিন্ন স্পটে, আলোড়নটা চোখে পড়ার মত। ধীরে ধীরে ওর নজর ঘুরে গেল সৈকতে, যেখানে ক্যাম্প করেছিল হুয়ান ও তার দু'ভাই। অগ্নিকুণ্ডটা এখনও জ্বলছে, ওটা কেন যেন নিভিয়ে দিয়ে যায়নি খুনিরা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বুঝে ফেলল কারণটা।

আচমকা কেঁপে উঠল আগুনের শিখা। যেন একটা গ্যাস স্টোভের চাবি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, এমন ভঙ্গিতে দপদপিয়ে উঠল, পরক্ষণে নিভে গেল ফস করে। এমন নয় যে লাকড়ি শেষ হয়ে গেছে... তা হলে? আসল ব্যাপারটা টের পেতেই হিম হয়ে এল শরীর।

অক্সিজেনের অভাবে নিভে গেছে অগ্নিকুণ্ড! অভাবটা দেখা দিয়েছে লেকের পানির ওই বুদবুদগুলোর জন্য। ডেপথ চার্জ ফাটিয়ে আবারও মুক্ত করা হয়েছে পানিতে মিশে থাকা কার্বন-ডায়োক্সাইড! রানার কথাগুলো মনে পড়ে গেল—গ্যাসটা অদৃশ্য, বর্ণ-গন্ধহীন এবং বাতাসের চেয়ে ভারী। পরিষ্কার বাতাসকে ঠেলে সরিয়ে এখন পেয়ালার মত এই জ্বালামুখকে দখল করে নিচ্ছে ওটা!

পিণ্টোকে টানতে টানতে পড়িমরি করে গুহায় ফিরে এল নেফারতিতি, রানা তখনও উবু হয়ে এক্সক্যাভেশন টিমের জিনিসপত্র ঘাঁটছে।

'রানা! কী করছ তুমি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সুন্দরী ক্যাপ্টেন। 'জ্বালামুখটা ভরে যাচ্ছে কার্বন-ডায়োক্সাইডে... আমাদেরকে এক্ষুণি এখান থেকে সরে যেতে হবে!'

‘পালাবার চেষ্টা করে লাভ নেই,’ বলল রানা। প্লাস্টিকের একটা রোল খুলছে ও, জিনিসটা গ্রাউণ্ড শিট হিসেবে ব্যবহার করত হায়দার। ‘লেক পেরুবার আগেই মারা পড়ব আমরা।’

‘তাই বলে এখানে বসে থাকব?’

অবশেষে মুখ তুলল রানা। ‘না থেকেই বা উপায় কী? বুঝতে পারছ না, পালাবার উপায় নেই আমাদের!’

সাত

মায়ামিতে ধরা পড়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড খাটছে, এমন এক ড্রাগলর্ডের তৈরি করা বিশাল, নয়নাভিরাম এক এস্টেট রয়েছে পানামা সিটি থেকে কয়েক মাইল পশ্চিমে। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরের এই এস্টেটের নাম *গুয়ার্দিয়া দেল মার*, বা সমুদ্র-প্রহরী... আর নামটার সঙ্গে মানানসই ভঙ্গিমায় সৈকতের পাশে মাথা তুলে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে প্রাসাদোপম এক ভিলা। যেন পাহারা দিচ্ছে সুনীল সাগরকে। ক্রোক হয়ে গিয়েছিল এই সম্পত্তি, প্রায় জলের দরে সরকারি নিলাম থেকে কিনে নিয়েছে বর্তমান মালিক। তবে এস্টেটের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়নি সে। মুগ্ধ হয়েছে লোকেশন আর নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখে। মূল ফটক থেকে প্রায় তিন মাইল ভিতরে ভিলা, গেট ভেঙে কেউ হামলা চালালে সরে পড়বার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। তা ছাড়া ভিলার চারপাশে প্রায় একশো মিটার একদম উন্মুক্ত... ঘাসের লন ছাড়া আর কিছুই নেই... ফলে

ছাত থেকে গুলি করে অনায়াসে খতম করা যাবে হামলাকারীদের। গোপন টানেল আছে, সেই টানেল ধরে চলে যাওয়া যায় সৈকতে তৈরি করা ডকে। বোটে চড়ে কেটে পড়া যায় নিশ্চিন্তে।

এ-মুহূর্তে ভিলার ওপরতলায়, নিজের ব্যক্তিগত অফিসে বসে আছে ভিলার বর্তমান মালিক... কেনজি নাকামুরা। পিঠ ঠেকিয়ে রেখেছে সিংহাসনের মত চেয়ারের ব্যাকরেস্টে, দৃষ্টি নিবদ্ধ টেবিলের উপর রাখা ল্যাপটপ কম্পিউটারের স্ক্রিনে। গোটা মধ্য আমেরিকার একটা মানচিত্র ফুটে আছে ওতে।

ভয়ঙ্করদর্শন মানুষ নাকামুরা, স্বভাবেও তা-ই। না, চেহারা একেবারে মন্দ নয়; কিন্তু বীভৎস দেখায় মুখের একটা পাশ সম্পূর্ণ বিকৃত বলে—শৈশবে পুড়ে গিয়েছিল, আর ঠিক করা যায়নি। সে-আমলে প্লাস্টিক সার্জারি ততটা উন্নত ছিল না, টাকাও ছিল না তার; সুযোগ আর সামর্থ্য যখন হলো, তখন আর মুখশ্রী ঠিকঠাক করে নেবার ইচ্ছে হয়নি। বিকৃত এই চেহারা নিয়েই ততদিনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সে, চেহারাটাই তাকে আলাদা করেছে আর সবার কাতার থেকে। মনে হয়েছিল সেটা মেরামত করতে গেলে নিজের গুরুত্বপূর্ণ একটা বৈশিষ্ট্য হারাবে।

চার মাস বাকি সত্তর বছর পূর্ণ হতে, কিন্তু নাকামুরাকে দেখে মোটেই অতটা বয়স্ক মনে হয় না। এখনও যে-কোনও যুবকের মত সবল ও তরতাজা সে—প্রতিদিন ভোরে ব্যক্তিগত জিমনেশিয়ামের ট্রেডমিলে দু'মাইল জগিং করে; ছ'ফুট লম্বা দেহটা ছিপছিপে, একবিন্দু মেদ নেই কোথাও, সামান্যতম কুঁজোও হয়নি। ব্লাড প্রেশার বা ডায়াবেটিসের মত কোনও বয়সজনিত রোগ নেই শরীরে। পিতাকে বাদ দিলে তার গত চার পুরুষে কেউই একশো বছরের সীমা পার না করে মরেনি; বার্ধক্যে সহজে আক্রান্ত হয় না তার বংশের লোকজন। দুঃখের বিষয় হলো, বংশের এই জেনেটিক বিস্ময়ের সে-ই শেষ প্রতিভূ। তার

মাধ্যমেই শেষ হতে চলেছে নাকামুরাদের বংশলতিকা। যে-ঘটনায় তার মুখ পুড়ে গিয়েছিল, সে-ঘটনায় মারা গেছে তার পুরো পরিবার। সে ছাড়া বংশের বাতি জ্বালবার মত আর কেউ নেই।

কথাটা মনে পড়তেই তিক্ততা অনুভব করল নাকামুরা। তিন-তিনবার বিয়ে করেছে সে, অবৈধ সম্পর্কও অগণিত... কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও সন্তানের মুখ দেখেনি। দুনিয়ার সেরা ডাক্তাররা তাকে পরীক্ষা করে জানিয়ে দিয়েছে, কোনোদিন বাপ হবার সম্ভাবনাও তার নেই। রেডিয়েশন পয়েজনিঙে স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে গেছে তার প্রজনন ক্ষমতা। খবরটা এসেছিল চরম আঘাতের মত... ওটাই ছিল শেষ সুতো। পিতা-মাতা-ভাই-বোনকে হারাবার ব্যথা, চেহারার বিকৃতি... এসব বহুকাল সহ্য করেছে সে। কিন্তু যখন জানল তার বংশের প্রদীপ নিভে যেতে বসেছে, সেটা আর মেনে নিতে পারেনি। কঠিন প্রতিজ্ঞা করেছে সে, প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা... জাপানি ভাষায় যাকে বলে কাতাকিউচি—যারা এর জন্য দায়ী, তাদেরকে চিরতরে ধ্বংস করে দেবে সে। এখন সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে, হিরোশিমায় এক বনেদি পরিবারে জন্ম হয়েছিল নাকামুরার। বাপ-দাদা ছিলেন নামকরা কাপড়-ব্যবসায়ী। দু-ভাই আর তিন বোনের সুখী পরিবার ছিল ওদের। হঠাৎ করেই বদলে গেল সব—উনিশশো পঁয়তাল্লিশের ছয়ই আগস্টে... যখন হিরোশিমায় অ্যাটম বোমা ফেলল আমেরিকা। ঘটনাটার কিচ্ছু মনে নেই তার, তখন সে স্রেফ দেড় বছরের শিশু। বিচারবুদ্ধি হবার পর জেনেছে, অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণে পুরো শহর ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, আগুন লেগে ধসে পড়েছিল তাদের বাড়ি। ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে মারা যায় তার বাবা আর ভাই-বোনেরা। আহত অবস্থায় ওকে নিয়ে বেরিয়ে আসেন

তার মা, দুজনেরই শরীর পুড়ে গিয়েছিল। দু'মাস যমে-মানুষে টানাটানির পর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে নাকামুরা, কিন্তু ওর মা বাঁচেননি—আঘাত বেশ গুরুতর ছিল তাঁর। এরপর ছোট্ট নাকামুরার আশ্রয় হয় এক অনাথ-আশ্রমে। ওখানেই বড় হয় সে—চরম দুঃখকষ্ট আর বঞ্চনার মাঝে।

হিরোশিমা বম্বিঙের দীর্ঘমেয়াদি কুফল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে নাকামুরা। জ্ঞানবুদ্ধি হবার পর থেকেই দেখেছে, রেডিয়েশন পয়েজনিঙে একে একে মারা যাচ্ছে তার আশপাশের চেনা-পরিচিত মানুষেরা, তিলে তিলে। নিজে কীভাবে বেঁচে আছে, তা ভেবে অবাক হতো ছোটবেলায়... কিন্তু বড় হবার পর জানল, পুরোপুরি রক্ষা পায়নি সে; চেহারা তো গেছেই, সেই সঙ্গে চিরদিনের জন্য গেছে পিতা হবার ক্ষমতা। মনটা বিষিয়ে রয়েছিল আগেই--আমেরিকাকে ঘৃণা করত সে তার পরিবারের অকালমৃত্যুর জন্য, মাতৃভূমি জাপানের উপরে ওদের আরোপ করা হাজারটা বিধিনিষেধ আর খবরদারির জন্য। বহু চেষ্টায় আজ জাপান কারিগরি আর অর্থনৈতিক দিক থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বটে, কিন্তু সামরিক শক্তি... তা আর কোনোদিনই ওদেরকে সঞ্চয় করতে দেয়নি আমেরিকা। দমিয়ে রেখেছে সর্বশক্তি দিয়ে। আমেরিকানদের এই সামন্তসুলভ আচরণ কোনোদিনই মেনে নিতে পারেনি নাকামুরা, নিজের বন্ধ্যাত্বের খবর পাবার পর উপচে পড়ল তার ঘৃণার পেয়ালা। জীবনের কাছে চাওয়া-পাওয়ার আর কিছুই রইল না তার, একটা জিনিস ছাড়া—তা হলো প্রতিশোধ!

আমেরিকাকে ঘৃণা করে, কিংবা আমেরিকাকে শায়েস্তা করবার স্বপ্ন দেখে... এমন জাপানি নাগরিকের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবার দুঃসাহস রাখে, এমন মানুষ নেই বললেই চলে। নাকামুরা তার ব্যতিক্রম। ক্ষণিকের উত্তেজনা নয়,

জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছে সে এটাকেই। প্রতিটা পদক্ষেপ নিয়েছে খুব সাবধানে, ভেবে-চিন্তে। তাড়াহুড়ো করেনি, ধৈর্য ধরেছে। জানত, কঠিন এ-লক্ষ্য পূরণের জন্য অগাধ টাকা চাই তার... আর চাই উপযুক্ত মুহূর্ত। জীবনের ঊনসত্তরতম বছরে এসে মিলেছে সে-মুহূর্ত।

কম কষ্ট করেনি নাকামুরা। অনাথ-আশ্রমের চরম কষ্টকর জীবনকে সয়ে নিয়ে লেখাপড়া করেছে, শিক্ষিত হয়েছে। পেটের দায়ে হেন কাজ নেই যা করেনি। চেহারাটা ছিল মস্ত বড় অন্তরায়। কুৎসিতদর্শন একজন মানুষকে সহজে মেনে নেয়নি সমাজ, ভাল কোনও কাজ পেতে দেয়নি তাকে। কিন্তু নিজের মেধা, একাগ্রতা, বুদ্ধি আর সাহস দিয়ে সব বাধা জয় করেছে সে। কারও কাছে হাত পাতেনি, বরং চেষ্টা করেছে নিজের পায়ে দাঁড়াতে। কুলি-মুটে হিসেবে কাজ শুরু করেছিল, এরপর রাস্তার ফেরিঅলা, সেখান থেকে দোকানদার, তারপর ঠিকাদারি... এভাবে ধীরে ধীরে উপরে উঠে এসেছে সে। শেষ পর্যন্ত বেছে নিয়েছে পরিবহন ব্যবসা। সৎভাবে এগোয়নি; জানত, সৎ থেকে কেউ কখনও শীর্ষে আরোহণ করতে পারে না। ধূর্ততা ও নিষ্ঠুরতার পথ অবলম্বন করেছে সে—আইন আর প্রশাসনকে টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে, প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্দয়ভাবে দমিয়ে, ব্যবসাক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে দ্রুত পেরিয়েছে উন্নতির একেকটা ধাপ। বয়স চল্লিশ পেরুনোর আগেই জাপানের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ-মহলে বিশেষ একটি স্থান করে নিয়েছে। আর এখন... দুনিয়ার সবচেয়ে বড় টাইকুনদের একজন নাকামুরা। ট্রান্সপোর্টেশন সেক্টরে সর্বজনবিদিত নাম। অসংখ্য জাহাজ, বিমান আর স্থলযান রয়েছে তার মালিকানায়। ব্যবসা ছড়িয়ে পড়েছে দুনিয়ার আনাচে-কানাচে। প্রায় অসীম তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা; কত টাকার মালিক তা নিজেও ঠিকমত বলতে পারবে

না। বংশধর থাকলে আগামী চার-পাঁচ প্রজন্মকে উপার্জনের চিন্তা করতে হতো না।

এখনই সঠিক সময়... জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্যকে পূরণ করবার জন্য অবশেষে মাঠে নেমেছে সে। অনেক মাথা খাটিয়ে ঠিক করেছে পরিকল্পনা—আমেরিকাকে ধনে-প্রাণে মারবার। প্রথমে দেশটির অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেবে, তারপর ধ্বংস করবে দেশটাকেই। পানামা থেকে পরিচালিত হবে সে-অভিযান। এ-কাজে একা নয় সে, তাকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করছে আমেরিকা-বিদ্বেষী একটি রাষ্ট্র। ওদের সহায়তা পাওয়ায় অনেকটাই সহজ হতে চলেছে তার নীল-নকশার বাস্তবায়ন। অপেক্ষা শুধু সময়ের। খুব শীঘ্রি অবসান ঘটতে চলেছে মার্কিনীদের প্রভুত্বের।

আপন চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল নাকামুরা, দরজা খুলে যাবার শব্দ শুনতে পেল না। ধ্যানভঙ্গ হলো গলা খাঁকারি শুনে। চোখ তুলতেই টেবিলের সামনে ইরি ইয়োশিদাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল, মেয়েটি তার এক্সিকিউটিভ অ্যাসিসটেন্ট... অন্য কথায় ডানহাত। অভিজ্ঞ লোক নাকামুরা; জানে, যোগ্যতার বেলায় ধর্ম, বর্ণ বা লিঙ্গ কোনও অন্তরায় নয়। তাই নারী হয়েও তার সহকারী হতে পেরেছে ইরি। এমনিতে বেশ সুন্দরী সে, বয়সও বেশি নয়। মাথাভরা কাজল কালো কেশ, সেই সঙ্গে লোভনীয় দেহবল্লরী। র‍্যাম্প মডেল ছিল, শয্যাসঙ্গিনী হতে গিয়ে নাকামুরার সঙ্গে পরিচয়। জহুরির মত তাকে চিনে নেয় জাপানি টাইকুন; বুঝে ফেলে, এই মেয়ে তারই মত ধূর্ত, কৌশলী ও নিষ্ঠুর। ওর চিন্তাধারাও নাকামুরার সঙ্গে মেলে। দেরি না করে ওকে অ্যাসিসটেন্ট বানিয়ে নেয় সে... এসব পাঁচ বছর আগের কথা। অল্প সময়ের মধ্যেই নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে দিয়েছে ইরি—ঠাণ্ডা মাথায় এমন সব জটিল সমস্যার সমাধান করেছে, যা

নাকামুরার পুরনো অ্যাসিসটেন্টদের কেউই পারত না। শেষ পর্যন্ত নিজের মূল প্রজেক্টে ওকে অন্তর্ভুক্ত করেছে জাপানি টাইকুন, নিয়ে এসেছে পানামায়। এখানে সরাসরি সবকিছুর দেখাশোনা করছে নাকামুরা—প্রজেক্টের দায়িত্ব আর কারও হাতে তুলে দেবার প্রশ্নই ওঠে না।

'কিছু বলবে?' জিজ্ঞেস করল নাকামুরা।

'অ্যাসল্ট টিমের রিপোর্ট পেয়েছি,' বলল ইরি। 'ওটা জানাতে এলাম আপনাকে।'

মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দুনিয়ার সেরা মার্সেনারিদের ভাড়া করেছে নাকামুরা, গঠন করেছে প্রাইভেট আর্মি। লোকগুলো বিভিন্ন দেশের সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন সদস্য। ওদেরই কয়েকজনকে হেলিকপ্টারসহ নিয়োগ করা হয়েছে রিও টুইরা নদীর উজানে। আর্কিয়োলজি ক্যাম্পে দুর্ঘটনার ব্যাপারটা ওরাই প্রথম আবিষ্কার করে, রিপোর্ট পাঠায়। সেই রিপোর্ট দেখে নাকামুরার নিজস্ব সায়েন্টিফিক এক্সপার্ট কার্বন-ডায়োক্সাইড ইরাপশনের ব্যাপারটা ধরে ফেলে। এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব অনুমান করতে পেরেছিল জাপানি টাইকুন, তাই অ্যাসল্ট টিমকে নির্দেশ দিয়েছিল—যেভাবে হোক, ধামাচাপা দিতে হবে সব। ওরা তখন ক্যাম্পে হানা দিয়ে ঘটনাটাকে কলাম্বিয়ান গেরিলা অ্যাটাকের মত করে সাজায়।

'খবর সব ভাল?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল ইরি। 'বাংলাদেশি ওই আর্কিয়োলজিস্টের ক্যাম্প থেকে সব লাশ নিয়ে গেছে পুলিশ। আমাদের ইনফর্মার খবর দিয়েছে—রুটিন অটোপসি করা হবে ওগুলোর; মৃত্যুর সত্যিকার কারণ উল্লেখ করা হবে না। অ্যাসল্ট টিমের রিপোর্ট অনুযায়ী এলাকাটা এখন ফাঁকা। আমরা আমাদের অপারেশন শুরু করতে পারি। পানামানিয়ান তিনজন লোকালকে লেকের ধারে

পেয়েছিল ওরা, তবে তাদেরকে গায়েব করে দেয়া হয়েছে।'

'তিনজন?' ভুরু কুঁচকে সামনে ঝুঁকল নাকামুরা। 'কারা ওরা? ওখানে কী করছিল?'

'অ্যাসল্ট টিমের ধারণা, স্ক্যাভেঞ্জার। এক্সকাভেশন সাইটে অনেক ইকুইপমেণ্ট পড়ে আছে, ওরা সম্ভবত ওগুলো চুরি করতে গিয়েছিল। রাইফেল ছিল লোকগুলোর হাতে, তবে সেটা অস্বাভাবিক নয়। স্থানীয় লোকজন অস্ত্র ছাড়া জঙ্গলে যায় না। কলাম্বিয়ানদের ভয়ে।'

পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারছে না নাকামুরা। 'কীভাবে জানছি ওদের সঙ্গে আর কেউ ছিল না?'

'আমার মনে হয় এ-নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই,' বলল ইরি। 'পুরো এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়েছে, আর কাউকে পাওয়া যায়নি। অ্যাসল্ট টিমকে যদি কেউ ফাঁকিও দিয়ে থাকে, দ্বিতীয় দফা সি-ও-টু ইরাপশনকে ফাঁকি দিতে পারবে না।'

'কার্বন-ডায়োক্সাইডের ডিপোজিট ক্লিয়ার করা হয়েছে?'

মাথা ঝাঁকাল ইরি। 'দুটো ডেপথ-চার্জ ফেলা হয়েছে লেকে। আমাদের এক্সপার্ট হিসেব করে দেখিয়েছে, এতে পানিতে মিশে থাকা গ্যাসের শেষ কণাও বেরিয়ে যাবে। আশা করছি বারো ঘণ্টার মধ্যেই আবার মিলিয়ে যাবে গ্যাসটা। আগামীকাল আমরা নিরাপদে কাজ করতে পারব। আর কোনও অ্যাকসিডেণ্টাল ইরাপশনের ভয় থাকবে না।'

আশ্বস্ত হয়ে চেয়ারে আবার হেলান দিল নাকামুরা। 'আগামীকাল নয়। তাড়াহুড়ো পছন্দ করি না আমি। তাড়াহুড়ো করতে গেলেই ভুলভাল হয়। কয়েকদিন ওখানে নজর রাখার ব্যবস্থা করো—নিশ্চিত হও পরিস্থিতি সত্যিই কাজ শুরু করবার অনুকূল কি না। তারপর আমি খোঁড়াখুঁড়ির জন্য লোক আর ইকুইপমেণ্ট পাঠাব।'

'দেরি হয়ে যাবে না? আফটার অল, একটা টাইমটেবল ফলো করতে হচ্ছে আমাদেরকে।'

বিরক্ত হলো নাকামুরা। 'টাইমটেবলটা আমিই ঠিক করেছি, আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না। দু'-একদিন দেরিতে কাজ শুরু করলে কোনও সমস্যা নেই, বাড়তি লোক লাগিয়ে ক্ষতিটা পুষিয়ে নেয়া যাবে। বাংলাদেশি ওই আর্কিয়োলজিস্টের মত হাত-পা বাঁধা নয় আমার, যত খুশি টাকা খরচ করতে পারব। দরকার হলে কয়েকশো লোক লাগিয়ে পুরো জঙ্গলটাকে চাষের জমির মত খুঁড়ে একাকার করে ফেলব। ইনকাদের ট্রেজার তখন আমার হাতের মুঠোয় আসতে বাধ্য! তোমাকে যা বলা হয়েছে তা-ই করো।'

'জী, স্যর,' কাঁচুমাচু হয়ে গেল ইরির চেহারা। 'বেয়াদবি হয়ে থাকলে তার জন্য আমি দুঃখিত।'

'এর শাস্তি তুমি জানো।' ওর চোখের উপর স্থির হলো নাকামুরার শীতল দৃষ্টি। তারপর নামতে শুরু করল নীচের দিকে।

আর একটি কথা না বলে জামার বোতামে হাত দিল ইরি। খুলতে শুরু করল। এই শাস্তির অপেক্ষাতেই থাকে ও সারাক্ষণ।

আট

'আমি এখনও বুঝতে পারছি না,' বলে উঠল নেফারতিতি, 'লেক থেকে আবারও কার্বন-ডায়োক্সাইড বের হচ্ছে কীভাবে? তুমি তো বলেছিলে দ্বিতীয়বার ইরাপশন হবার মত ডিপোজিট তৈরি হতে

বহু বছর লেগে যাবে।'

'ওটা প্রাকৃতিক ইরাপশনের বেলায় খাটে—প্রথমবার যেটা ঘটেছিল,' বলল রানা, হাত থেমে নেই। 'কিন্তু এবারেরটা কৃত্রিমভাবে ঘটানো হচ্ছে। হাই এক্সপ্লোসিভের সাহায্যে ডিসচার্জ করানো হলো পানিতে মিশে থাকা অবশিষ্ট সি-ও-টু।'

'কিন্তু কেন? আমরা যে এখানে লুকিয়ে আছি, তা কি ওরা বুঝে ফেলেছে?'

'আমার তা মনে হয় না,' মাথা নাড়ল রানা। 'নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ হবার সম্ভাবনা বেশি। বোধহয় এখানে কাজে নামার আগে লেকটাকে নিরাপদ করে নিচ্ছে ওরা, যাতে আগামীতে হায়দারের টিমের মত দুর্ভাগ্যের শিকার হতে না হয় ওদের লোকজনকে। মাঝখান থেকে বিপদে পড়েছি আমরা।'

'আমরা তো মাটি থেকে অনেক উপরে আছি। গ্যাসটা নীচের দিকে চলে যাবে না?'

'খুব শীঘ্রি না। পজিশনটাই আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। জ্বালামুখটা পেয়ালার মত, জলপ্রপাতের ফাঁকাটুকু ছাড়া আর কোনও আউটলেট নেই, ভিতরে বাতাসও বইছে না যে কার্বন-ডায়োক্সাইডকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। অনেকক্ষণ গ্যাসটা আটকে থাকবে এখানে।'

'তা হলে? কী করব আমরা?'

'একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। দেখি কাজ হয় কি না। গ্যাস যতক্ষণ ক্লিয়ার না হচ্ছে, আমরা এখানেই টিকে থাকার চেষ্টা করব।'

'কীভাবে? কতক্ষণ?' চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মেয়েটার।

'আশা করি আগামীকাল ভোর নাগাদ ঠিক হয়ে যাবে সব।' এক ঝটকায় প্লাস্টিকের একটা পোর্টেবল টেন্টের ভাঁজ খুলল রানা। 'ততক্ষণ পর্যন্ত আশ্রয় নেবার জন্য পরিষ্কার বাতাসের

একটা বাবল্ তৈরি করে নেব আমরা।'

'এই ছোট্ট টেন্টটা?' মাথা নাড়ল নেফারতিতি। 'অসম্ভব! আমাদের তিনজনকে সকাল পর্যন্ত টিকিয়ে রাখার মত ক্যাপাসিটি নেই ওটার—এত বাতাস ধরবে না ওর ভিতরে।'

'আমি সেটা বলছিও না। বাতাসের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করব আমরা,' একটু দূরে পড়ে থাকা মালামালের আরেকটা স্তূপের দিকে ইশারা করল রানা। 'ওখানে হোস পাইপের রোল আর একটা হ্যাণ্ডপাম্প দেখেছি... নিয়ে এসো ওগুলো।'

আনল নেফারতিতি। জিজ্ঞেস করল, 'কীভাবে কাজে লাগবে এগুলো?'

'সিম্পল,' বলল রানা। 'জ্বালামুখের চারদিকের পাড় কম-বেশি বিশ ফুট উঁচু। তারমানে কার্বন-ডায়োক্সাইডের বিশ ফুট স্তরের নীচে চাপা পড়ব আমরা। ঝইরের গাছগুলো লক্ষ করেছ? ওগুলো আরও লম্বা। মগডালে হোসের একটা প্রান্ত বেঁধে অন্য প্রান্ত নিয়ে আসব টেন্টের ভিতরে। এরপর হ্যাণ্ডপাম্পটা আমাদেরকে উপর থেকে পরিষ্কার বাতাস দেবে।'

দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল নেফারতিতির। বুঝতে পেরেছে রানার প্ল্যানটা। 'পুরনো আমলের ব্যাথিস্ফিয়ারের মত, তাই না? হোসটা আমাদের ব্রিদিং টিউব।'

'হ্যাঁ। পার্থক্য শুধু এ-ই যে, পানি নয়, বাতাসের চেয়ে ভারী একটা গ্যাসের তলায় থাকছি আমরা।'

'দারুণ বুদ্ধি এঁটেছ কিন্তু,' বলল নেফারতিতি। সাহস ফিরে পেয়েছে ও। 'আমাকে কী করতে হবে, বলো।'

'আমি টেন্ট খাটাচ্ছি, তুমি হোস নিয়ে গাছের মাথায় সেট করতে পারবে? হাতে সময় বেশি নেই, লেক থেকে খুব দ্রুত বেরুচ্ছে কার্বন-ডায়োক্সাইড। খুব শীঘ্রি আমাদের নাগাল পেয়ে যাবে।'

'যাচ্ছি এখুনি, তুমি পিন্টোকে দেখো।' হোসের রোল নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে গেল নেফারতিতি।

রানাও বেরুল। গাছের তলায় সমতল একটা জায়গা বেছে নিয়ে গ্রাউণ্ড শিট বিছাল, তার উপর খাটিয়ে ফেলল টেন্টটা। ফাঁকগুলো আটকে দিল ডাক্ট টেপ লাগিয়ে। সম্পূর্ণ এয়ারটাইট করে নিচ্ছে ছোট্ট তাঁবুটাকে। মাথায় চিন্তার ঝড়। থিয়োরিটিক্যালি প্ল্যানটা চমৎকার, কিন্তু বাস্তবে হাজারটা সমস্যা দেখা দিতে পারে। জ্বালামুখের পাড় আর গাছের উচ্চতার ব্যাপারে ওর ধারণা ভুল হতে পারে। হোসের মুখটা যদি যথেষ্ট উঁচু না হয়, সেক্ষেত্রে তাজা বাতাসের বদলে বিষাক্ত কার্বন-ডায়োক্সাইড ঢুকে পড়বে টেন্টে। দম আটকে মরতে হবে ওদেরকে। সরু ওই হোসের মাধ্যমে তিন-তিনজন মানুষের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেনের সরবরাহ পাওয়া যাবে, এমন নিশ্চয়তাও নেই।

দুশ্চিন্তাগুলোকে জোর করে মাথা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করল রানা। তেমন কিছু ঘটলে কিচ্ছু করবার নেই, অযথা মাথা গরম করে লাভ হবে না কোনও। পিন্টোকে টেন্টে ঢুকতে বলল ও, তারপর গুহায় গিয়ে নিয়ে এল কতগুলো মোমবাতি। লাইটারের সাহায্যে একটা করে জ্বালল, এরপর গ্যাপ দিয়ে একসারিতে বসাতে থাকল মাটিতে, নিয়ে গেল পানির ধার পর্যন্ত। শেষেরটা জ্বালানোই গেল না, তীরের উপরে ইতিমধ্যে উঠে এসেছে কার্বন-ডায়োক্সাইডের স্তর। তাড়াতাড়ি টেন্টের কাছে ফিরে এল ও, উল্টো ঘুরতেই দেখল, একে একে নিভে যেতে শুরু করেছে মোমবাতির সারি। খুব দ্রুত গ্যাসটা উঠে আসছে উপরে।

নেফারতিতি তখনও গাছের মাথায়। ব্যস্ত হাতে হোস বাঁধছে মগডালের সঙ্গে। সেদিকে তাকিয়ে হাঁক ছাড়ল রানা, 'হারি আপ, নেফি! সময় শেষ!'

'হয়ে গেছে প্রায়,' চেঁচিয়ে উত্তর দিল নেফারতিতি।

আরেকটা মোমবাতি নিভল। যতটা ভেবেছিল, তার চেয়েও অনেক দ্রুত পাহাড়চূড়াকে দখল করে নিচ্ছে কার্বন-ডায়োক্সাইড। পিন্টোকে হাঁপাতে দেখল রানা—ওর ছোট্ট ফুসফুসে অক্সিজেনের অভাব দেখা দিয়েছে।

'হলো, নেফি?' আবার চেঁচাল রানা।

'হ্যাঁ।' বানরের মত কয়েক লাফে গাছ থেকে নেমে এল নেফারতিতি। কাছাকাছি আসতেই ওকে ধরে টেন্টের ভিতর ছুঁড়ে দিল রানা। এরপর ছুরি বের করে টেন্টের উপরিভাগে একটা ফুটো তৈরি করল, ওখান দিয়ে ঢুকিয়ে দিল হোসের অন্য মাথা। সবশেষে নিজে ঢুকে পড়ল টেন্টে।

আয়তনে প্লাস্টিকের তাঁবুটা খুবই ছোট। তিনজনের মাঝে একজন নেহাত শিশু হওয়া সত্ত্বেও গাদাগাদি হয়ে গেছে। তবে তার পরোয়া করল না ও। ভিতরে ঢুকেই ফ্ল্যাপ টেনে ঝটপট চেইন আটকে দিল, ডাক্ট টেপ দিয়ে আটকে দিল চেইনের জয়েন্ট। হোস যেখান দিয়ে ঢুকেছে, সেখানেও টেপ লাগিয়ে ফাঁকফোকর বন্ধ করল। টেন্টের গায়ে ছোট দুটো ফুটো আবিষ্কার করেছে নেফারতিতি, সিল করা হলো ওগুলোও। এরপর হ্যাণ্ডপাম্পের সাকশান ইনলেটে জুড়ল হোসের মাথা। লিভার চাপতেই আউটলেট দিয়ে বেরিয়ে এল পরিষ্কার বাতাস। আপাতত নিরাপদ ওরা, তবে কার্বন-ডায়োক্সাইডের লেভেল বাড়লে কী ঘটবে বলা যাচ্ছে না।

আলো আসার জন্য টেন্টের ফ্ল্যাপে স্বচ্ছ এক টুকরো প্লাস্টিক লাগানো আছে, ওখান দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। একে একে নিভে যাচ্ছে মোমবাতিগুলো। শেষেরটা নিভে যেতেই মড়মড় আওয়াজ করল টেন্টের ফ্রেম, প্লাস্টিকের আবরণ চেপে এল নীচের দিকে। বাতাসের চেয়ে ভারী কার্বন-ডায়োক্সাইড বাড়তি প্রেশার সৃষ্টি করেছে ছোট্ট তাঁবুটার গায়ে। নেফারতিতির চোখে

আতঙ্ক ফুটল, পিন্টোকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল ও; রানার দৃষ্টিও স্থির হয়ে রইল অ্যালুমিনিয়ামে গড়া ফ্রেমটার দিকে। তাঁবু ভেঙে পড়লে সর্বনাশ।

কয়েক মিনিট কেটে গেল রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায়। তবে এর মাঝে পরিস্থিতির আর অবনতি হলো না। চাপ খাওয়া অবস্থায় যেমন ছিল তেমনই রইল টেন্টের দেয়াল আর ফ্রেম। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা, প্রেশারটা সয়ে নিতে পারছে ওদের ছোট্ট আশ্রয়। নেফারতিতির দিকে তাকিয়ে আস্তে মাথা ঝাঁকাল ও, মেঝে থেকে তুলে নিল হ্যাণ্ডপাম্প।

'আমি বাইরে যাব,' আলিঙ্গন থেকে মুক্তি পেয়েই বলে উঠল পিন্টো। 'এখানে আমার ভাল লাগছে না।'

শঙ্কিত চোখে ওর দিকে তাকাল রানা। এ আবার কোন্ বিপদ! বাচ্চাটা পাগলামি শুরু করলে ঠেকানো কঠিন হবে। ওর উদ্দেশে আশ্বাসের হাসি হাসল নেফারতিতি, তারপর নিচু গলায় কথা বলতে শুরু করল পিন্টোর সঙ্গে। কয়েক মুহূর্ত পরেই খিলখিল করে হেসে উঠল বাচ্চাটা, তাকে শুইয়ে দিল ও। গায়ে হাত বোলাতে থাকল। অক্সিজেন-স্বল্পতার কারণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল পিন্টো, কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল।

'থ্যাঙ্কস,' নেফারতিতির দিকে তাকিয়ে বলল রানা, 'বড্ড বাঁচা বাঁচিয়েছ।' সাবধানে হ্যাণ্ডপাম্প অপারেট করছে ও, লিভার চাপার গতি বাড়িয়ে-কমিয়ে বুঝে নিতে চাইছে কোন্ ছন্দে কাজ করলে রাতভর যন্ত্রটা চালু রাখতে পারবে। কয়েক মিনিট কেটে যাওয়ায় বুঝতে পারছে, কৌশলটা কাজে লেগেছে, গ্যাস লেভেলের উপরে রয়েছে ওদের ব্রিদিং টিউব। পাম্প চালিয়ে গেলে বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

'আমি আবার কী করলাম!' বলল নেফারতিতি। 'যা করার করলে তো তুমিই। এখনও শ্বাস নিতে পারছি... এটা সম্পূর্ণ

তোমার কৃতিত্ব!’ ওর বলার ভঙ্গিতে কৃতজ্ঞতা ফুটল।

‘আরে নাহ্!’ বিব্রত গলায় বলল রানা। ‘এ আর এমন কী। টেঁণ্ট তো তুমিও খাটাতে পারতে।’

‘বিনয় কোরো না। এভাবে যে বাঁচা যেতে পারে, সেটা তো আমার মাথাতেই আসেনি। অস্থির হয়ে উঠেছিলাম বোট নিয়ে পালাবার জন্য। ভাগ্যিস তুমি দাওনি। নইলে এতক্ষণে মরে ভূত হয়ে যেতাম। আইডিয়াটা পেলে কীভাবে, বলো তো? চার্জগুলো ফাটার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম গুহায় ছুটে গেলে... চিন্তাভাবনার কোনও সময়ই তো নাওনি!’

‘কী জানি!’ কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ‘হতে পারে অভিজ্ঞতার ফসল।’

‘এমন পরিস্থিতিতে আগেও পড়েছ তুমি?’ বিস্ময় ফুটল নেফারতিতির কণ্ঠে।

হাসল রানা। ‘হুবহু এমন না। তবে জীবনে বহুবার নানা ভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছে আমাকে। বিপদ-আপদ মোকাবেলা করতে করতে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ওই যে... ইংরেজিতে যাকে বলে—*কণ্ডিশনড্*। বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে এখন আর সচেতনভাবে ভাবতে হয় না আমাকে, অনেকটা বলতে পারো ইনস্টিঙ্কটের বশে পরিচালিত হই। প্রসেসটা ব্যাখ্যা করা মুশকিল।’

‘বিপদ-আপদের সঙ্গে কেউ কণ্ডিশনড্ হয়ে যেতে পারে, এমন কথা এই প্রথম শুনলাম। তুমি আসলে কী করো, বলো তো? সাধারণ একজন ইনভেস্টিগেটর বলে কিছুতেই ভাবতে পারছি না তোমাকে।’

‘কেন, ইনভেস্টিগেটররা বিপদে পড়ে না? পেশাটা খুব নিরাপদ ভাবছ বুঝি?’

বুদ্ধিমতী মেয়ে নেফারতিতি; বুঝে নিল, রানা প্রসঙ্গটা এড়াতে

চাইছে। চাপাচাপি করল না আর। তবে অদম্য কৌতূহল কুরে কুরে খেতে থাকল ওকে। প্রতি মুহূর্তে রানা ওর সামনে আরও বড় রহস্য হয়ে দেখা দিচ্ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে আকর্ষণ। ব্যাপারটা মাথায় আসতেই মনে মনে লজ্জা পেয়ে গেল... জীবন-মরণের মাঝে যুদ্ধ চলছে ওদের; এ-অবস্থায় একজন পুরুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করা কি ঠিক?

একটু পরেই আঁধার হয়ে গেল প্রকৃতি। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। লেকের পানির আলোড়ন ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই কোথাও—এখনও গ্যাস বেরুচ্ছে ওখান থেকে। একটা মোমবাতি জ্বালল রানা। আলো দরকার, তা ছাড়া আর্লি ওয়ার্নিং হিসেবে কাজ করবে ওটা। টেন্টের ভিতরে কার্বন-ডায়োক্সাইডের লেভেল বেড়ে গেলে সঙ্কেত দেবে। উল্টোদিকে পাম্প করে রানা তখন টেন্টে আটকা পড়া বাতাস বাইরে ছড়িয়ে দেবে।

ধীরে ধীরে রাত বাড়তে থাকল। তেমন কোনও কথা হলো না রানা আর নেফারতিতির মাঝে। কথা বলে অক্সিজেনের খরচ বাড়াতে চাইছে না। হোসের মাধ্যমে বাতাস আসছে বটে, কিন্তু পরিমাণে খুব বেশি নয়। তা ছাড়া মোমবাতিটাও অক্সিজেন খরচ করছে। মাঝে মাঝে বিশ্রামও নিতে হচ্ছে রানাকে, একটানা পাম্প করতে করতে হাতের পেশি টনটন করছে ওর। নেফারতিতির সঙ্গে দু'বার পালা বদল করেছিল, কিন্তু মেয়েটাকে দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়তে দেখে বুঝে ফেলেছে—কাজটা ওকেই চালিয়ে যেতে হবে।

রাত দশটার দিকে স্তিমিত হয়ে এল লেকের আওয়াজ। দশ মিনিট পর একেবারেই থেমে গেল। শব্দটায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল ওরা, হঠাৎ নেমে আসা নীরবতা অস্বাভাবিক ঠেকল। ঝিমুনি টুটে গেল নেফারতিতির, সোজা হয়ে রানার দিকে তাকাল ও।

'ইরাপশন বন্ধ হয়ে গেছে,' ওকে বলল রানা। 'সুসংবাদ!'

'বেরুনো যাবে এখন?' জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

'উঁহুঁ। তবে এতক্ষণ স্থির ছিল গ্যাসের লেভেল, জলপ্রপাতের গ্যাপ দিয়ে যতখানি বেরুচ্ছিল তা আবার পূরণ হয়ে যাচ্ছিল; এবার কমতে শুরু করবে। আশা করি ভোরের আগেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে।'

'উফ্, ততক্ষণে অচল হয়ে যাব,' ছোট্ট জায়গাটুকুর মধ্যে ঠিকমত নড়তে পারছে না নেফারতিতি। 'আমার হাত-পায়ে খিল ধরে গেছে। তোমার কী অবস্থা?'

'আমি ব্যায়ামের ওপর আছি,' ঠাট্টা করল রানা। ইশারা করল পাম্পের লিভারের সঙ্গে নড়তে থাকা হাতের দিকে। 'খিল ধরবার কোনও সম্ভাবনা নেই।'

'সরি। খুব কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়ই? পাম্পটা এবার আমি চালাই?'

'দরকার নেই, আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি...অনেকটা কণ্ডিশনড্ হয়ে যাওয়ার মত। তুমি বরং ঘুমাবার চেষ্টা করো। প্রয়োজন হলে ডাকব।'

'তুমি একা কষ্ট করবে, আর আমি ঘুমাব? তা কি হয়?'

'মহত্ত্ব দেখাবার জন্য বলছি না। বলছি শক্তি সঞ্চয়ের জন্য। আমি যখন পারব না, তখন তো তোমাকেই চালাতে হবে। ক্লান্ত হয়ে গেলে পাম্পটা চালাবে কী করে?'

'বেশ,' যুক্তিটা মেনে নিল নেফারতিতি। 'তা হলে ঘুমিয়ে পড়লাম। কয়েক ঘণ্টা পর ডেকে দিয়ো, প্লিজ।'

পিন্টোকে জড়িয়ে ধরে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ল ও। ঘুমিয়ে গেল কয়েক মিনিট পরে। জেগে রইল একা রানা। ঘুম ওরও পাচ্ছে, কিন্তু মনের জোরে জাগিয়ে রাখছে নিজেকে। জানে, ওর উপরে নির্ভর করছে বাকি দুজনের জীবন। পাম্পটা কিছুতেই বন্ধ করা চলবে না। একবার এ-হাত, আরেকবার ও-হাত করে লিভার চেপে চলেছে ও। নজর রাখছে মোমবাতির দিকে। ব্যথা ভুলে থাকার জন্য সাহায্য নিচ্ছে আত্মসম্মোহনের।

রাত ধীরে ধীরে গভীর হলো। বারোটা বাজল, তারপর একটা... দুটো... সবই রানার অগোচরে। ততক্ষণে পুরোপুরি যন্ত্রে পরিণত হয়েছে সে। সময়জ্ঞান নেই; হারিয়ে গেছে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ক্লান্তিসহ সব অনুভূতি। স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মত চলছে কেবল ওর হাতদুটো। নেফারতিতিকে আর ডাকা হলো না ওর, ভোরের দিকে মেয়েটা নিজেই জেগে উঠল।

'এ কী! পাঁচটা বেজে গেছে!' হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল ও। 'রানা, আমাকে ডাকোনি কেন?'

ওর কণ্ঠ শুনে ধ্যান ভাঙল রানার। 'কী বললে?'

'ক'টা বাজে দেখেছ? আমাকে ডাকোনি কেন?'

'সরি, সময়ের হিসাব ছিল না।'

'পাম্পটা দাও আমাকে।'

'তার বোধহয় দরকার হবে না,' বাইরে উঁকি দিল রানা। আকাশ খানিকটা ফর্সা হয়ে ওঠায় আবছাভাবে চোখে পড়ছে চারপাশ। 'গাছের পাতা নড়তে দেখছি। তারমানে বাতাস চলতে শুরু করেছে। কার্বন-ডায়োক্সাইড সরে যাওয়ায় উপর থেকে তাজা বাতাস নেমে আসছে।'

'থ্যাঙ্ক গড! চলো, চলো, বেরিয়ে পড়ি।'

'আরেকটু অপেক্ষা করি, ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। রাতভর অপেক্ষা করেছি, আর আধঘণ্টায় কী-ই বা আসে-যায়?'

'তা হলে ওটা আমাকে দাও।' রানার হাত থেকে প্রায় জোর করেই পাম্পটা কেড়ে নিল নেফারতিতি। 'তুমি বিশ্রাম করো।'

প্রতিবাদ করল না রানা... করবার মত অবস্থাও নেই ওর। পাম্প হাতছাড়া করবার সঙ্গে সঙ্গে টনটনিয়ে উঠেছে হাত, হামলা চালিয়েছে মাথাব্যথা। চোখের সামনে ফুটতে শুরু করেছে লাল-নীল ফুল। নিজের অজান্তেই গুঙিয়ে উঠল ও।

'কী হলো?' উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি। 'খারাপ

লাগছে?'

'সিরিয়াস কিছু না,' বলল রানা। 'একটু বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

পরের আধঘণ্টা খুব কষ্টে কাটল। মাথাব্যথা চরমে উঠে গেল রানার, মনে হলো চোখা একটা শিক দিয়ে ওর মগজটাকে খোঁচাচ্ছে কেউ। সেই সঙ্গে শুরু হলো পেট মোচড়ানো। খিদে নয়, সমস্যাটা অন্য কোথাও। এর সঙ্গে যুক্ত হলো পিন্টোর জ্বালাতন। ঘুম ভেঙে গেছে ওর, বাইরে যাবার জন্য কান্নাকাটি করছে। হাজার চেষ্টাতেও তাকে শান্ত করতে পারল না নেফারতিতি। শেষে দুত্তোর বলে উঠে পড়ল রানা।

টেন্টের ফ্রেমের উপর থেকে চাপ কমে গেছে—কার্বন-ডায়োক্সাইড সরে যাবার লক্ষণ। তারপরেও সতর্ক থাকল ও। প্রথমে সামান্য একটু খুলল ফ্ল্যাপের চেইন। ওখান দিয়ে নাক বের করে শ্বাস টানল। ভোরের মুক্ত বাতাসে ভরে গেল ফুসফুস। সন্তুষ্ট হয়ে পুরো ফ্ল্যাপ খুলে ফেলল ও। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই ককিয়ে উঠল। এক ভঙ্গিতে রাতভর বসে থাকতে থাকতে অবশ হয়ে গেছে পিঠ ও পায়ের পেশি।

রানার ইশারা পেয়ে কয়েক মুহূর্ত পর নেফারতিতি আর পিন্টোও বেরুল। ফুসফুস ভরে টেনে নিল মুক্ত বাতাস।

'সকালটাকে আগে কখনও এত ভাল লাগেনি,' বলে উঠল সুন্দরী ক্যাপ্টেন।

পিন্টোও খুশি। তাঁবু থেকে বেরিয়েই আবার ছোটাছুটি শুরু করেছে ও।

রানা বলল, 'ফ্রেশ হয়ে নাও। তারপরেই এখান থেকে কেটে পড়ব। হেলিকপ্টারটা আবার ফিরে আসতে পারে।'

লেকের ধারে গিয়ে প্রাতঃকৃত্য সারল ওরা, মুখ-হাত ধুয়ে

নিল। তারপর পানিতে ক্যানু নামিয়ে রওনা হয়ে গেল। সৈকতে পৌঁছুতে বেশি সময় লাগল না, এরপর জ্বালামুখের পাড় টপকে পাহাড় থেকে নীচে নামল ওরা। মোটরবোটটা যেখানে রেখে গিয়েছিল, সেখানেই পাওয়া গেল। গাছের ছায়ায় বেঁধে রাখায় ওটাকে আকাশ থেকে দেখতে পায়নি হেলিকপ্টারের আরোহীরা, ধ্বংস করে দিয়ে যায়নি। এক মুহূর্তও দেরি না করে বোটে উঠল রানা ও তার সঙ্গীরা। ইঞ্জিন চালু করে ছুটতে শুরু করল ভাটির উদ্দেশে।

কথা বলছে না রানা, চেহারায় ফুটে আছে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ। কী সেই প্রতিজ্ঞা, তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না নেফারতিতির। নিশ্চয়ই এখানকার রহস্যের একটা হেস্তনেস্ত করবে বলে ঠিক করেছে ও... শাস্তি দিতে চাইছে আড়াল থেকে যারা কলকাঠি নাড়ছে, সেই মন্দ মানুষগুলোকে। পারবে? বলা মুশকিল। বয়স খুব বেশি না হলেও অভিজ্ঞতা একেবারে কম নয় নেফারতিতির। জানে, মন্দলোককে শায়েস্তা করা কত কঠিন। টাকা বা ক্ষমতার অভাব থাকে না তাদের, এ-দুটোই তাদেরকে রাখে ধরাছোঁয়ার বাইরে। ওর বর্তমান অ্যাসাইনমেন্টের কথাই ধরা যাক—ড্রাগের চোরাচালান ঠেকাবার জন্য কত কী-ই না করা হচ্ছে, কিন্তু কই... আজ পর্যন্ত তো বন্ধ করা যায়নি এই ভয়ঙ্কর ব্যবসা। অজেয় এক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ওরা দিনের পর দিন, অন্যদিকে ক্রমাগত পকেট ভারী হচ্ছে ড্রাগলর্ডদের। নাম-পরিচয় জানা থাকা সত্ত্বেও কেউ কিছু করতে পারছে না তাদের বিরুদ্ধে আর রানার প্রতিপক্ষ তো এক অচেনা জাপানি ধনকুবের। তার নাগাল পাওয়া আরও কঠিন হবে... প্রায় অসম্ভবই বলা চলে।

এতকিছুর পরেও রানার দিকে তাকিয়ে অন্য ধরনের এক সাহস অনুভব করছে নেফারতিতি। কেন যেন মনে হচ্ছে, এই মানুষটা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। ওর প্রতিটি পদক্ষেপে...

প্রতিটি আচরণে রয়েছে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ছাপ। বোঝা যাচ্ছে, কখনও পিছপা হয় না ও, কখনও হার মানে না। এমন মানুষকে ঠেকিয়ে রাখা মুশকিল। রানার চেহারাই বলে দিচ্ছে, রহস্যের জড় না উপড়ানো পর্যন্ত ও ক্ষান্ত দেবে না। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিল, অথচ একবিন্দু ভয় নেই ওর মাঝে, বরং প্রাণঘাতী বিপদটা যেন আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করেছে ওকে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল নেফারতিতি, রানাকে সাহায্য করবে। অদ্ভুত যে-ঘটনাচক্রে ওরা জড়িয়ে পড়েছে, তার শেষটা দেখবে। পানামায় রানা একা, সাহায্য প্রয়োজন হবে ওর। নুমা থেকে আগেই অনুরোধ পেয়েছে, অতএব কাজটা ওর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। অবশ্য শুধু দায়িত্ববোধ নয়, দুর্ধর্ষ যুবকটির সঙ্গ পাবার লোভও রয়েছে। হোক কাজের খাতিরে, তবু তো কয়েকটা দিন পাশাপাশি থাকা যাবে ওর! কথাটা মনে হতেই বিব্রত হলো তরুণী ক্যাপ্টেন, তাই বলে সিদ্ধান্ত বদলাল না।

ঝড়ের বেগে ছুটছে মোটরবোট, ফুল থ্রটল দিয়ে রেখেছে রানা—দ্রুত সরে পড়তে চাইছে এই এলাকা থেকে... নতুন কোনও বিপদ দেখা দেবার আগেই। চোখের পলকে পেরিয়ে এল হায়দারের ক্যাম্প, ওদিকে ফিরেও তাকাল না। নদীর খরস্রোতা অংশে পৌঁছে গতি কমাতে হলো বটে, কিন্তু সে-জায়গা পেরুবার পর আবারও স্পিড বাড়িয়ে দিল ও।

বারোটা নাগাদ এল্ রিয়ালে পৌঁছুল ওরা। নদীঘাটে বোট রেখে সরাসরি পুলিশ স্টেশনে গেল রানা, কর্নেল রডরিগেজের সঙ্গে দেখা করবে। তিন গাইডের মৃত্যুর ঘটনা রিপোর্ট করবে, হায়দারের লাশটাও পুলিশের কাছ থেকে বুঝে নিয়ে দেশে পাঠাবে। কিন্তু কোনোটাই করা হলো না। কর্নেল অফিসে নেই; কোথায় গেছে, কখন ফিরবে... কেউ বলতে পারছে না। দায়িত্বশীল আর কাউকে পাওয়া গেল না। হায়দারের লাশ

গতকাল সন্ধ্যায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে পানামা সিটিতে, মর্গে নাকি সতেরোটা লাশ রাখার জায়গা ছিল না। কারমেনকে ফোন করল রানা। ও জানাল, রানার দেরি দেখে আজ সকালে ও নিজেই লাশটা বিমানযোগে পাঠিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশের উদ্দেশে। হায়দারের বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা হয়েছে, তাঁরা ঢাকার এয়ারপোর্টে রিসিভ করবেন কফিন।

আপাতত আর কিছু করবার নেই, ধপ্ করে পুলিশ স্টেশনের বেঞ্চে বসে পড়ল রানা। শরীর খারাপ লাগছে—জ্বর জ্বর ভাব। কেমন যেন খিঁচে রয়েছে তলপেট। পেটের ব্যথাটা বেড়েছে, সেইসঙ্গে মাথারটাও।

'কী করবে এখন?' রানাকে জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি। 'কর্নেল রডরিগেজের জন্য অপেক্ষা?'

'নাহ্,' শারীরিক সমস্যাকে অগ্রাহ্য করে উঠে দাঁড়াল রানা। 'ওর সঙ্গে পরেও মোলাকাত করা যাবে। তার আগে আরেকটা ফোন করা দরকার।'

'আর আমি?'

'লেকের ওই হেলিকপ্টারটার ব্যাপারে খোঁজ নেবে। আণ্ডারক্যারিজের রেজিস্ট্রেশন মার্কিং দেখে রেখেছি আমি। কাগজ-কলম আছে?'

'হ্যাঁ।' পকেট থেকে নোটবই আর কলম বের করে দিল নেফারতিতি।

ওকে নম্বরটা লিখে দিল রানা। তারপর পে-ফোন থেকে ঢাকায় ডায়াল করল—বিসিআই হেডকোয়ার্টারে। দু'বার রিং হতেই ওপাশ থেকে সাড়া দিলেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান।

'হ্যালো?'

'রানা বলছি, স্যর।'

‘তোমার ফোনের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম, রানা। ড. হায়দারের ফ্যামিলির কাছ থেকে ওর মারা যাবার খবর পেয়েছি। কীভাবে ঘটল ঘটনাটা? তুমি কোথায় ছিলে?’

‘আমি পৌঁছুনোর আগেই মারা গেছে ও, স্যর। তবে এখানকার লোকজন যেভাবে বলছে, সেভাবে নয়...’

একে একে পানামা পৌঁছুনোর পর যা যা ঘটেছে, সব বলতে শুরু করল রানা। কিন্তু মিনিটখানেক কথা বলেই আচমকা থেমে গেল। চোখের সামনে দুলতে শুরু করেছে দুনিয়া। ঘন ঘন ঢোঁক গিলল কয়েকবার, চেষ্টা করল গলায় উঠে আসা বমিভাবটা দমন করতে।

‘কী হয়েছে, রানা?’ ওপাশ থেকে জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান। ‘থেমে গেলে কেন?’

‘আঁ... আমার শরীরটা ভাল না, স্যর,’ কোনোমতে বলল রানা। ‘বোধহয়...’

কথাটা আর শেষ হলো না, হাত থেকে রিসিভার পড়ে গেল ওর। বাধ্য হলো হাঁটু গেড়ে বসে পড়তে। পরক্ষণে উবু হয়ে বমি করে দিল।

নেফারতিতি দাঁড়িয়ে ছিল একটু দূরে। ওকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ‘রানা!’

রাহাত খানও টেলিফোনে চেঁচালেন, ‘রানা! কী হলো? রানা!!’

ওসবের কিছুই আর শুনতে পেল না রানা। কাত হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল ও। বুজে গেল দু’চোখ।

নয়

অচেনা একটা কণ্ঠ শুনে জেগে উঠছে রানা—ধীরে ধীরে। যেন অন্ধকার থেকে একটু একটু করে আলোয় ফিরে আসা। মাঝখানে কতটা সময় বয়ে গেছে বলতে পারবে না। শরীরে আরামদায়ক অনুভূতি—নরম একটা বিছানায় শুয়ে আছে ও। গায়ে সুতি চাদরের স্পর্শ। কানের কাছে সেই অচেনা গলা।

'মিস্টার রানা... মিস্টার রানা... আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

চোখ খুলল রানা। ওর মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে সাদা অ্যাপ্রন পরা একজন ডাক্তার। পাশে পরিচিত আরও কয়েকটা মুখ দেখতে পেল ও। ক্যাপ্টেন নেফারতিতি শেফার্ড, পিন্টো আর সবশেষ মুখটা অবিশ্বাস্য—বিসিআই-এর চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদ, ওর প্রিয় বন্ধু!

'আঙ্কেল রানা!' ওকে চোখ খুলতে দেখেই খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল পিন্টো।

'হাই, পিন্টো!' একটু হাসল রানা। হাত তুলে বুলিয়ে দিল মাথায়।

'কেমন বোধ করছেন এখন?' ডাক্তার জানতে চাইলেন।

'ভাল,' মৃদুকণ্ঠে বলল রানা। শরীর ঝরঝরে লাগছে। পেট থেকে জানান দিচ্ছে খিদে। 'কোথায় আমি?'

'পানামা সিটির একটা হাসপাতালে,' বলল নেফারতিতি। 'যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে না! ভাগ্যিস এল্ রিয়ালের এয়ারপোর্টে তোমার চার্টার করা বিমানটা পেয়ে গিয়েছিলাম। সরাসরি নিয়ে এসেছি এখানে।'

'তুই এখানে কী করছিস?' সোহেলকে প্রশ্ন করল রানা।

'ভয় কি শুধু এই ভদ্রমহিলাকে পাইয়েছিস? ঘটালি তো ঘটালি... কাণ্ডটা ঘটালি বসের সঙ্গে ফোনে!' কপট বিরক্তি প্রকাশ করল সোহেল। 'বুড়োর তো হার্ট অ্যাটাক হবার দশা। আমাকে পাঁচ মিনিটের নোটিশে জোর করে পাঠিয়ে দিল এখানে। কাউকে বলেও আসতে পারিনি, এক বান্ধবীর সঙ্গে সেদিন বেড়াতে যাবার কথা ছিল। গেল সব পণ্ড হয়ে। শা-আ-লা! ময়লা-আবর্জনা খেয়ে এভাবে ঘায়েল হয় কেউ?'

'মানে?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'প্যারিসের সিউয়ারেজ থেকে যেসব আবর্জনা তোর পেটে গিয়েছিল, সেগুলোই একটু দেরিতে রিঅ্যাক্ট করেছে। সিম্পল বিষক্রিয়া... আর কিছু না। আর এদিকে আমরা তো ভাবলাম কী না কী!'

'ভালই তো,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল রানা, 'আমার কারণে একটা মেয়ে তোর মত দুশ্চরিত্রের খপ্পর থেকে বেঁচে গেল।'

'কী! আমি দুশ্চরিত্র? হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে নে, এর মাশুল যদি কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে না নিয়েছি...'

দুজনের মধ্যকার বাংলায় কথাবার্তা না বুঝলেও ঝগড়াটা বুঝতে পারছে নেফারতিতি বেশ। কড়া গলায় সোহেলকে বলল, 'কী শুরু করলেন আপনি? বেচারার ঠিকমত জ্ঞানই ফিরল না, আর এরই মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিলেন?'

'ওরে বাবা!' আঁতকে ওঠার ভান করল সোহেল। 'এ দেখি রণরঙ্গিনী!' রানার দিকে বাঁকা চোখে তাকাল। 'আমার লাভ-

লাইফের বারোটা বাজিয়ে নিজে দেখি ঠিকই একজনকে বাগিয়ে বসে আছিস।'

'থামবি তুই?' চোখ রাঙাল রানা। তারপর নেফারতিতির দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বলল, 'ও কিছু না। আমাদের মধ্যকার এই আদায়-কাঁচকলায় বন্ধুত্ব সেই ছোটবেলা থেকে।'

'জানি। মি. সোহেল আমাকে সব বলেছেন। তোমার আসল পরিচয়ও ওঁর কাছ থেকেই জেনেছি।'

'সব বলে দিয়েছিস?' একটু অবাক হলো রানা।

'বসের নির্দেশে,' জানাল সোহেল। 'পানামায় নিজস্ব কোনও লোক নেই আমাদের। তাই সবকিছু খুলে বলে ক্যাপ্টেন শেফার্ডের সাহায্য চেয়েছি। নুমা থেকে নাকি আগেই এ-ধরনের আভাস দেয়া হয়েছিল... তাই উনিও রাজি হয়ে গেছেন।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। তারপর মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল, 'বস সত্যিই দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল?'

'ন্যাকা সাজিস না,' বলল সোহেল। 'তোর জন্য বুড়োর টান কতখানি, জানিস না?'

জানে রানা... তারপরেও খবরটা শুনে অন্যরকম ভাল লাগায় ভরে যাচ্ছে মন। ধীরে ধীরে উঠে বসল ও। 'কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম?'

'চার দিন,' জবাব দিলেন ডাক্তার। রানার চোখে বিস্ময় ফুটতে দেখে ব্যাখ্যা করলেন, 'পয়েজনিংটা বেশ সিরিয়াস ধরনের ছিল। আপনার ইন্টারনাল অর্গানে সংক্রমণের ভয় দেখা দিয়েছিল। কড়া অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করেছি আমরা, পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হিসেবে চার দিন ঘুমিয়ে ছিলেন আপনি। এখন অবশ্য সব ঠিক হয়ে গেছে।'

'ছাড়া পাব আজ?'

'উঁহুঁ। পুরোপুরি সুস্থ বলব না আপনাকে, শরীরে শক্তি ফিরতে

সময় লাগবে। আরও কয়েক দিন অবজারভেশনে রাখতে চাই। তারপর নাহয় যাবেন।'

'হাসপাতালে পড়ে থাকা সম্ভব নয় আমার পক্ষে, ডক্টর...' প্রতিবাদ করতে গেল রানা।

'বাড়াবাড়ি কোরো না,' বাধা দিয়ে বলে উঠল নেফারতিতি। 'আর দু'-এক দিনে কিচ্ছু যাবে-আসবে না। বিশ্রাম নাও। অনেক ধকল গেছে তোমার উপর দিয়ে।'

'আমি আর কী বলব?' কাঁধ ঝাঁকাল সোহেল। 'সুযোগ যখন পেয়েছিস, আর ক'টা দিন নাহয় বিছানাতেই কাটা।'

'আমি আসি,' বলে চলে গেলেন ডাক্তার।

'আমার জিনিসপত্র সব কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'লিপিনের ডায়েরিটা?'

'সব বহাল তবিয়তে আছে,' বলল নেফারতিতি, 'আমার জিম্মায়। ওসব নিয়ে পরে মাথা ঘামিয়ো।'

পিণ্টো বিছানার পাশ থেকে নড়েনি। ওর দিকে তাকিয়ে রানা বলল, 'ও এখনও তোমার সঙ্গে আছে?'

'কী করব?'ওর চাচাকে এখনও ট্র্যাক করতে পারিনি। তা ছাড়া আমার খুব একটা অসুবিধেও হচ্ছে না।'

'কিন্তু এভাবে আর ক'দিন?'

'জানি না,' কাঁধ ঝাঁকাল নেফারতিতি। 'তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো, তারপর নাহয় দুজনে একসঙ্গে আলোচনা করে একটা কিছু ঠিক করে নেব।'

দরজার কাছ থেকে নতুন একটা কণ্ঠ ভেসে এল এ-সময়। 'আসতে পারি?'

সোহেল হাতছানি দিতেই খর্বকায় এক যুবক এসে ঢুকল কেবিনে। পানামানিয়ান। বয়স ত্রিশের কোঠায়। রানার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, 'যাক, আপনার জ্ঞান তা হলে ফিরেছে!'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নেফারতিতির দিকে তাকাল রানা, যুবককে চিনতে পারছে না।

'ওফফো, তোমাদের তো পরিচয়ই হয়নি,' বলল নেফারতিতি। 'এ হলো মার্কোস পেরেইরা—আমার পুরনো বন্ধু। ওর বাবাও ঈজিপ্টোলজিস্ট ছিলেন, আমার বাবার সঙ্গে কয়েকটা প্রজেক্টে একসঙ্গে কাজ করেছেন, সেই সূত্রে পরিচয়। পানামা সিটিতে মার্কোস আমার লোকাল কণ্ট্যাক্ট। পেশায় ও একজন ক্যানাল পাইলট..., মানে পানামা খালের ভিতর দিয়ে যেসব জাহাজ চলাচল করে, সেগুলোর গাইড হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। পিণ্টোর বয়সী দুটো বাচ্চা আছে ওর, তাই গত ক'দিন থেকে ওর বাসাতে থাকছি আমরা।'

'নাইস টু মিট ইউ,' হাত মেলাল রানা।

'আপনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন দেখে ভাল লাগছে,' বলল মার্কোস। 'শুনলাম বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। হঠাৎ কলাপস্ করলেন কেন? সিম্পটমগুলো আগেই টের পাননি?'

'শরীর সামান্য খারাপ লাগছিল, কিন্তু পাত্তা দিইনি। আসলে... দেবার মত পরিস্থিতিও ছিল না।'

'হ্যাঁ, আমি শুনেছি। আপনি একাই নেফি আর বাচ্চাটাকে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছেন। রিয়েলি ইম্প্রেসিভ।'

'না, না, তেমন কিছুই নয়।'

একজন নার্স উদয় হলো। সবার উদ্দেশে বলল, 'ভিজিটিং আওয়ার শেষ। আপনারা এবার আসুন। পেশেণ্টকে বিশ্রাম নিতে দিন।'

'আসি তা হলে,' বলল নেফারতিতি। রানার একটা হাত তুলে নিয়ে চুমো দিল ও।

'এখুনি চলে যাবে?' রানা বলল। 'অনেক কিছুই তো জানা হলো না...'

'পরে,' সংক্ষেপে বলল নেফারতিতি। 'সুস্থ হও, তারপর [illegible] কথা হবে।'

'যাই, দোস্ত,' সোহেলও বিদায় নিল।

চলে গেল সবাই।

আটচল্লিশ ঘণ্টা পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল রানা, কিছুটা জোর-জবরদস্তি করে। ওকে আরও কিছুদিন বেড-রেস্টে রাখতে চাইছিলেন ডাক্তার, কিন্তু ও রাজি হয়নি। ঠিকমত খাওয়াদাওয়া করায় শরীরের শক্তি অনেকখানিই ফিরে পেয়েছে ও, মুখিয়ে আছে কাজে নামার জন্য। এরপর কি আর শুয়ে থাকা চলে? এমনিতেই অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। রানাকে হাসপাতাল থেকে নিতে এল নেফারতিতি। ট্যাক্সিতে চেপে সোজা হোটেলে চলে গেল দুজনে, ওখানে দুই কামরার একটা স্যুইট নিয়েছে সোহেল।

সিজার পার্ক নামের সুউচ্চ হোটেলটার অবস্থান পানামা সিটির দক্ষিণ অংশে, সাগরসৈকতের পাশে। প্রথম শ্রেণীর আবাসস্থল, ধনী টুরিস্টদের অস্থায়ী ঠিকানা। দরজা পেরিয়ে লবিতে ঢুকতেই লোকজনের কৌতূহলী দৃষ্টির মুখোমুখি হলো রানা। হাঁটাচলা ঠিকমত করতে পারলেও চামড়া ফ্যাকাসে হয়ে আছে ওর, গর্তে বসে গেছে দু'চোখ। লিফটে চেপে দশতলায় উঠে এল ওরা, নির্ধারিত কামরার সামনে গিয়ে বেল চাপতেই দরজা খুলে দিল সোহেল।

লিভিংরুমে পা রাখতেই চোয়াল ঝুলে পড়ল রানার। কার্পেট, পর্দা, ফার্নিচার, ডেকোরেশন... সবই অত্যন্ত দামি। এমনিতেই ধনীদের হোটেল, তার ওপর একেবারে ফার্স্ট ক্লাস স্যুইট নিয়েছে সোহেল। সবখানে আভিজাত্যের ছোঁয়া।

'করেছিস কী!' আঁতকে উঠল রানা। 'এটার ভাড়া কত?'

'ভাড়া নিয়ে তোকে চিন্তা করতে হবে না,' বলল সোহেল।

'তুই অসুস্থ মানুষ, ভাল জায়গায় না থাকলে ঠিকমত বিশ্রাম নিবি কী করে?'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'সিঙ্গেল রুমে কি আরাম করা যেত না? দুই কামরার স্যুইট নিয়েছিস কেন? শালা, আমার অজুহাত দেখিয়ে নিজে আয়েশ করতে চাইছিস, তা আমি বুঝি না ভেবেছিস?'

'আমাকে নরমাল রুমে রেখে তুই আরাম করতে পারতি? রাতে ঘুমই আসত না!'

'বলেছে তোকে!'

'আবার লেগে গেলে?' বলে উঠল নেফারতিতি। 'তোমাদের নিয়ে তো দেখছি মহা-মুশকিলে পড়ে গেলাম!'

'মুশকিলের কিছু নেই,' বলল সোহেল। 'এখুনি ওকে শান্ত করে দিচ্ছি।' রানার দিকে তাকাল। 'বল্, কী খাবি।'

'তার আগে বল্, বিল কে দেবে?'

হেসে ফেলল সোহেল। 'নাহ্, তোর সঙ্গে পারা যাবে না। আমিই দেব। এবার খুশি?'

'তা হলে লাঞ্চের অর্ডার দে। সবার জন্য।'

'মার্কোসও কিন্তু আসছে,' বলল নেফারতিতি। 'ওকে এখানে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে বলেছি। এখন পর্যন্ত যা যা ইনফরমেশন জোগাড় করতে পেরেছে, সেগুলোর ব্যাপারে ব্রিফ করবে।'

'তা হলে ওর জন্যও অর্ডার দিচ্ছি।' ইন্টারকমের রিসিভার তুলে রুম সার্ভিসে রিং দিল সোহেল।

'পিন্টো কোথায়?' সোফায় বসে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওকে মার্কোসের বাসায় রেখে এসেছি। ওর দুই বাচ্চার সঙ্গে বেশ খাতির জমিয়ে ফেলেছে, খেলছে ওদের সঙ্গে। আমরা তো কাজ করব, তাই আর সঙ্গে আনিনি।'

একটু পরেই বেল বাজল। সোহেল দরজা খুলে দিলে মার্কোস পেরেইরা ঢুকল লিভিংরুমে। হাত মেলাল রানার সঙ্গে।

'আপনাকে আগের চেয়ে অনেক সুস্থ দেখাচ্ছে, মি. রানা,' বলল সে।

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'প্লিজ বসুন।'

সোফায় বসল মার্কোস। চারদিকে নজর বুলিয়ে বলল, 'আপনারা ভাগ্যবান। এ-ধরনের বিলাসবহুল হোটেলে থাকার সৌভাগ্য আমার কোনোদিন হয়নি, হবেও না।'

'কেন, ক্যানাল পাইলটদের আয়-রোজগার কি খুব কম?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'কম তো বটেই,' মাথা ঝাঁকাল মার্কোস। 'আমার অবস্থা আরও খারাপ। গত চার মাস থেকে আমি বেকার। নেফির ইনফরমার হিসেবে টুকটাক যা পাচ্ছি, তা দিয়ে কোনোমতে চালাচ্ছি সংসার।'

'এ-অবস্থা কেন?' জানতে চাইল রানা।

'আমার চাকরি চলে গেছে, লাইসেন্সও বাতিল হয়ে গেছে—অদ্ভুত একটা দুর্ঘটনার কারণে।'

'কী দুর্ঘটনা?'

'আকরিক-বাহী একটা জাহাজের পাইলটিং করছিলাম... পেদ্রো মিগুয়েল লক থেকে বেরিয়ে আটলাণ্টিকের দিকে যাচ্ছি, হঠাৎ কীভাবে যেন লেইন বদলে গেল জাহাজের—আউটগোয়িং লেইন থেকে ভিয়ার করে চলে গেলাম ইনকামিং লেইনে। ছোট্ট একটা ফ্রেইটারকে পাশ থেকে ঘষা দেয় আমাদের জাহাজ, ওয়াটারলাইনের কয়েক ইঞ্চি উপরে ফুটো করে দেয়। কপাল ভাল যে ওটা ডোবেনি... কেউ আহতও হয়নি। তদন্তে আমাদের জাহাজে কোনও মেকানিক্যাল সমস্যা পাওয়া যায়নি, তাই ধরে নেয়া হয়েছে দোষটা আমার... পাইলটিং মিসটেক। আমিই নাকি

ভুল ডিরেকশন দিয়ে আরেক লেইনে নিয়ে গিয়েছিলাম জাহাজকে। শাস্তি, লাইসেন্স বাতিল। কেউ কোনও কথা শুনল না।'

'এটাকে অদ্ভুত বলছেন কেন?'

নেফারতিতি দিল জবাবটা। 'ঠিক একই ঘটনা আরও তিনজন পাইলটের বেলায় ঘটেছে। আমি ওদের সবার সঙ্গে কথা বলেছি। বর্ণনা শুনে মনে হতে পারে, শক্তিশালী কোনও ক্রসকারেণ্ট বা স্রোতের কবলে পড়েছিল জাহাজগুলো, কিন্তু সেটা অসম্ভব। ক্যানালের সবচেয়ে সরু অংশ হলো গেইলার্ড কাট, তার দক্ষিণে পেদ্রো মিগুয়েল লক। ওখানে কোনও ক্রসকারেণ্ট নেই।'

'বাকি তিন পাইলটেরও কি চাকরি চলে গেছে?'

'হ্যাঁ,' বলল মার্কোস। 'নতুন পাইলট নেয়া হয়েছে আমাদের জায়গায়—কোবায়াশি নামে একটা জাপানি কোম্পানি থেকে।'

জাপানি শুনেই নড়েচড়ে বসল রানা। ওদের অদৃশ্য প্রতিপক্ষ এক জাপানি টাইকুন। কোম্পানিটা তারই নয় তো! ওর ভাবনাটার প্রতিফলন ঘটল মার্কোসের পরের কথায়।

'লেকে আপনাদের দেখা হেলিকপ্টারটাও ওদেরই,' বলল সে। 'নেফির কাছ থেকে ওটার আইডেণ্টিফিকেশন নাম্বার পেয়েছি আমি। এভিয়েশন রেজিস্ট্রিতে মিলিয়ে দেখেছি।'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'কোম্পানিটার মালিক কে?'

'নাকামুরা গ্লোবাল ট্রান্সপোর্টেশনের একটা সাবসিডিয়ারি ওটা। মালিক হচ্ছেন...'

'কেনজি নাকামুরা,' বলল রানা। 'দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ট্রান্সপোর্টেশন টাইকুনদের একজন। তাকে চেনে না এমন লোক খুব কমই আছে।'

'মাই গড!' হতভম্ব গলায় বলল নেফারতিতি। 'এ-ই কি আমাদের সেই রহস্যময় ধনকুবের? কেনজি নাকামুরা? যার টাকা

এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির কোনও সীমা-পরিসীমা নেই?'

ওর দিকে ঘাড় ফেরাল রানা। 'ভয় পাচ্ছ?'

'না,' একটু যেন আহত হলো আমেরিকান ক্যাপ্টেন। 'তবে চিন্তিত হচ্ছি। আমরা নাকামুরার নখেরও যোগ্য নই। ওর বিরুদ্ধে নামবার আগে সেটা মাথায় রাখা উচিত।'

'নিজেকে অতটা আণ্ডার-এস্টিমেট কোরো না। যত টাকা-পয়সা বা ক্ষমতা থাকুক না কেন, দুনিয়ায় কেউই ধরাছোঁয়ার বাইরে নয়।'

'নাকামুরার মত বহু লোককে আমরা আগেও শায়েস্তা করেছি,' যোগ করল সোহেল।

'কিন্তু ও কেন ইনকাদের ট্রেজারের পিছনে সময় নষ্ট করবে?' যুক্তি দেখাল নেফারতিতি। 'টাকার অভাব নেই লোকটার। গুপ্তধনের জন্য উন্মাদ হয়ে ওঠাটা তার চরিত্রের সঙ্গে মেলে না।'

সামনে ঝুঁকল রানা। 'তা হলে প্যারিসের অকশন হাউস থেকে কে কিনে নিয়েছে পানামা খাল সংশ্লিষ্ট বইগুলো? কে গুলি করেছে হায়দারের টিমকে? ভলকানিক লেকে কেন ডেপথ চার্জ ফেলা হয়েছে ওর কোম্পানির একটা হেলিকপ্টার থেকে?'

'আপনার সঙ্গে আমি একমত,' বলল মার্কোস। 'এর পিছনে নাকামুরা বা তার কোম্পানির হাত থাকতে বাধ্য। ওদের হেলিকপ্টার আর কারও পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব নয়।'

'পানামাতে কোবায়াশির ঘাঁটি কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'পানামা সিটিতে ছোট একটা অফিস আছে, বিচফ্রণ্টে ওদের ডিরেক্টরের ব্যক্তিগত একটা ভিলাও আছে বলে শুনেছি—ভদ্রলোক মাঝে মাঝে ছুটি কাটাতে আসেন। তবে যদি ঘাঁটির কথা বলেন, সেটা বালবোয়া-তে। ছোট একটা কণ্টেইনার পোর্ট ফ্যাসিলিটি। এককালে ওটা আমেরিকান নেভির বেইস ছিল। সিকিউরিটির দিক থেকে এখনও অনেকটা সে-রকমই রয়ে গেছে—কমপ্লেক্সের

নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত কড়া। যাকে-তাকে ঢুকতে দেয়া হয় না ওখানে।'

'ইন্টারেস্টিং!' মন্তব্য করল রানা। 'ক্যানালের সঙ্গে কোনও কানেকশন আছে ওদের?'

'অনেক টাকা খরচ করে কণ্ট্রাক্ট পেয়েছে—ক্যানালে এখন পাইলট আর অন্যান্য এক্সপার্ট সরবরাহ করে ওরা। নিয়ম অনুসারে স্থানীয় লোকজনকে কাজ দেবার কথা, কিন্তু সেটা পালন করছে না। গত কয়েক মাসে নিজস্ব লোক ছাড়া এখানকার কাউকেই চাকরি দেয়নি। আমাদের ইউনিয়ন থেকে ক্যানাল-ডিরেক্টরের কাছে আর্জি পেশ করা হয়েছিল, তবে কোনও অ্যাকশন নেয়া হয়নি। আমার ধারণা, কোবায়াশির কাছ থেকে নিয়মিত মাসোহারা পাচ্ছে লোকটা।'

'আপনার চাকরি হারানোর পিছনে ওদের হাত আছে ভাবছেন?'

'শুধু ভাবছি না, আমি মোটামুটি শিয়োর। ক্যানাল অপারেশনের বিভিন্ন লেভেলে নিজেদের লোক ঢোকাতে চাইছে ওরা। বিভিন্ন কায়দায় পুরনোদের সরিয়ে দিচ্ছে সে-কারণেই। শুধু পাইলট না, আরও অনেকেই চাকরি হারিয়েছে গত কয়েক মাসে। দুর্ঘটনা, স্ক্যাণ্ডাল, দুর্নীতি... এরকম নানান অভিযোগে।'

'আমার মনে হয় এসবের কারণেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে আমেরিকানরা,' বলল সোহেল। 'এর তদন্ত করবার জন্যই সাহায্য চেয়েছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।'

'হুম,' মাথা ঝাঁকাল রানা। অন্ধকারে সামান্য হলেও আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছে। শত্রুপক্ষের পরিচয় আঁচ করা গেছে। কিন্তু কী তাদের উদ্দেশ্য, অথবা এর সঙ্গে ইনকা ট্রেজারের কী সম্পর্ক, তা বোঝা যাচ্ছে না। প্যারিসে ছিনতাইকারী তরুণের উপর কে গুলি চালিয়েছিল, তা-ও অজানা। 'নেফি, লিপিনের ডায়েরিটা

কোথায়?'

'এখানেই,' বলল নেফারতিতি। 'হোটেলের সেফে রাখার জন্য মি. সোহেলকে দিয়েছিলাম।'

'নিয়ে আসব ওটা?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'পরে,' বলল রানা। 'সময় নিয়ে পড়তে হবে। ডায়েরিটা ফ্রেঞ্চে লেখা।'

'চাইলে আমার সাহায্য নিতে পারো,' বলল নেফারতিতি। 'আমি ফ্রেঞ্চ পড়তে পারি।'

'আমিও পারি। তবে এখুনি ডায়েরি নিয়ে ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। আরও জরুরি কাজ আছে।' সোফায় হেলান দিল রানা। 'একটা সুবিধে আমরা পাচ্ছি—নাকামুরা জানে না, আমরা ওর পিছনে লেগেছি। ব্যাপারটা ও টের পাবার আগেই যতদূর সম্ভব এগিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে। বোঝার চেষ্টা করতে হবে, লোকটার আসল প্ল্যান কী। নেফির সঙ্গে আমি একমত—শুধু গুপ্তধনের খোঁজে এতকিছু ঘটাচ্ছে না লোকটা, এর পিছনে আরও গভীর কোনও উদ্দেশ্য আছে তার।'

'সেটা কীভাবে বের করব আমরা?'

'ছোঁক ছোঁক ক'রে,' হালকা গলায় বলল রানা। 'কোবায়াশির ওই কন্টেইনার ফ্যাসিলিটি সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠছি।' মার্কোসের দিকে তাকাল। 'কতটা জানেন ওটার সম্পর্কে?'

'অনেক কিছুই,' বলল মার্কোস। 'ভিক্টর নামে আমার এক চাচাত ভাই কাজ করে ওখানে—ফর্কলিফট ড্রাইভার। লোক দেখানোর জন্য কয়েকজন পানামানিয়ান ওয়ার্কার রেখেছে ওরা, ও তাদেরই একজন। তবে চাকরিটা বেশিদিন থাকবে বলে মনে হয় না। এরই মধ্যে বেশ কয়েকজনকে ছাঁটাই করেছে ওরা।'

'জায়গাটা সম্পর্কে যতটা যা জানেন, খুলে বলুন আমাকে।'

'সাতান্ন একর জমি নিয়ে গড়ে উঠেছে পুরো কমপ্লেক্স,'

বলতে শুরু করল মার্কোস। 'সাত হাজার ফুট বার্থিং স্পেস আছে জাহাজ ভেড়ানোর জন্য। সাগরের দিকটায় ভবিষ্যতে নতুন ভাসমান জেটি হবে শুনেছি, তবে আপাতত একটা সি-ওয়াল ছাড়া আর কিছু নেই ওদিকটায়। বছরে দু'লাখ কণ্টেইনার হ্যাণ্ডেল করতে পারে ওরা, তবে বাস্তবে তার সিকিভাগও করছে না। ভিক্টরের কাছে শুনেছি ওদের হ্যাণ্ডলিং চার্জ নাকি অন্যান্য পোর্টের দ্বিগুণ।'

'কারণ কী? বাড়তি কোনও সুযোগ-সুবিধা আছে ওখানে?'

'উঁহুঁ, তেমন কিছু না। তবে ওদের অপারেটিং কস্ট অনেক বেশি। সম্প্রতি মেলা টাকা খরচ করে আমেরিকান এক কোম্পানির কাছ থেকে *ট্রান্স-ইসমাস্* রেলরোড কিনে নিয়েছে ওরা, পোর্টে একটা ব্রাঞ্চ লাইন এনেছে ওটার। লাইনটার সঙ্গে অটোমেটেড আনলোডিং অ্যাণ্ড স্ট্যাকিং সিস্টেম বসানো হয়েছে—ওটার সাহায্যে খুব সহজে ফ্রেইট ট্রেন থেকে কণ্টেইনার অফলোড করা যায়।'

'কীভাবে?'

'ওভারহেড কেইবলওয়ে ক্রেইন দিয়ে। কম্পিউটারের সাহায্যে। শুনেছি খুব বেশি লোক লাগে না এতে, এ-কারণেই ছাঁটাই করে দেয়া হচ্ছে ওয়ার্কারদের।'

'ব্যাপারটা রহস্যজনক,' বলল রানা। 'ক্যাপাসিটি অনুসারে যখন কণ্টেইনার হ্যাণ্ডেল করছে না, তখন এত দামি হ্যাণ্ডলিং সিস্টেম বা রেলরোড কেনার মানেটা কী! মনে হচ্ছে তলে তলে আরও অনেক কিছু ঘটছে ওখানে।'

'ঘটলেও আমার কাজিন সেটা জানে না... বা দেখেনি।'

'গোপন কাজকর্ম খোলা জায়গায় হয় না। ওখানে কোনও ওয়্যারহাউস আছে?'

'বেশ ক'টা। সবগুলোই বিশাল।'

'উঁকি দিতে চাই ওখানে। সম্ভব?'

'মনে হয় না। সিকিউরিটি ভীষণ কড়া। কমপ্লেক্সের সীমানা ইলেকট্রিফায়েড ফেন্স দিয়ে ঘেরা... মোশন সেন্সরও বসানো আছে অনেক জায়গায়। আর আছে সশস্ত্র গার্ড। রীতিমত একটা আর্মি পোষা হচ্ছে ওখানে—সদস্যরা বেশিরভাগই প্রাক্তন মিলিটারি পার্সোনেল... বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে। অটোমেটিক ওয়েপন নিয়ে পুরো এলাকায় সারাক্ষণ টহল দেয় ওরা।'

'এ তো রীতিমত বাড়াবাড়ি!' বিস্মিত গলায় বলল সোহেল। 'কন্টেইনার পাহারা দিতে এতকিছু লাগে নাকি? ট্রাক আর ক্রেইন ছাড়া তো ওগুলো কেউ চুরি করতে পারবে না!'

'আমারও একই খটকা,' বলল রানা। 'সেজন্যেই ওখানে ঢুঁ মারতে চাইছি। রাতের বেলা পানির দিক থেকে ঢোকা যাবে না?'

নেতিবাচক জবাব দিল মার্কোস। 'জেটির গ্যান্ট্রি ক্রেইনগুলোর মাথায় ফ্লাডলাইট আছে, অনেকদূর পর্যন্ত আলোকিত করে রাখে। কাছাকাছি যাবার আগেই ওদের স্পিডবোট এসে বাধা দেবে।'

'যদি সাঁতার কেটে যাই?'

'সেটাও ঝুঁকিপূর্ণ। পানিতে কী ধরনের সেন্সর আছে জানি না। তবে আছে... এ-ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। জায়গাটাকে দুর্ভেদ্য দুর্গ বানিয়ে রেখেছে ওরা, সাগরের দিকটায় ঢিল দেবে কেন?'

'সেক্ষেত্রে অন্য কোনও উপায় বের করতে হবে।' চিন্তায় ডুবে গেল রানা। কয়েক মিনিট পর উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চেহারা। 'রেলরোড! ওটা অপারেশনাল, তাই না?'

'হ্যাঁ। তাতে কী?'

'কন্টেইনারগুলো কোত্থেকে আসে?'

'আটলান্টিকের ক্রিস্টোবাল পোর্ট থেকে।'

'দ্যাটস্ ইট! ওখান থেকে একটা কণ্টেইনারে উঠে পড়ব আমরা। কোবায়াশির ফ্যাসিলিটিতে আনলোড হবার পর বেরিয়ে আসব। আপনার কাজিন আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে না?'

'বোধহয় পারবে। এখনও কেইবল ক্রেইন পুরোপুরি চালু হয়নি, ফর্কলিফটের সাহায্যে আনলোডিং করে ওরা। আপনারা কোন্ কণ্টেইনারে থাকবেন, তা জানা থাকলে ও সেটাকে ট্রেন থেকে নামিয়ে জায়গামত নিয়ে যেতে পারবে। কাজশেষে আপনাদেরকে ফিরতিপথের আরেকটা কণ্টেইনারে তুলেও দিতে পারবে।'

'তা হলে তো হয়েই গেল। আপনার কাজিনের সঙ্গে কথা বলে সব ব্যবস্থা করে ফেলুন। আমরা এদিক থেকে ভুয়া একটা কণ্টেইনার শিপমেণ্ট পাঠাব—ক্রিস্টোবাল থেকে বালবোয়ায় যাবে কণ্টেইনারটা।'

'কে কে যাবে ওটাতে?' জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

'আমি আর সোহেল,' বলল রানা।

'আর আমি?'

'তুমি আমাদের ব্যাকআপ হিসেবে থাকবে। যদি কোনও ঝামেলায় পড়ি, তা হলে সাহায্যের প্রয়োজন হবে।'

'উঁহুঁ, আমাকে পিছনে ফেলে যাওয়া চলবে না,' প্রতিবাদ করল নেফারতিতি। 'কোবায়াশির ফ্যাসিলিটিতে কী চলছে, সেটা আমিও দেখতে চাই।'

'জেদ কোরো না, নেফি,' বোঝাতে চাইল রানা। 'কাজটা বিপজ্জনক। আমি আর সোহেল গেলেই ভাল হয়, আমরা এ-সবে অভ্যস্ত।'

'বিপদের ভয় আমাকে দেখিয়ো না, রানা। অবলা নারী নই আমি, আমেরিকান আর্মির ক্যাপ্টেন। লড়াইয়ের ট্রেইনিং আছে আমার... কমব্যাট এক্সপিরিয়েন্সও আছে। আর যা-ই হই, তোমার

বোঝা হয়ে দাঁড়াব না।'

'কিন্তু ব্যাকআপ হিসেবেও তো একজনকে দরকার।'

'আমি আছি না?' বলে উঠল মার্কোস।

'আপনি একা পারবেন না,' বলল রানা। 'বিপদ দেখা দিলে আমাদেরকে উদ্ধারের জন্য লড়াই করতে হবে। তাই আরেকজনের থাকা দরকার।'

'বেশ, তা হলে আমি থাকছি,' শান্ত কণ্ঠে বলল সোহেল। 'ভাব-চক্কোর দেখে মনে হচ্ছে না ক্যাপ্টেন শেফার্ডকে ঠেকানো যাবে। এত যখন আগ্রহ, যেতে দে ওঁকে।'

'ধন্যবাদ,' একটু হাসল নেফারতিতি। 'প্লিজ, আমাকে নেফি বলে ডাকবেন।'

'ঠিক আছে। আমাকে শুধু সোহেল।'

মার্কোস বলল, 'চমৎকার! আমি তা হলে এখুনি কথা বলছি ভিক্টরের সঙ্গে।' টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল সে।

'জাস্ট আ মিনিট,' তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'কিছু করবার আগে ব্যাপারটা ভালমত ভেবে নিয়েছেন তো? অবৈধ এবং বিপজ্জনক একটা কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাইছেন আপনি। খোঁজখবর নিলে আপনার সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে জেনে যাবে শত্রুরা। বড় ধরনের বিপদে পড়তে পারেন তখন। আমাদের পক্ষে হয়তো বা পুরোপুরি নিরাপত্তা দেয়া সম্ভব হবে না আপনাকে, বা আপনার পরিবারকে।'

'বিপদে আমি এমনিতেই আছি, মি. রানা,' বলল মার্কোস। 'শুধু আমি নই; ক্যানালে যত পানামানিয়ান কাজ করে, তাদের সবার একই দশা। আমাদের পেটে লাথি দিতে শুরু করেছে জাপানি কোম্পানিটা। এভাবে চলতে দেয়া যায় না। ওদেরকে ঠেকাতে পারলে বরং আমরা বেঁচে যাব। নিশ্চিন্ত থাকুন, স্বেচ্ছায় আপনাকে সাহায্য করছি আমি... সবদিক ভেবেচিন্তে। আমার

কাজিনও তা-ই করবে। আমাদের নিরাপত্তা নিয়েও ভাবতে হবে না; উই ক্যান টেক কেয়ার অভ আওয়ারসেলভস্।'

'আপনি সত্যিই সাহসী,' প্রশংসা করল রানা।

দরজায় টোকা পড়ল। লাঞ্চ এসে গেছে। আলোচনা ওখানেই মুলতবি করা হলো।

দশ

ক্রিস্টোবাল বন্দর, পানামা।

কন্টেইনারের দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই কালিগোলা অন্ধকারে ডুবে গেল ভিতরটা। ক্লস্ট্রোফোবিয়া না থাকলেও গুমোট বাতাসে অস্বস্তি অনুভব করল রানা। পাশ থেকে নেফারতিতির ঘন ঘন শ্বাস ফেলার শব্দ শুনে বুঝতে পারল, ওরও একই অবস্থা। খানিক পরেই এক ঝটকায় কন্টেইনারকে শূন্যে তুলে ফেলল ফর্কলিফট, তাল হারিয়ে ধাতব দেয়ালের গায়ে আছড়ে পড়ল ওরা। আটলাণ্টিক উপকূলের কার্গো টার্মিনাল থেকে বের করে অপেক্ষমান ফ্ল্যাটবেড রেলওয়ে কারের উপর আবার সশব্দে নামানো হলো ওদেরকে। প্রচণ্ড ঝাঁকিতে ককিয়ে উঠল কন্টেইনারের ধাতব শরীর। দুই আরোহীর অবস্থা তথৈবচ।

সুইচ টিপে ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল রানা, লাল রঙের ফিল্টার লেন্সের কল্যাণে মৃদু আলো ছড়াচ্ছে, ফাঁকফোকর দিয়ে বাইরে বেরুবে না। সঙ্গিনীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ঠিক আছ

তো?'

'মনে হচ্ছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ড্রায়ার মেশিনে ঢুকেছি,' সোজা হয়ে বসে গা থেকে ধুলো ঝাড়ল নেফারতিতি। 'বাপ রে, হাড্ডিগুড্ডি সব নড়ে গেছে। এভাবে আরও কয়েকবার আছাড় খেলে অচল হয়ে যাব।'

'সে-ভয় নেই,' একটু হেসে বলল রানা। 'বালবোয়ায় মার্কোসের কাজিন আমাদেরকে আনলোড করবে। এখানকার ফর্কলিফট ড্রাইভারের মত অজ্ঞ নয় ও, জানে ভেতরে কত সুন্দরী একজন থাকবে... নিশ্চয়ই সাবধানে নামাবে।'

ঘুসি চালাল মেয়েটা রানার কাঁধে।

বাইরে থেকে ভেসে এল ডিজেল ইঞ্জিনের হুইসেল, মৃদু ঝাঁকি খেয়ে চলতে শুরু করল ট্রেন। প্রথমে এলোমেলো আওয়াজ করল চাকা, একটু পরেই ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গিতে ঝিকঝিক করতে থাকল। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল গতি, সেইসঙ্গে আরামদায়ক দুলুনি। পুরনো কাপড়ের স্তূপের মাঝে আয়েশ করে বসল রানা, ছোটবেলা থেকেই ট্রেন-জার্নির এই দুলুনিটা খুব উপভোগ করে ও।

তিনদিন কেটে গেছে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর। এর মাঝে হারানো শক্তি আর উদ্যম ফিরে পেয়েছে ও, একই সঙ্গে নিয়েছে প্রস্তুতি—আজ রাতের এই অভিযানের জন্য। ক্রিস্টোবাল বন্দর থেকে কার্গো কন্টেইনার ভাড়া করেছে, ওটা ভরা হয়েছে পুরনো বাতিল কাপড়চোপড় কিনে। বালবোয়া থেকে পেরুতে পাঠানোর জন্য বুকিং করা হয়েছে এই কার্গো, দক্ষিণ আমেরিকা-গামী জাহাজে লোডিঙের জন্য ট্রান্স-ইসমাস্ রেলরোড দিয়ে এখন কন্টেইনারটা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোবায়াশির কন্টেইনার ইয়ার্ডে।

কবজিতে বাঁধা ট্যাগ-হিউয়ার ঘড়িতে নজর বোলাল রানা, রাত দশটা বাজে। দেড় ঘণ্টা পর কোবায়াশির টার্মিনালে পৌঁছুবে

ওরা। ধরে নেয়া যাক এরপর আনলোডিঙে আরও আধঘণ্টা। তারমানে আগামী দু'ঘণ্টায় বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করবার নেই।

'পারলে একটু ঘুমিয়ে নাও,' নেফিকে বলল ও। 'মাঝরাত পর্যন্ত সময় আছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পুরনো কাপড়ের মাঝে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ল আমেরিকান ক্যাপ্টেন। রানাও শুয়েছে, কিন্তু ঘুম এল না। মনে মনে কোবায়াশি কমপ্লেক্সের ম্যাপটা স্মরণ করল, শিয়োর হয়ে নিল পুরোটা ওর নখদর্পণে আছে কি না। হাতে এঁকে নকশাটা গতকালই ওদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল ভিক্টর, সেটা মুখস্থ করে নিয়েছে ও আর নেফারতিতি। ম্যাপ নিয়ে ভাবতে ভাবতে নিজের অজান্তেই চিন্তাধারা অন্যদিকে প্রবাহিত হলো রানার, মনে পড়ে গেল দু'দিন আগেকার সন্ধ্যার কথা।

টাঙ্গাইলে গ্রামের বাড়িতে হায়দারের দাফন হয়ে গেছে, সে-খবর আগেই পেয়েছিল, তারপরেও সৌজন্য রক্ষার জন্য হায়দারের স্ত্রী কারমেনকে ফোন করেছিল সেদিন সকালে—ও যে পানামা সিটিতে পৌঁছেছে, সেটা জানাবার জন্য। কুশল বিনিময়ের পর পরই দেখা করতে চাইল মেয়েটা। হয়তো বা ওর সঙ্গে শোক ভাগাভাগি করতে চাইছে সে, মানা করলে অভদ্রতা হবে... তাই রানা রাজি হয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যায় শহরের অভিজাত এক ইটালিয়ান রেস্টুরেন্টে মিলিত হলো দুজনে।

কারমেনকে দেখামাত্র ধাক্কা মত খেলো রানা। উগ্র সাজ আর খোলামেলা পোশাক দেখে কে বলবে এ-মেয়ে ক'দিন আগে তার স্বামীকে হারিয়েছে! কড়া প্রসাধন মেখেছে মুখে, ঠোঁটে টকটকা লাল লিপস্টিক, কালো চুল মাথার উপরে তুলে খোঁপা করে রাখায় উন্মুক্ত হয়ে আছে সুডৌল গ্রীবা। পরনে লো-কাট ইভনিং ড্রেস, বুকের প্রায় অর্ধেকটা বেরিয়ে আছে, দেখা যাচ্ছে বুকের গহীন

গিরিখাত। গলায় মুক্তোর নেকলেস, হাতে রূপার ব্রেসলেট... হাই হিলের কারণে নিতম্বে উত্তাল ঢেউ তুলে যখন রানার দিকে এগিয়ে এল, তখন রেস্টুরেণ্টের সমস্ত পুরুষের চোখ আটকে রইল ওর দিকে। সদ্য-বিধবা নয়, ওকে দেখাচ্ছিল পুরুষখেকো ভাড়াটে রমণীর মত।

'কেমন আছ, রানা?' ঠোঁটের কোণে মদির হাসি হেসে বলে উঠল কারমেন। জবাবের অপেক্ষায় থাকল না, ওকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলো গালে।

সাবধানে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা। 'নাইস টু মিট ইউ,' বলে চেয়ার টেনে ধরল, কারমেনকে বসতে সাহায্য করল টেবিলে। তারপর মুখোমুখি নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল।

ওয়েইটার মেনু নিয়ে এলে খাবারের অর্ডার দিল দুজনে। এরপর কারমেন জিজ্ঞেস করল, 'এ-ক'দিন কোথায় ছিলে? আরও আগে যোগাযোগ করোনি কেন?'

'ব্যস্ত ছিলাম,' সংক্ষেপে বলল রানা। 'শরীরটাও বেশি ভাল ছিল না।' ভলকানিক লেকের ঘটনা ওকে জানাবার প্রয়োজন দেখছে না।

'সিরিয়াস কিছু? তোমাকে কেমন যেন দুর্বল দেখাচ্ছে।'

'না, না। তেমন কিছু না।' তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলাল রানা। 'দেশে ফোন করেছিলাম, হায়দারের বাবা বললেন, লাশ পাঠাবার পর তুমি নাকি আর যোগাযোগ করোনি? ওকে কোথায়-কখন দাফন করা হলো, সে-খবরও নাওনি?'

'ওসব জেনে কী আর হবে?' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল কারমেন। 'ভাল কথা, হায়দারের মার্ডারের সঙ্গে প্যারিসের ঘটনার কোনও যোগসূত্র পেয়েছ?'

কেন যেন প্রশ্নটা স্বাভাবিক বলে মনে হলো না রানার। স্বামীর মৃত্যুতে সামান্যতম প্রতিক্রিয়া দেখায়নি যে মেয়ে, হঠাৎ

এ-ব্যাপারটা নিয়ে কৌতূহল দেখাচ্ছে কেন? ওর হাবভাব সন্দেহজনক। তাই সত্য গোপন করে হালকা গলায় ও বলল, 'নাহ্, তেমন কোনও প্রমাণ পাইনি। অবস্থাদৃষ্টে কো-ইনসিডেন্স ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না ঘটনাদুটোকে।'

'আর ইনকাদের গুপ্তধন? সেটার কোনও হদিস পাওয়া গেছে?'

'উঁহুঁ। আমার ধারণা, ওখানে আসলে কোনও গুপ্তধন নেই। অযথাই এতদিন খেটে মরেছে হায়দার। আগেও এ-ধরনের বেশ কয়েকটা বিফল প্রজেক্টে কাজ করেছে ও—তুমি হয়তো জানো।'

একটু যেন মলিন হয়ে গেল কারমেনের চেহারা। স্বামীর জন্য নয়, গুপ্তধনের জন্য! তবে পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল ও। বলল, 'হায়দারের জন্য যে-ডায়েরিটা কিনেছিলে, সেটায় কিছু পাওনি? কোথায় ওটা?'

'ওটা আমার সঙ্গে নেই,' মিথ্যে বলল রানা। 'প্যারিসে আমার অফিসের সেফে রেখে এসেছি, এখানে আনা নিরাপদ মনে হয়নি। যদি চাও তো আনিয়ে দিতে পারি। আফটার অল, ওটা তো হায়দারের জন্যই কিনেছিলাম।'

'যদি আনাতে পারো তো খুব ভাল হয়...'

'কী করবে ওটা নিয়ে?' কায়দামত প্রশ্ন ছুঁড়ল রানা। 'হায়দার তো নেই।'

অপ্রস্তুত হয়ে গেল কারমেন। 'না... মানে... ভাবছিলাম যদি বিক্রি করে কিছু টাকা পাই... তোমার বন্ধু হঠাৎ মারা যাওয়ায় আমি আসলে বিপদে পড়ে গেছি। হাতে টাকা-পয়সা নেই বললেই চলে...'

কথাটা বিশ্বাস করল না রানা। অভাবের কোনও ছাপ নেই কারমেনের চেহারা বা সাজসজ্জায়। তা হলে ডায়েরিটা চাইছে কেন? ওকে আরেকটু বাজিয়ে দেখবে বলে ঠিক করল।

'দশ হাজার ডলার দিয়ে ডায়েরিটা কিনেছি,' বাড়িয়ে বলল ও, 'হায়দার সেটা শোধ করে যেতে পারেনি। ডায়েরিটা তোমাকে দিয়ে দেব, কোনও সমস্যা নেই... কিন্তু দামটা কি তুমি দিতে পারবে?'

'নিশ্চ...' বলতে গিয়ে থেমে গেল কারমেন। বুঝতে পারছে, ওর অভাবের গল্পের সঙ্গে ব্যাপারটা খাপ খাবে না। অসহায় গলায় বলল, 'ইয়ে... না, এত টাকা আমার কাছে নেই। থাক, ডায়েরিটা তোমার কাছেই থাক। আমার প্রয়োজন নেই।'

খাবার এসে গেছে, কারমেন যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে গল্প করতে করতে খাওয়া শেষ করল দুজনে।

'পানামায় আর ক'দিন থাকছ?' টেবিল পরিষ্কার হয়ে গেলে জিজ্ঞেস করল কারমেন।

'এখানে তো আর কোনও কাজ নেই,' বলল রানা। 'কাল-পরশুর মধ্যেই চলে যেতে পারি। দেখি কবেকার টিকেট পাই।'

'হোটেলেই থাকবে এ-ক'দিন?'

'আর কোথায়?'

'আমার বাসা তো খালি পড়ে আছে। চলে এসো না!'

আমন্ত্রণটা স্পষ্ট—কামনায় দু'চোখ জ্বলজ্বল করছে কারমেনের। মাথায় রক্ত চড়ে যাবার দশা রানার, এ-মেয়ে ওকে ভেবেছে কী! শীতল গলায় ও বলল, 'সেটা উচিত হবে না, কারমেন।'

'কেন, আমি তোমার বন্ধুর স্ত্রী বলে?'

'হ্যাঁ।'

একটা সিগারেট ধরাল কারমেন। চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ, এখন আর আমি হায়দারের স্ত্রী নই... এখন আমি মুক্ত, স্বাধীন। তোমাকে গালমন্দ করবার জন্য ও বেঁচেও

নেই।'

'মারা গেছে বলেই ওর প্রতি আমার নৈতিক দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়নি।'

'দায়িত্ব!' একটু যেন রেগে গেল কারমেন। 'কার জন্য দায়িত্ব? যে-লোক স্ত্রীকে একা ফেলে দিনের পর দিন জঙ্গল চষে বেড়িয়েছে? যে-লোক ব্যর্থ একটা এক্সপিডিশনের পিছনে জলের মত টাকা খরচ করেছে? ও আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে আমাকে পথে বসতে হতো, রানা! তোমার কি ধারণা আমাকে নিয়ে... বা আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে ও কোনোদিন পরোয়া করেছে?'

'তোমাদের মধ্যে কী ধরনের সমস্যা ছিল, তা আমি জানি না, কারমেন,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'শুধু এটুকু বলব, মৃত একজন মানুষের বদনাম করে তার আত্মাকে কষ্ট দিয়ো না। হায়দারকে আমি খুব ভাল করে চিনতাম। আর যা-ই হোক, ও কখনও তোমার অমঙ্গল চেয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।'

খেপে গেল কারমেন। 'তোমার বন্ধু আমাকে সহায়-সম্বলহীন এক বিধবা বানিয়ে রেখে গেছে... ওর ভালমানুষির সাফাই গাইতে এসো না। ভিখিরির মত আমি বাঁচতে পারব না, সচ্ছল জীবনযাপনের জন্য নতুন কোনও সঙ্গী আমাকে খুঁজে নিতেই হবে। যদি সেটা তুমি মানতে না পারো, তা হলে জাহান্নামে যাও!'

ওর সঙ্গে বসে আর তর্ক চালিয়ে যাবার রুচি হলো না রানার। বিলের টাকা টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়াল। 'কী করবে না করবে, সেটা তোমার ব্যাপার,' বলল ও। 'দয়া করে আমার সঙ্গে আর কখনও যোগাযোগ কোরো না।'

শাপশাপান্ত করে উঠল কারমেন, না শোনার ভান করে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

ট্রেনের হুইসেল বেজে ওঠায় বাস্তবে আবার ফিরে এল ও। কিন্তু তিক্ততা দূর হলো না মন থেকে। হায়দারের জন্য খারাপ

লাগছে। মানুষ চিনতে পারেনি বেচারা, এমন একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিল, যে টাকা ছাড়া আর কোনও কিছুকে ভালবাসেনি। ওর মৃত্যুতে দু'ফোঁটা চোখের জলও ফেলেনি সে।

'কী হয়েছে?' পাশ থেকে নেফারতিতির কণ্ঠ ভেসে এল। 'তোমাকে বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'তেমন কিছু না। আমার বন্ধু আর ওর বউয়ের কথা ভাবছিলাম। তুমি ঘুমাওনি?'

'ঘুম আসছে না,' উঠে বসল নেফারতিতি। টর্চের মৃদু লাল আলোয় ওকে অন্য ভুবনের কোনও মানবীর মত দেখাচ্ছে। 'সেদিন মিসেস হায়দারের সঙ্গে দেখা করবার পর থেকেই লক্ষ করছি তোমার মুড খারাপ। কী হয়েছিল, আমাকে বলবে?'

'মেয়েটা ভাল নয়,' বলল রানা। সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল ব্যাপারটা। 'আমি জানি না হায়দার বেঁচে থাকতে ওর বউয়ের সত্যিকার চেহারাটা দেখেছে কি না।'

'দুঃখজনক,' সহানুভূতি জানাল নেফারতিতি। 'তবে মন্দ মেয়েরা খুব সহজেই পুরুষদের ধোঁকা দিতে পারে। তোমার বন্ধু সম্ভবত টেরই পায়নি কী ধরনের ডাইনির সঙ্গে সংসার করছিল সে।'

'হয়তো তোমার কথাই ঠিক।'

যাত্রার বাকি অংশটুকু নীরবে কাটল। চুপচাপ শুয়ে রইল দুজনে, কয়েক হাত তফাতে। কিন্তু জাগ্রত। দুজনেই পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছে, কিন্তু সেটা প্রকাশ করবার উপায় নেই।

অনেকক্ষণ পর গতি কমাতে শুরু করল ট্রেন। কর্কশ আওয়াজ উঠল কাপলিংগুলোর। দুলুনি কমে যেতেই উঠে বসল রানা। ঘড়ি দেখল। দেড় ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। গন্তব্য সমাগত।

'উঠে পড়ো,' নেফারতিতিকে বলল ও। 'আমরা সম্ভবত

পৌঁছে গেছি।'

ওকে সমর্থন জানাবার জন্যই বুঝি মোড় নিল ট্রেন, মূল লাইন থেকে ঢুকে পড়ল ব্রাঞ্চ লাইনে—কোবায়াশির ফ্যাসিলিটির দিকে মুখ ঘুরিয়েছে। পাঁচ মিনিটের মাথায় পুরোপুরি থেমে গেল। কাপলিং খোলার শব্দ শোনা গেল, সেই সঙ্গে বাইরে থেকে ভেসে এল মানুষের হাঁকডাক। শেষের তিনটা রেলওয়ে কারকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়া হচ্ছে—বাকিগুলো নিয়ে অন্য ইয়ার্ডে যাবে ট্রেন।

দ্রুত জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল রানা আর নেফারতিতি। ইঞ্জিনের হুইসেল শোনা গেল খানিক পর, ট্রেন চলে যাচ্ছে। কয়েক মিনিট কেটে গেলে একটা ফর্কলিফট ট্রাক এসে থামল ওদের কন্টেইনারের পাশে, শক্তিশালী মোটরের সাহায্যে ফর্কের খোঁচায় ওদেরকে তুলে নিল ফ্ল্যাটবেড থেকে। আবারও সেই ঝটকা অনুভব করল ওরা, তবে এবার আগের চেয়ে কম। রানার কথাই ঠিক—সাবধানে কন্টেইনারকে নাড়াচাড়া করছে ভিক্টর। তবে এরপরেও ঝাঁকুনি পুরোপুরি এড়ানো গেল না, কমপ্লেক্সের এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় এগোবার সময় খানাখন্দে পড়ল ফর্কলিফটের চাকা, ফলে দুলে উঠল কন্টেইনার। ভিতরে পুরনো কাপড়ের স্তূপে গড়াগড়ি খেলো রানা আর নেফারতিতি। অস্বস্তিকর এই পরিস্থিতি অবশ্য খুব বেশিক্ষণ সইতে হলো না, দশ মিনিটের মাথায় জায়গামত পৌঁছে গেল ফর্কলিফট, ধীরে ধীরে ওদেরকে মাটিতে নামিয়ে আনল ভিক্টর।

সোজা হয়ে বসতেই কন্টেইনারের ধাতব দেয়ালে ঠন ঠন করে তিনটা বাড়ি পড়ল—ওটা ভিক্টরের সঙ্কেত; নিজের পরিচয় নিশ্চিত করছে। এ-পাশ থেকে পাল্টা তিনটে বাড়ি দিয়ে রানাও কনফার্ম করল—ওরা ভিতরে আছে। কয়েক মুহূর্ত পর দরজা খুলে গেল। কন্টেইনার থেকে বেরিয়ে এল রানা আর নেফারতিতি।

'*হোলা!* আমি ভিক্টর পেরেইরা,' মার্কোসের চাচাত ভাই হাত

বাড়িয়ে দিল।

'আমি মাসুদ রানা,' করমর্দন করল রানা। সেই সঙ্গে দেখে নিল যুবককে। বিশালদেহী মানুষ—ভালুকের মত দেহ। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথার লম্বা চুল ঝুঁটি করে বাঁধা। ঠোঁটের কোণে একটা জ্বলন্ত সিগারেট ঝুলছে। চেহারায় ফুটে আছে আন্তরিকতা।

'ক্যাপ্টেন নেফারতিতি শেফার্ড,' নেফিও হাত মেলাল।

মার্কোস আগেই জানিয়ে দিয়েছে, ভিক্টর ভাল ইংরেজি জানে না; তাই নেফারতিতিকে ওর সঙ্গে স্প্যানিশে আলোচনা করে নিতে বলল রানা। নিজে নজর বোলাল চারদিকে। কণ্টেইনার ইয়ার্ডে ওদেরকে নিয়ে এসেছে ভিক্টর। চারপাশে থরে থরে সাজানো ফ্রেইট কণ্টেইনারের সারি... প্রাচীরের মত আটকে দিয়েছে দৃষ্টিসীমা। ওগুলো ছাড়া আর মাত্র একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে—তা হলো অতিকায় দানবের মত দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল এক ক্রেইন। ওটার সাহায্যে মালামাল-ভর্তি ভারী কণ্টেইনার ওঠানো-নামানো হয়। কণ্টেইনারের সারির উপর দিয়ে দূর থেকে ভেসে আসছে ফ্লাডলাইটের আভা—পুরো ইয়ার্ড মৃদু আলোকিত হয়ে আছে তার কল্যাণে।

'রানা,' নেফারতিতি ডাকল, 'ভিক্টর বলছে, কমপ্লেক্সের সবচেয়ে ছোট ওয়্যারহাউস... দশ নাম্বার ওয়্যারহাউসে নাকি অস্বাভাবিক কাজকর্ম চলছে। দু'সপ্তাহ আগে খালি করা হয়েছে ওটা, এরপর থেকে হাতে গোনা কিছু জাপানি ওয়ার্কার ছাড়া আর কাউকে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না ওখানে। গতকাল রাতে পতাকাবিহীন একটা জাহাজ থেকে স্পেশাল কার্গো এনে ঢোকানো হয়েছে ওখানে। আজ আবার ওগুলো বেরিয়ে যাবে। এ-রকম নাকি মাঝে মাঝেই হয়।'

'কী ধরনের কার্গো?' জানতে চাইল রানা।

ভিক্টরের সঙ্গে কথা বলল নেফারতিতি, তারপর বলল, 'ও জানে না। কাঠের ক্রেট ছাড়া আর কিছু দেখেনি। তবে কার্গো এলেই ওয়্যারহাউসের চারপাশে সিকিউরিটি বাড়িয়ে দেয়া হয়। আজও তা-ই করা হয়েছে।'

'সবচেয়ে ছোট ওয়্যারহাউস?' ম্যাপ স্মরণ করল রানা। 'যেটা চেইন-লিঙ্কের আট-ফুট উঁচু ফেন্স দিয়ে ঘেরা? ফেন্সের উপরে কাঁটাতারও আছে বোধহয়, তাই না?'

'হ্যাঁ। রীতিমত দুর্ভেদ্য।'

'দুর্ভেদ্যকেই ভেদ করতে হবে।' উপরের দিকে মাথা তুলল রানা। আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে ওভারহেড কেইবলওয়ে ক্রেইনের মোটা মোটা স্টিল-ওয়ায়্যারের সারি। পুরো কমপ্লেক্সের উপরে মাকড়সার জালের মত বিছিয়ে রয়েছে তারগুলো। ভিক্টরকে জিজ্ঞেস করল, 'কেইবলওয়ে কি ওয়্যারহাউসের ওদিক দিয়েও গেছে?'

'হ্যাঁ,' ফর্কলিফট অপারেটরের জবাবটা তরজমা করল নেফারতিতি। 'বিল্ডিংটার ঠিক উপর দিয়ে গেছে এক সেট কেইবল।'

'আমরা যদি কাছাকাছি কোনও সাপোর্ট টাওয়ারে উঠি, তা হলে কি কেইবল বেয়ে সিকিউরিটি ফেন্স পেরুতে পারব?'

'সম্ভব, তবে কেইবলগুলো মাটি থেকে আশি ফুট উপরে,' ভিক্টরের সঙ্গে কথা বলে জানাল নেফারতিতি। 'ওয়্যারহাউসের সীমানার ভিতরে সাপোর্ট টাওয়ারও নেই। নীচে নামবে কীভাবে?'

'আমাদের সঙ্গে দড়ি আছে। দড়ি বেয়ে নামব।'

'আরও সমস্যা আছে। সমান্তরাল তিনটা লাইন আছে কেইবলওয়েতে, এর মধ্যে একটা হলো পাওয়ার লাইন—ওটায় সারাক্ষণই কয়েক হাজার ভোল্টের ইলেকট্রিসিটি প্রবাহিত হচ্ছে। হাত-টাত লেগে গেলে পুড়ে কয়লা হয়ে যাব। তোমার প্ল্যানটা

খুব রিস্কি, রানা।'

'ভিতরে ঢোকার আর কোনও বিকল্প পথ আছে?'

মাথা নাড়ল ভিক্টর।

'তা হলে তো আর কোনও উপায় নেই,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। নেফিকে বলল, 'তুমি চাইলে বাইরে অপেক্ষা করতে পারো, আমি একাই নাহয় যাই।'

আঁতে ঘা লাগল নেফারতিতির। 'এ-কথা কেন বললে? আমাকে ভীতু ভেবেছ? স্রেফ সতর্ক করতে চেয়েছি, তারমানে তো এই নয় যে...'

'কথাটা আমি কোনোকিছু মিন করে বলিনি,' বাধা দিল রানা। 'রিস্কের ব্যাপারে আমিও একমত, সে-কারণেই তোমাকে বাইরে থাকতে বললাম।'

'দর্শক হবার জন্য এতদূর আসিনি,' বলল নেফারতিতি। 'আমি তোমার সঙ্গেই থাকছি।'

'বেশ, তোমার যা মর্জি,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ভিক্টরকে জিজ্ঞেস করো, ক্রিস্টোবালের ফিরতি ট্রেনটা কখন আসবে?'

'দু'ঘণ্টা,' জেনে নিয়ে বলল নেফারতিতি।

'তা হলে এর মাঝেই কাজ সারতে হবে আমাদেরকে। ওকে আশপাশে থাকতে বোলো। আমরা ফিরে এসে যেন সহজে খুঁজে পাই।'

'থাকবে।'

'গুড। তা হলে চলো।'

ফর্কলিফটের মেইনটেন্যান্স বক্স থেকে ওদেরকে দু'জোড়া লেদার-গ্লাভস্ দিল ভিক্টর। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওয়্যারহাউসের উদ্দেশে রওনা হলো রানা আর নেফারতিতি। সন্তর্পণে বেরিয়ে এল কণ্টেইনার ইয়ার্ড থেকে। ছায়া আর অন্ধকার খুঁজে তার মাঝ দিয়ে সতর্ক ভঙ্গিতে এগোল। কোনও ধরনের ভুলচুক করা চলবে

না। সশস্ত্র সিকিউরিটি গার্ড ঘুরে বেড়াচ্ছে সবখানে, শ্রমিকদেরও বন্ধু ভাবার কারণ নেই... ধরা পড়লে সর্বনাশ। শত্রুরা থানা-পুলিশে বিশ্বাস করে না, নির্ঘাত গুলি করে মারবে ওদেরকে। পকেট থেকে পিস্তল বের করল রানা, সাইলেন্সার লাগিয়ে নিল। বিপদ দেখা দিলে লড়বে।

একটু পরেই একটা সাপোর্ট টাওয়ার দেখতে পেল ওরা, তবে পাশ কাটিয়ে গেল ওটাকে। যতটা সম্ভব ওয়্যারহাউসের কাছে গিয়ে টাওয়ারে উঠবে, যাতে কেইবল বেয়ে খুব বেশিদূর যেতে না হয়—কাজটা বিপজ্জনক ও কষ্টকর। রানার কাঁধে টোকা দিয়ে একসারিতে দাঁড়িয়ে থাকা কতগুলো ডাম্প ট্রাক দেখাল নেফারতিতি, ওগুলোর কাভার নিয়ে এগোনো যাবে। মাঝখানে খোলা অনেকখানি এলাকা... একছুটে সেটা পার হলো দুজনে, ট্রাকের ছায়ায় গিয়ে থামল। সেখান থেকে সতর্ক পায়ে আবারও এগোল সামনে। দূরে, জেটির গায়ে ভিড়িয়ে রাখা হয়েছে একটা মস্ত বড় জাহাজ... ঝিকমিক করে জ্বলছে ওটার সব বাতি। গ্যান্ট্রি ক্রেইনের সাহায্যে ওটার হোল্ডে নামানো হচ্ছে একের পর এক কার্গো কন্টেইনার। বাতাসে পোড়া ডিজেল আর ধোঁয়ার গন্ধ।

ট্রাকের সারির মাথায় পৌঁছে থামল দুজনে। আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখল, সামনে রয়েছে সমান্তরাল কয়েকটা রেললাইন। ওখানে পোল-মাউন্টেড আর্ক লাইট জ্বালিয়ে একটা লোকোমোটিভের কাপলিং নিয়ে কাজ করছে দুজন রেলওয়ে ওয়ার্কার। মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রানা, ক্রল করে এগোতে শুরু করল। একে একে পেরিয়ে এল রেললাইনগুলো। পাথরের খোঁচায় কনুইয়ের চামড়া ছড়ে গেল, কিন্তু পরোয়া করল না। রেললাইনের ওপারে কয়েকটা ঝোপ আছে, ঢুকে পড়ল ওখানে। খানিক পরে নেফারতিতিও ওর সঙ্গে যোগ দিল। আর তখুনি পাশ দিয়ে সবেগে চলে গেল একটা ফর্কলিফট।

'জিসাস!' আঁতকে উঠল আমেরিকান ক্যাপ্টেন। 'কোত্থেকে এল দেখতেই পাইনি। আর কয়েক সেকেণ্ড দেরি করলেই তো ধরা পড়ে যেতাম।'

'ওয়্যারহাউসের যত কাছে যাচ্ছি, ততই বাড়ছে কর্মচাঞ্চল্য,' বলল রানা। 'এভাবে বেশিদূর এগোনো যাবে না।'

আবারও ইঞ্জিনের আওয়াজ শোনা যাওয়ায় ঝোপের ভিতরে মাথা নামাল দুজনে। একটা ট্রাক চলে গেল রাস্তা দিয়ে।

'কী করতে চাও?' জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

'পরের টাওয়ারটাতেই উঠে পড়লে ভাল হবে। কী বলো?'

'হ্যাঁ। ঠিক বলেছ।'

মাথা তুলে চারপাশ জরিপ করল রানা। পঞ্চাশ গজ দূরে একটা সাপোর্ট স্ট্রাকচার দেখা যাচ্ছে, মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটায় কয়েকটা কণ্টেইনার পড়ে আছে। নেফারতিতিকে ইশারা করে ওগুলোর দিকে ছুট লাগাল ও, কিন্তু কাছাকাছি গিয়েই প্রমাদ গুনল।

ওভারঅল পরা এক শ্রমিক বেরিয়ে এসেছে কণ্টেইনারের পাশ থেকে! রানাকে দৌড়াতে দেখে বিস্ময় ফুটল লোকটার চেহারায়, চেঁচিয়ে উঠতে গেল সে। হাতে পিস্তল আছে, চাইলে গুলি করা যায়... কিন্তু নিরস্ত্র একজন মানুষকে খুন করা সম্ভব নয় রানার পক্ষে। তাই কৌশল বদলে দশ ফুট দূর থেকে ঝাঁপ দিল ও, রাগবি খেলোয়াড়ের মত ট্যাকেল করে লোকটাকে ফেলে দিল মাটিতে। আছাড় খেয়ে ককিয়ে উঠল শ্রমিক, তার নাকমুখ চেপে ধরল রানা। কয়েক দফা শরীর মোচড়াল লোকটা, কিন্তু ছাড়ল না ও। বাতাসের অভাবে খাবি খেতে থাকল সে, নিস্তেজ হয়ে গেল কিছুক্ষণ পর। জ্ঞান হারিয়েছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে বসল রানা। নেফারতিতি এসে গেছে, উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কোথাও লাগেনি তো?'

'না,' আশপাশে চঞ্চল দৃষ্টি বোলাল রানা—না, কেউ ঘটনাটা দেখতে পায়নি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। অজ্ঞান শ্রমিকের দেহটা লুকিয়ে রাখল দুটো কন্টেইনারের মাঝখানে। তারপর নেফিকে নিয়ে এগোল সাপোর্ট টাওয়ারের দিকে।

টাওয়ার তো নয়, লোহালক্কড়ের অতিকায় এক কঙ্কাল যেন। নীচদিক চওড়া, পিরামিডের মত সরু হয়ে উঠে গেছে বিশ ফুট, এরপর খাড়া স্তম্ভের আকৃতি পেয়েছে উপরদিকের বাকি দৈর্ঘ্য। ছ'ফুট পুরু কংক্রিটের ভিত্তিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাঠামোটা। টাওয়ারের গায়ে মইয়ের মত ধাপ লাগানো আছে, পিস্তল কোমরে গুঁজে ওটায় উঠে পড়ল রানা। নেফারতিতি অনুসরণ করল ওকে। আশি ফুট ওঠার পর চওড়া একটা প্ল্যাটফর্ম পাওয়া গেল, চারপাশ লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। মেইনটেন্যান্সের জন্য বানানো হয়েছে এই প্ল্যাটফর্ম; ভান্টেজ পয়েন্ট হিসেবেও চমৎকার, উচ্চতার কারণে আশপাশে অনেকদূর দৃষ্টি চলে।

উপর থেকে গোটা কমপ্লেক্স দেখতে পেল ওরা। টার্মিনালের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে পানামা খালের মূল চ্যানেল। উল্টোদিকের পাড়ে রয়েছে কোবায়াশির মত আরেকটা ডকসাইড ফ্যাসিলিটি—আলো জ্বলছে সেখানে। চ্যানেল ধরে ঢিমেতালে এগোচ্ছে একটা মালবাহী জাহাজ—মিরাফ্লোরেস লকের দিকে চলেছে। পানিতে আলোড়ন তুলছে ওটার প্রপেলার ব্লেড। কমপ্লেক্সের পিছনদিকে রয়েছে *কোয়ারি হাইটস্*—ইউ.এস. সাদার্ন কমাণ্ডের প্রাক্তন হেডকোয়ার্টার... এখন পরিত্যক্ত।

টার্গেটের দিকে নজর দিল রানা।

চেইন লিঙ্কের ফেন্সে ঘেরা একটা কম্পাউণ্ডের ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ ওয়্যারহাউসটা, আশপাশে আর কোনও বিল্ডিং নেই। অন্যান্য ওয়্যারহাউসের চাইতে ছোট হলেও আয়তন

একেবারে ফেলনা নয়। চওড়ায় প্রায় একশো ফুট, লম্বায় তার চারগুণ। ছাত অন্ধকার, তবে উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে নীচের সবখানে। উপর দিয়ে চলে গেছে ওভারহেড ক্রেইনের কেইবল। ওখানে পৌঁছুনোর জন্য ওই কেইবল বেয়ে প্রায় এক হাজার ফুট দূরত্ব পেরুতে হবে ওদেরকে; পার হতে হবে আরও দুটো টাওয়ার।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কেইবলওয়েের সেটআপ দেখল রানা। সমান্তরালভাবে বসানো হয়েছে তিনটে লাইন, মাঝখানে দু'ফুট করে দূরত্ব—খুব নিরাপদ বলা চলে না। কাছ থেকে বেশ মোটাই দেখাচ্ছে—স্টিলের ছোট ছোট অসংখ্য তার পাকিয়ে তৈরি হয়েছে একেকটা লাইন। কিন্তু দূরে সুতোর মত চিকন মনে হচ্ছে ওগুলোকে। বুকে ভয় জাগায়—ওদের ভার নিতে পারবে তো? তবে সেটা 'অমূলক। ওভারহেড ক্রেইনের সাহায্যে ভারী কার্গো-কণ্টেইনার সরানোর জন্য বসানো হয়েছে লাইনগুলো, সে-তুলনায় দুজন মানুষের ওজন হিসাবেই ধরা চলে না। পাওয়ার লাইনটাও দেখল রানা—ওজনবাহী দুই লাইনের মাঝখানে ওটার অবস্থান। বিপজ্জনক।

'তুমি রেডি?' নেফারতিতিকে জিজ্ঞেস করল ও।

জবাব না দিয়ে নেফি পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'সিস্টেমটা যে অপারেশনাল, তা কি তুমি খেয়াল করেছ?'

'হুঁ,' ঘাড় ফিরিয়ে বাঁয়ে তাকাল রানা। কেইবলওয়েতে ঝুলিয়ে একটা প্রমাণ সাইজের কার্গো-কণ্টেইনার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ফ্যাসিলিটির এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। নেফি কীসের ভয় করছে, তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। ওরা লাইনের মাঝখানে ঝুলে থাকা অবস্থায় যদি কোনও ক্রেইন এসে পড়ে, তা হলে মস্ত বিপদ হবে।

'ও নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না,' আশ্বাস দিল রানা। 'ভিক্টরের

কথা যদি ঠিক হয়, দশ নাম্বার ওয়্যারহাউসে সাধারণ মালামাল রাখে না ওরা। এদিকে ক্রেইন আসা-যাওয়ার কোনও কারণ নেই।'

'তা-ই যেন হয়,' বিড়বিড় করল নেফারতিতি।

'এসো, রওনা হওয়া যাক,' ডাকল রানা। 'সাবধান, পাওয়ার লাইনে যেন ছোঁয়া না লাগে।'

গ্লাভ পরে কেইবলওয়েতে ঝুলে পড়ল ওরা। হাত-পা বাধিয়ে র‍্যাপেলিং করে এগোতে শুরু করল—সামনে রানা, পিছনে নেফারতিতি। নীচ থেকে ভেসে আসছে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি আর মানুষের আওয়াজ—মাঝরাতেও পুরোদমে কাজ চলছে কমপ্লেক্সে। ওদিকে তাকাল না দুজনের কেউই, উচ্চতার কারণে নার্ভাসনেসে আক্রান্ত হতে পারে। মনোযোগ দিল র‍্যাপেলিঙে। স্টিলের কেইবলগুলো গ্রিজমাখা, মুঠো পিছলে যেতে চায়। গ্লাভ না থাকলে নির্ঘাত হাত ফসকে নীচে পড়ে যেত। তটস্থও থাকতে হচ্ছে পাওয়ার লাইন এড়াবার জন্য। হাত-পা নড়াতে হচ্ছে সাবধানে। এগোবার গতি খুবই মন্থর হয়ে পড়ল।

যেন অনন্তকাল পরে দ্বিতীয় টাওয়ারের প্ল্যাটফর্মে পৌঁছুল ওরা। ততক্ষণে হাত-পা আর পিঠের পেশিতে ব্যথা শুরু হয়ে গেছে, গ্রিজের আস্তর পড়ে গেছে পোশাক-আশাকে। ঘড়ি দেখল রানা—আধঘণ্টা পেরিয়ে গেছে তিনভাগের একভাগ দূরত্ব পেরুতে। এই গতি বজায় রাখলে ওয়্যারহাউসে পৌঁছুবার পর কোনও সময়ই থাকবে না হাতে। ট্রেন ধরবার জন্য তাড়াহুড়ো করে ফিরে আসতে হবে।

'আরও তাড়াতাড়ি এগোতে হবে আমাদের,' নেফারতিতিকে বলল ও।

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল তরুণী ক্যাপ্টেন। 'আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব।'

বিশ্রাম না নিয়ে আবারও কেইবলে চড়ল ওরা, ত্রস্ত ভঙ্গিতে এগোতে শুরু করল। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ঘটল বিপত্তি... আচমকা হাত পিছলে গেল রানার। পড়েই যাচ্ছিল; কোনোমতে দু'পা পেঁচিয়ে ফেলল কেইবলে। উল্টো হয়ে ঝুলে গেল শরীর। ফ্ল্যাশলাইট আর পিস্তল কোমরে গুঁজে রেখেছিল, ওগুলো ছুটে গেল। পাগলের মত হাত নাড়ল রানা, পিস্তলটা ক্যাচ ধরে ফেললেও ফ্ল্যাশলাইটটা পারল না। ওকে পেরিয়ে নীচে চলে গেল ওটা।

আতঙ্কে দম আটকে এল রানার। উল্টো হয়ে ঝুলতে থাকায় নীচের ইয়ার্ড পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। অস্ত্রধারী এক গার্ড দাঁড়িয়ে আছে ওখানে—একটা কন্টেইনারের গায়ে হেলান দিয়ে সিগারেট ফুঁকছে, রাইফেল ঝুলিয়ে রেখেছে কাঁধে। লোকটার দশ হাত দূরে আছড়ে পড়ল ফ্ল্যাশলাইট, সশব্দে ভাঙল ওটার কাঁচ। গার্ডকে থমকে যেতে দেখল ও। সিগারেট ফেলে রাইফেল নিয়ে এল হাতে, সতর্ক ভঙ্গিতে ঘুরে গেল শব্দের উৎসের দিকে। পায়ে পায়ে এগোল ওদিকে। ভাঙা ফ্ল্যাশলাইটটা খুঁজে পেতে সময় লাগল না। ওটা কুড়িয়ে নিয়ে বোকা বোকা ভঙ্গিতে এদিক-সেদিক চাইল। বুঝতে পারছে না জিনিসটা কোত্থেকে এসেছে। উপরদিকে একবারও তাকাল না। বোধহয় কল্পনাই করতে পারছে না কেইবলওয়েতে ঝুলন্ত অবস্থায় কেউ থাকতে পারে। আশপাশে হাঁটাহাঁটি করল, কিন্তু পেল না কাউকে। শেষ পর্যন্ত খিস্তি করে উঠল লোকটা, ভাবছে কেউ দুষ্টামি করেছে তার সঙ্গে। ভাঙা ফ্ল্যাশলাইটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আগের জায়গায় ফিরে গেল, ধরাল নতুন একটা সিগারেট।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। আস্তে আস্তে শরীরের ঊর্ধ্বাংশ জাগাল, দু'হাতে ধরে ফেলল কেইবল, তারপর নেফারতিতির দিকে তাকাল। কেইবলে ঝুলন্ত অবস্থায় জমে গেছে তরুণী

ক্যাপ্টেন, দৃষ্টিতে আতঙ্ক।

নার্ভাস হাসি হাসল রানা, কাষ্ঠ গলায় বলল, 'বড্ড বাঁচা বেঁচেছি। ব্যাটা আরেকটু খুঁতখুঁতে স্বভাবের হলেই খবর ছিল।'

কিছু না বলে মাথা ঝাঁকাল নেফারতিতি। ইশারা করল এগোবার জন্য। তাড়াতাড়ি হাত-পা চালাল রানা। পনেরো মিনিটের মধ্যে পরের দুটো টাওয়ার পেরুল ওরা, সিকিউরিটি ফেন্স পেরিয়ে পৌঁছে গেল কাঙ্ক্ষিত ওয়্যারহাউসের উপরে। নীচে তাকিয়ে দেখল, বিল্ডিংটার চারপাশে অস্ত্রধারী প্রহরী মোতায়েন করা হয়েছে। আলোকিত আঙিনায় লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো ডাম্প-ট্রাক। ইঞ্জিন চালু, তবে আইড্‌ল্ করে রাখা হয়েছে। কোথাও যাবার জন্য প্রস্তুত।

বিল্ডিঙের দিকে নজর ফেরাল রানা। ছাতটা কেইবলওয়ে থেকে প্রায় ত্রিশ ফুট নীচে। বৃষ্টির পানি গড়িয়ে নামার জন্য সামান্য ঢালু করে বসানো হয়েছে টিনের পাতগুলো। বাতাস এবং সূর্যের আলো পাওয়ার জন্য বেশ কিছু এয়ার-ভেণ্ট আর স্কাইলাইট আছে। সবচেয়ে বড় কথা, ছাতের উপরে কেউ নেই।

পিঠের ন্যাপস্যাক থেকে দড়ির বাণ্ডিল বের করল রানা, একপ্রান্ত গিঁঠ দিয়ে বাঁধল কেইবলে, বাকিটা নীচে ছেড়ে দিল। ছাতের উপর ঝুপ করে পড়ল কুণ্ডলী। এরপর নিজে সরে গিয়ে নেফারতিতিকে জায়গা করে দিল, আগে ও নামবে। রানার ইশারা পেয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে এল মেয়েটা, দড়িতে সবে হাত দিয়েছে... তখুনি ভীষণভাবে কেঁপে উঠল কেইবল।

ঝাঁকি খেয়ে পড়ে যাবার দশা রানার, সামলে নিয়ে ঝাঁকুনির উৎসের সন্ধানে তাকাল। যা দেখল, তাতে ছলকে উঠল বুকের রক্ত। উল্টোদিক থেকে কেইবল ধরে এগিয়ে আসছে বিশাল এক গ্র্যাপল-ক্যারিজ—ফাঁদে পড়া শিকারের দিকে ঠিক যেভাবে এগোয় শিকারি মাকড়সা। পিন্সারে ঝুলছে বিশাল এক কার্গো

কণ্টেইনার। সব মিলিয়ে ভয়ঙ্কর এক দানবের মত লাগছে ওটাকে—নিঃশব্দে, সাবলীল গতিতে এগোচ্ছে নিশ্চিত মৃত্যুর মত। কেইবলের উপর ঘুরতে থাকা চাকাগুলোর দিকে চোখ চলে গেল—একেকটা চারফুট ব্যাসের, কিনারগুলো ছুরির মত ধারালো। নাগাল পেলে ওদেরকে কিমা বানিয়ে ফেলবে।

নেফারতিতিও থমকে গেছে। ওর দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল রানা, 'কুইক! ওটা এখুনি চলে আসবে।'

পাগলের মত দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল নেফারতিতি, সরসর করে নেমে গেল কয়েক ফুট। রানাও পিছু পিছু নামতে শুরু করল।

'থেমো না। চাকার তলায় পড়ামাত্র দড়িটা দু'টুকরো হয়ে যাবে।'

দক্ষ ভঙ্গিতে দড়ি বেয়ে ওয়্যারহাউসের ছাতে নেমে গেল নেফারতিতি। রানা পুরোপুরি সফল হলো না, আট ফুট বাকি থাকতেই ওর উপরে চলে এল গ্র্যাপল-ক্যারিজ, চোখের পলকে হাতের মুঠোয় শিথিল হয়ে গেল টান টান দড়িটা। ঝপ্ করে ছাতের উপর নেমে এল ও। তাল হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল আরেকটু হলেই, পাশ থেকে ওকে ধরে ফেলল নেফারতিতি।

'থ্যাঙ্কস,' সোজা হয়ে ওকে ধন্যবাদ জানাল রানা।

মুখ কালো করে উপরদিকে তাকাল নেফারতিতি। দড়িটা ছিঁড়ে পড়ে গেছে, কেইবলওয়েতে ফেরার পথ রুদ্ধ। ওয়্যারহাউসের উপরে আটকা পড়ে গেছে ওরা।

'আমরা এবার ফিরব কী করে?'

'যখনকারটা তখন দেখা যাবে,' হালকা গলায় বলল রানা। 'এখুনি ও-নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। যে-কাজে এসেছি, সেটা আগে শেষ করি।'

কয়েক ফুট দূরে একটা স্কাইলাইট দেখা যাচ্ছে, সেদিকে এগিয়ে গেল ও। পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল, কাঁচ ভেদ করে

উঁকি দিল নীচে। সারি সারি কন্টেইনার রাখা হয়েছে ওয়্যারহাউসের ভিতরে। সামরিক ধাঁচের ইউনিফর্ম পরা কিছু লোক দেখা গেল, ক্ষণে ক্ষণে উদয় হচ্ছে দৃষ্টিসীমায়। ছাতের দুই অবাঞ্ছিত অতিথির ব্যাপারে সচেতন নয়।

একে একে আরও কয়েকটা স্কাইলাইট দিয়ে উঁকি দিল ওরা, বুঝে নিল পুরো ওয়্যারহাউসের লে-আউট। সন্তুষ্ট হবার পর ভিতরে ঢোকার সিদ্ধান্ত নিল রানা। এক প্রান্তের একটা এয়ার ভেন্ট বেছে নিল প্রবেশপথ হিসেবে। ওটার তলায় রয়েছে ওয়্যারহাউসের দোতলার স্টোরেজ লেভেল, দেখতে অনেকটা ব্যালকনির মত—প্যাকিঙের খালি বাক্স ছাড়া আর কিছু নেই ওখানে। এদিকে কাজ নেই, কারও আনাগোনাও নেই।

এয়ার ভেন্টের মুখ খুলে ফেলল রানা, নেফারতিতিকে নিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই প্যাকিং বক্সের স্তূপের পাশে নিঃশব্দে নেমে এল দুজনে। হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেল রেলিঙের পাশে। সাবধানে মাথা তুলে নীচে তাকাল।

ওয়্যারহাউসের ভিতরে, একপাশের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বেশ ক'টা এইট-হুইলার ট্রাক, পিছনে ক্রেইন লাগানো... বিশেষ ধরনের কার্গো পরিবহনের উপযোগী। আরেক পাশের দেয়াল প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে নির্মাণকাজে ব্যবহার্য বালির পাহাড়তুল্য এক স্তূপের আড়ালে—জাহাজ থেকে আনলোড করে ওয়্যারহাউসে ডাম্প করা হয়েছে এই বালি; প্রয়োজনমাফিক ট্রাকে ভরে ফের সরবরাহ করা হবে। দোতলার ব্যালকনির পাশ দিয়ে প্রায় ছাত ছুঁয়েছে বালির পাহাড়। একটা ক্যাটারপিলার স্কিপলোডার চুপচাপ বসে আছে ওটার গোড়ায়। ওয়্যারহাউসের মাঝখানে বেশ খানিকটা জায়গা ফাঁকা, সেখানে কাজ করছে কিছু শ্রমিক—ইঁটের আকারের কী যেন বয়ে নিয়ে গিয়ে লোড করছে একটা আর্মার্ড ভ্যানের পিছনে। কাপড়ে মোড়া ব্লকগুলো ছোট

হলেও ভারী, বয়ে নেবার সময় সামনের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে লোকগুলো। অটোমেটিক রাইফেল হাতে তাদেরকে পাহারা দিচ্ছে ছ'জন গার্ড। সুট-পরা আরও দুজনকে দেখা গেল খানিক দূরে—সুপারভাইজর, কাজ তদারক করছে।

'কী লোড করছে ওরা?' ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

ব্যাগ থেকে বিনকিউলার বের করল রানা, চোখে ঠেকিয়ে কয়েক সেকেণ্ড জরিপ করল শ্রমিকদেরকে। চারকোনা ছোট্ট ব্লক, অথচ বেশ ওজন... একটামাত্র জিনিস অমন ভারী হতে পারে। 'সোনা,' বলল ও। বিনকিউলারটা তুলে দিল নেফারতিতির হাতে।

ওর কথাকে সত্য প্রমাণের জন্যই যেন একজন সুপারভাইজর এগিয়ে গেল ভ্যানের দিকে। কাপড়ের আবরণ সরিয়ে একটা ব্লক নেড়েচেড়ে দেখল। দূর থেকেও ওটার সোনালি আভা দেখতে পেল রানা আর নেফারতিতি।

'মাই গড!' চোখে বিনকিউলার ঠেকিয়ে হতভম্ব গলায় বলে উঠল মেয়েটি, 'সত্যিই দেখছি সোনা!'

মনে মনে পুরো লোডের একটা আনুমানিক হিসাব করে ফেলল রানা। ভ্যানের পিছনে যে-পরিমাণ গোল্ড-বার দেখা যাচ্ছে, তার বাজার-মূল্য অন্তত ষাট মিলিয়ন ডলারের কম নয়।

'এত সোনা এল কোত্থেকে?' বিভ্রান্ত গলায় বলল নেফারতিতি। 'ইনকাদের গুপ্তধন নয়তো? ওরা উদ্ধার করে এনেছে?'

'কী জানি,' দ্বিধান্বিত গলায় বলল রানা। 'না-ও হতে পারে।'

'গুপ্তধন ছাড়া এত সোনা পাবে কোথায়?'

'বুঝতে পারছি না। আসলে... ইনকাদের আমলে গোল্ড-বার ছিল না। অলঙ্কার বা মূর্তি-টুর্তি হলে বরং বিশ্বাসযোগ্য হতো...'

'ওরা গলিয়ে নিতে পারে না?' যুক্তি দেখাল নেফারতিতি, 'তুমি হাসপাতালে ছিলে... এর মাঝে ওরা তো বেশ ক'দিন সময় পেয়েছে। হয়তো সোনা গলিয়ে গোল্ড-বার বানিয়ে নিয়েছে। কাজটা সম্ভবত এই ওয়্যারহাউসেই করা হয়েছে, তাই কাউকে এটার ধারে-কাছে ঘেঁষতে দেয়া হয়নি এতদিন।'

'এত সোনা গলাতে গেলে বড় চুল্লী দরকার। তেমন কিছু তো দেখছি না। তা ছাড়া অমূল্য ট্রেজার গলিয়ে কী লাভ ওদের? সোনার চেয়ে অ্যান্টিকের দাম অনেক-অনেক বেশি।'

'পাচার করতে সুবিধা হবে বলে গলিয়ে নিতে পারে। এই পরিমাণ ট্রেজার অক্ষত অবস্থায় সরানো সহজ কাজ নয়।'

'কোথায় পাচার করবে? দেশের বাইরে? তা হলে আর্মার্ড ভ্যানে তুলছে কেন? এখান থেকে তো সরাসরি একটা জাহাজেই তুলতে পারত। তা ছাড়া গলাবার আগে এখান পর্যন্ত নিশ্চয়ই আনতে হয়েছে ট্রেজারগুলো। না গলিয়ে কীভাবে আনল? এখান পর্যন্ত আনতে পারলে অক্ষত অবস্থায় জাহাজে তুলতে অসুবিধে কী? নাহ্... কী যেন মিলছে না।'

'হুঁ,' একমত হলো নেফারতিতি। 'ব্যাপারটা গোলমেলে বটে। এখন তা হলে কী করবে?'

'আপাতত কিছু করবার নেই। চুপচাপ ফিরে যাওয়াই ভাল।'

'কীভাবে? যে-পথে এসেছি, সে-পথ তো বন্ধ হয়ে গেছে।'

'দাঁড়াও, ভেবে দেখি...'

কথা শেষ হলো না রানার, তার আগেই পিছন থেকে রাইফেল কক করার শব্দ হলো। জমে গেল দুজনে।

'অ্যাই! তোমরা এখানে কী করছ?' কর্কশ কণ্ঠ ভেসে এল।

ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল রানা আর নেফারতিতি। অস্ত্রধারী এক গার্ড দাঁড়িয়ে আছে ওদের মাত্র কয়েক হাত পিছনে। কখন যে লোকটা চুপিসারে হাজির হয়েছে, তা ওরা টেরই পায়নি।

জবাব দেবার চেষ্টা করল না রানা, বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে। হাতে ধরা ব্যাকপ্যাকটা ছুঁড়ে দিল গার্ডের দিকে, পরক্ষণে বাঘের মত ঝাঁপ দিল তাকে লক্ষ্য করে। হতচকিত হয়ে পড়েছিল লোকটা, তাকে জাপটে ধরে টিনের উপর আছড়ে পড়ল ও। পাগলের মত ট্রিগার চাপল গার্ড, রাইফেলের নল সরে যাওয়ায় গুলিটা রানার কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। শুরু হলো ধস্তাধস্তি।

দুই শরীরের মাঝখানে আটকা পড়ে গেছে রাইফেলটা, ওটা সোজা করতে না পেরে একহাতে রানার গলা চেপে ধরল গার্ড। দম আটকে এল রানার; খাবি খেতে শুরু করল অক্সিজেনের অভাবে। উপায়ান্তর না দেখে আঙুলের খোঁচা মারল প্রতিপক্ষের বাম চোখে। কাতরে উঠল গার্ড, হাতের মুঠো আলগা করতে বাধ্য হলো। এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে পাশে গড়ান দিল রানা। সোজা হতেই দেখল, রাইফেল তাক করছে লোকটা। আর তখুনি ছুটে এল নেফারতিতি, লাথি মারল তার হাতে। রাইফেলটা উড়ে চলে গেল এক দিকে। পাগলের মত হাত চালাল গার্ড, পায়ের উপর এক থাবড়ায় সুন্দরী ক্যাপ্টেনের ব্যালান্স নষ্ট করে দিল। মাটিতে আছড়ে পড়ল ও।

এক লাফে উঠে দাঁড়াল গার্ড। রাইফেলের দিকে ছুট লাগাল, ওটা রেলিঙের গোড়ায় গিয়ে পড়েছে। কাছে উবু হলো ওটা তুলে নেবার জন্য। রানাও তার পিছু পিছু ছুটে এসেছে, লোকটা উবু হতেই পিছন থেকে তার পাছায় সর্বশক্তিতে একটা লাথি মারল। সামনের দিকে ছিটকে গেল সে, রেলিং টপকে পড়ে গেল নীচে। একটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল গলা চিরে। তার পরিণতি দেখবার জন্য সময় নষ্ট করল না রানা। নীচে হাঁকডাক শুরু হয়ে গেছে, অস্ত্র বাগিয়ে ছুটে আসছে বাকি গার্ডরা। তাড়াতাড়ি নেফারতিতিকে টেনে তুলল ও।

'চলো পালাই।'

'কীভাবে?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল নেফারতিতি। ইশারায় সিঁড়ি দেখাল। 'নামার রাস্তা তো ওই একটাই। ওখান দিয়ে উঠে আসছে ওরা।'

'আমাকে ফলো করো।' রেলিঙের কাছে চলে গেল রানা, উপরে উঠে ঝাঁপ দিল—বালির স্তূপের দিকে। নরম ঢালে আছড়ে পড়ল ও, পিছু পিছু নেফারতিতি। পড়েই দুজনে গড়াতে শুরু করল। ব্যালকনিতে ততক্ষণে উঠে পড়েছে নীচের ছয় গার্ড, রেলিঙের পাশে এসে গুলি ছুঁড়ল। তবে ওদের গায়ে লাগল না একটাও, বালির ভিতরে মুখ লুকাল লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট।

স্তূপের গোড়ায় পৌঁছে সোজা হলো রানা, নেফারতিতিকে টেনে নিয়ে এল ক্যাটারপিলার স্কিপলোডারের পিছনে। উপর থেকে তখনও গুলি ছুঁড়ছে শত্রুরা, লোডারের ধাতব শরীর বর্ম হিসেবে রক্ষা করল ওদেরকে।

'এখানে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না,' বলল নেফারতিতি।

'জানি,' বলল রানা। ওয়্যারহাউসের দরজার দিকে নজর চলে গেল ওর। বাইরের গার্ডরা ঢুকতে শুরু করেছে ওখান দিয়ে। উঁকি দিল স্কিপলোডারের ভিতরে। ইগনিশনে চাবি ঝুলছে। মুখে হাসি ফুটল ওর। 'এসো।'

ঝটপট দুজনে উঠে পড়ল স্কিপলোডারে। চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিন চালু করল রানা, বাকেটটা মাটি থেকে তুলে সামনের দিকে ছোটাল বাহনটাকে। বাকেটটা আরেকটু তুলল ও, গুলি করা হলে যেন বর্ম হিসেবে কাজ করে। তা-ই ঘটল, বৃষ্টির মত গুলি ছুটে এল ওদেরকে লক্ষ্য করে। ইস্পাতের বাকেটে ফুলকি তুলে ছিটকাতে শুরু করল বুলেট।

'গুলি করো!' ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে চেঁচাল রানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে কোমর থেকে পিস্তল বের করল নেফারতিতি, ক্যাব থেকে শরীরের একাংশ বের করে পাল্টা গুলি করল।

লাফিয়ে সামনে থেকে সরে গেল গার্ডরা। তাদের মাঝ দিয়ে জ্যা-মুক্ত তীরের মত এগিয়ে গেল স্কিপলোডার। ওয়্যারহাউসের প্রবেশপথ বন্ধ, কিন্তু কে তার পরোয়া করে, তুমুল বেগে অ্যালুমিনিয়ামের দরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওটা। ইস্পাত তোবড়ানোর গগনবিদারী আর্তনাদ ভেসে এল, মড়মড় করে গোটা ওয়্যারহাউসটাই যেন প্রবল আপত্তি জানাচ্ছে এই ভয়ঙ্কর অত্যাচারের বিরুদ্ধে। তবে সেটা ক্ষণিকের জন্য। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের ভিতর কবজা থেকে উপড়ে এল পাল্লা, ছিটকে গেল সামনে। ওগুলোকে মাড়িয়ে ওয়্যারহাউস থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল স্কিপলোডার। পিছন থেকে আবারও গুলি করল গার্ডরা।

'মাথা নামাও!' চেঁচাল রানা।

পরমুহূর্তে এক পশলা গুলি চুরমার করে দিল ওদের পিছনের জানালা। চারপাশে হীরার টুকরোর মত ছিটকে পড়ল কাঁচ। এক ঝটকায় স্কিপলোডারকে বামপাশে ঘুরিয়ে নিল রানা, সরে এল লাইন অভ ফায়ার থেকে। এবার পেরিমিটার ফেন্স লক্ষ্য করে ছুটছে। দু'পাশ থেকে চিৎকার শোনা গেল, আরও গার্ড ছুটে আসছে। পিস্তল তুলে গুলি করল নেফারতিতি, ঘায়েল করল দুজনকে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই ফেন্সের গায়ে খোঁচা মারল স্কিপলোডারের বাকেট। ওয়্যারহাউসের দরজার চাইতে তারের বেড়া ঠুনকো। মৃদু আওয়াজ তুলে দু'পাশের পোল-সহ উপড়ে এল। স্কিপলোডারের গতিতে ছন্দপতন ঘটল না একটুও। ওয়্যারহাউসের সীমানা পেরিয়ে রাস্তায় উঠে এল স্বচ্ছন্দে।

'এটায় চেপে পালানো যাবে না,' পাশ থেকে বলে উঠল নেফারতিতি। 'স্পিড কম। গাড়ি নিয়ে ধাওয়া করলেই আমাদেরকে ধরে ফেলতে পারবে ওরা।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, ব্যাপারটা সম্পর্কে সচেতন। মনে মনে স্মরণ করল পুরো ফ্যাসিলিটির নকশা, বুঝতে চাইছে সবচেয়ে

কাছের বাউণ্ডারি কোথায়। অবশ্য বাউণ্ডারিতে পৌঁছুলেও সমস্যা কাটছে না। স্কিপলোডার নিয়ে ইলেকট্রিফায়েড ফেন্স ভাঙতে গেলে কারেন্টের শক খেয়ে মরতে হবে। খালি হাতেও ফেন্স টপকানো যাবে না। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। ভাবনার জন্য সময়ও বেশি পেল না, তার আগেই পিছনে ইঞ্জিনের আওয়াজ হলো। ওদিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল নেফারতিতি। হেডলাইট জ্বেলে তীব্রবেগে ছুটে আসছে একটা হুডখোলা জিপ, ড্রাইভারের পাশে হিংস্র ভঙ্গিতে রাইফেল বাগিয়ে বসে আছে একজন গার্ড।

'আমাদের সঙ্গী জুটেছে,' চেঁচিয়ে উঠল ও।

ঘাড় ফিরিয়ে চকিতে ধাওয়াকারীদের দেখে নিল রানা, কিন্তু গতি বাড়াল না। গলা চড়িয়ে বলল, 'কাছে আসতে দাও, তারপর গুলি কোরো।'

এলোমেলো ভঙ্গিতে কয়েকটা গুলি করা হলো জিপ থেকে, তারপর ক্ষান্ত দিল গার্ড। কাছে এসে সে-ও নিশানা ঠিক করতে চাইছে। আশি মাইল বেগে ছুটে আসছে তার বাহন, অল্পক্ষণেই স্কিপলোডার আর জিপের মধ্যকার দূরত্ব কমে এল। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে নেফারতিতি। কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝল, লোডারের পিছনে থাকবে না জিপ, চলে আসবে পাশে।

'রানা, ওরা আমার সাইডে না এলে লাগাতে পারব না,' জানাল ও।

'দেখছি কী করা যায়।'

রাস্তার ডানে স্কিপলোডারকে চাপিয়ে দিল রানা, উন্মুক্ত করে দিল বাম পাশ। ওখান দিয়েই আগে বাড়ার চেষ্টা করল জিপ। ঝটকা দিয়ে দরজা খুলল নেফারতিতি, হাতে পিস্তল। প্রতিপক্ষ ফায়ার ওপেন করবার আগেই যন্ত্রের মত টিপতে থাকল ট্রিগার। ওর প্রথম বুলেট জিপের গ্রিল ও হুডের উপর দিয়ে পিছলে গেল। পরের কয়েকটা লাগল উইণ্ডশিল্ডে। তিনটে গুলি ফুটো

করল কাঁচ। ড্রাইভার ভয়ে একপাশে সরতে চাইল। দ্রুত কমে গেল গতি। বিশ্রী আওয়াজ তুলেছে চাকাগুলো। মনে হলো সড়ক থেকে ছিটকে পড়বে জিপ। তবে শেষ মুহূর্তে স্টিয়ারিং-হুইল ঘোরাল ড্রাইভার। গাড়ি যেদিকে পিছলে গেছে, তার উল্টোদিকে বনবন করে ঘুরছে হুইল। ছেঁচড়ে চলেছে জিপ, তারপর বামদিকের চাকা ফিরে এল পাকা অংশে।

আবার ধাওয়া শুরু করল জিপ। উইণ্ডশিল্ডের ওপাশ থেকে উঠে দাঁড়াল প্যাসেঞ্জার সিটের গার্ড, হাতে অ্যাসল্ট রাইফেল।

'ডাউন!' চিৎকার করল নেফারতিতি।

কর্কশ আওয়াজ করল গার্ডের রাইফেল। পিছনের ভাঙা জানালা দিয়ে শিস তুলে ড্রাইভিং ক্যাবে ঢুকল একের পর এক বুলেট। সামনের উইণ্ডশিল্ডে চিড় দেখতে পেল রানা। ভোঁতা আওয়াজ তুলে ওর সিটের পিছনে গাঁথল আরও দুটো বুলেট। উইণ্ডো ফ্রেমের উপর দিয়ে পিস্তল তুলল নেফারতিতি, পাল্টা গুলি করল। ব্রেক করে একটু পিছিয়ে গেল জিপ।

'লেগেছে!' উল্লসিত গলায় বলে উঠল নেফারতিতি। 'ব্যাটার কাঁধে লাগিয়েছি গুলি। রাইফেল আর চালাতে পারবে না।'

'গুড শট,' বলল রানা। 'ক্ষান্ত দিয়েছে ওরা?'

'উঁহুঁ,' পিস্তলে নতুন ম্যাগাজিন ভরতে ভরতে বলল নেফারতিতি, 'তবে কাছে আসছে না। দূর থেকে ফলো করছে।'

'খেয়াল রাখো ওদিকে।' সোজা হয়ে সামনে তাকাল রানা। পুরো কমপ্লেক্স জুড়ে দেখা দিয়েছে বিশৃঙ্খলা। ওয়ার্কাররা কাজ বন্ধ করে এদিক-সেদিক ছুটছে, ক্রসফায়ারে পড়ে গুলি খাবার শখ নেই কারও। কয়েক মিনিট পর সামনে আরও দু'জোড়া হেডলাইটের আলো দেখতে পেল ও—নতুন দুটো জিপ ছুটে আসছে ওদিক থেকে। ততক্ষণে কণ্টেইনার ইয়ার্ডের পাশে চলে এসেছে স্কিপলোডার, তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে বাহনকে ওখানে

ঢুকিয়ে ফেলল।

চারদিকে দুই ধাপ-তিন ধাপ করে সাজানো কণ্টেইনার, মাঝ দিয়ে চলে গেছে সংকীর্ণ রাস্তা। পুরোটাই যেন বিশাল কোনও গোলকধাঁধা। তার ভিতর দিয়ে স্কিপলোডারকে ছুটিয়ে নিয়ে চলল রানা, কোন্‌দিকে যাচ্ছে কিচ্ছু জানে না।

'এখানে ঢুকলে কেন?' জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

'আর কোনও কাভার ছিল না আশপাশে,' সংক্ষেপে বলল রানা। 'দেখি এখানে ওদেরকে খসানো যায় কি না।'

খায়েশটা মিটাতে পারল না ও। কয়েক মিনিট পরেই মাথার উপর থেকে ভেসে এল বিশ্রী কর্কশ আওয়াজ। এরপরেই সশব্দে ওদের সামনে আছড়ে পড়ল একটা বিশাল কণ্টেইনার। ওভারহেড কেইবল ক্রেইন থেকে ফেলে দেয়া হয়েছে ওটা। কপাল ভাল যে স্কিপলোডারের গায়ের উপর পড়েনি, স্রেফ ভর্তা হয়ে যেত তা হলে ওরা। তাই বলে প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্য একেবারে ব্যর্থ হলো না। নীচে পড়েই তুবড়ে গেল ভারী কণ্টেইনারটা, আটকে ফেলল সামনের রাস্তা। থামবার সময় নেই, ওটার সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ ঘটতে চলেছে লোডারের।

'জাম্প!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

পরমুহূর্তে লোডারের দু'পাশের দরজা খুলে দু'দিকে ঝাঁপ দিল ও আর নেফারতিতি। নিয়ন্ত্রণহীনভাবে তোবড়ানো কণ্টেইনারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল স্কিপলোডার, দেয়াল ভেদ করে ঢুকে গেল অনেকখানি। থেমে গেল।

কয়েক গড়ান খেয়ে স্থির হয়েছে রানা আর নেফারতিতি। হাত-পা ছড়ে গেছে দুজনেরই। উঠে দাঁড়াবার বুঝি আর শক্তি নেই। কিন্তু গায়ে হেডলাইটের আলো পড়তেই কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল, ধাওয়াকারী জিপদুটো এসে পড়েছে। পিস্তল বের করল রানা, অন্ধের মত গুলি ছুঁড়ল জিপগুলোর উদ্দেশে। তারপর

সঙ্গিনীর হাত ধরে ছুট লাগাল। কণ্টেইনারের সারির মাঝে ছোট্ট একটা ফাঁক দেখতে পেয়েছে... ঢুকে পড়ল ওখানে। ফাঁক গলে বেরিয়ে এল উল্টোপাশের রাস্তায়।

কিন্তু ওখানে পৌঁছেও শান্তি নেই। মোড়ের কাছ থেকে ভেসে এল চিৎকার-হাঁকডাক। একটু পর ওখানে উদয় হলো অস্ত্রধারী জনাচারেক গার্ড। বিপরীত দিকটায় ছুটতে গেল রানা আর নেফারতিতি, তবে কয়েক পা এগোতেই দেখল, ওখান দিয়ে এগিয়ে আসছে আরেক দল। ফাঁদে পড়ে গেছে ওরা।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। নাহ্, আর পারা গেল না। ধীরে ধীরে দু'হাত উপরে তুলল ও, আত্মসমর্পণ করাই ভাল। ওর দেখাদেখি নেফারতিতিও। আর তখুনি দূর থেকে ভেসে এল আরেকটা শব্দ—হেলিকপ্টারের রোটরের আওয়াজ।

হঠাৎ একজন গার্ডকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে দেখল রানা—তার মাথার একপাশ থেকে ছিটকে উঠেছে রক্ত! পরক্ষণে আরও দুজন ঘায়েল হলো। ওদের উপর থেকে মনোযোগ সরে গেল গার্ডদের, এবার ছোটাছুটি করে নিজেরাই কাভার খুঁজছে। হেলিকপ্টারের আওয়াজ আরও জোরালো হলো, একটু পর অতিকায় এক পাখির মত ওটা হাজির হলো ওদের মাথার উপরে। দু'পাশের দরজা খোলা সেখান থেকে ক্ষণে ক্ষণে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে গার্ডদেরকে লক্ষ্য করে। বিস্মিত হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকল রানা—কোবায়াশি কমপ্লেক্সের কপ্টার নয়, এটা ভিন্ন মডেলের। কারা এসেছে ওটায়... কেনই বা হামলা চালিয়েছে এখানকার গার্ডদের উপরে?

উপর থেকে টপটপ করে কী যেন পড়তে শুরু করল, তারপরেই ঘটল একের পর এক বিস্ফোরণ। ঘন ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল চারদিক। কয়েক সেকেণ্ড পরেই হেলিকপ্টার থেকে দড়ি ফেলা হলো, র‍্যাপেলিং করে নেমে এল কালো পোশাকধারী

দুজন সৈনিক। মাটিতে পা ঠেকিয়েই ছুটে এল রানা আর নেফারতিতির দিকে, জাপটে ধরল ওদেরকে। যন্ত্রচালিত ওয়াইণ্ডের হ্যাঁচকা টান অনুভব করল রানা, দড়ি-সহ ওদের সবাইকে আবার তুলে ফেলা হলো উপরে। ওরা ভিতরে ঢুকতেই নাক ঘোরাল হেলিকপ্টার, দ্রুত সরে এল কমপ্লেক্সের উপর থেকে।

বিস্ময়ের ধাক্কাটা কেটে যেতেই ঘটনাটা পরিষ্কার হলো রানার কাছে। এক্সট্র্যাকশন... নিখুঁত এক্সট্র্যাকশন অপারেশনের মাধ্যমে উদ্ধার করে আনা হয়েছে ওকে আর নেফারতিতিকে। একেবারে সামরিক কায়দায়। কিন্তু কেন? রহস্যময় তৃতীয় পক্ষের কথা ভাবল, এরাই কি তারা? কী চায়? চারপাশে বসে থাকা লোকগুলোর দিকে তাকাল, সবাই মুখোশ পরে আছে, চোখ-নাক ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। পরিচয় আন্দাজ করা মুশকিল।

সামনে তাকাল রানা। পাইলট মুখোশ পরেনি, তার পাশে বসে থাকা দ্বিতীয় লোকটাও মুখোশহীন। পিছন থেকে অবয়বটা পরিচিত ঠেকল, লোকটা ঘাড় ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে দূর হয়ে গেল সমস্ত সন্দেহ। কয়েকদিন আগেই প্যারিসে এর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ওর।

'হ্যালো, মসিয়ো রানা!' খাঁটি ফরাসি উচ্চারণে বলে উঠল সে। গালভরা হাসি। 'নাইস টু মিট ইউ এগেন!'

লোকটা ফিলিপ অঁবিন—দুহুয়ো অকশন হাউসের চিফ অভ সিকিউরিটি।

এগারো

কয়েক ঘণ্টা পর।

কেনজি নাকামুরার কালো মার্সিডিজ যখন কোবায়াশি কমপ্লেক্সে পৌঁছুল, তখন মুষলধারে নেমেছে বৃষ্টি। গাড়ির ছাদে টপাটপ শব্দ তুলছে বৃষ্টির ফোঁটা। ভিতরে গম্ভীর মুখে বসে আছে জাপানি টাইকুন, ক্লান্ত চেহারা, দু'চোখ লাল। ঘুম পুরো হয়নি, খবর পেয়ে ভোররাতেই ছুটে এসেছে সে। বসের পাশে বসে আছে ইরি ইয়োশিদা, তাকে অবশ্য ততটা ক্লান্ত দেখাচ্ছে না। বরং পোশাক-আশাক আর সাজসজ্জা দেখে মনে হতে পারে কোনও পার্টিতে যোগ দিতে চলেছে।

কমপ্লেক্সে পৌঁছেই সরাসরি দশ নম্বর ওয়্যারহাউসে চলে গেল মার্সিডিজ, ভাঙা গেট পেরিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে। ড্রাইভার ব্রেক চাপতেই দ্রুত নেমে পড়ল ইরি, উল্টোদিকে গিয়ে যন্ত্রচালিতের মত খুলে ধরল দরজা। ধীরেসুস্থে গাড়ি থেকে নামল নাকামুরা, সোজা হয়ে সুটের ভাঁজ ঠিক করল, তারপর তাকাল সামনে। তাকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এসেছে দুই সুপারভাইজর আর গার্ড কমাণ্ডার, সঙ্গে জনাছয়েক গার্ড, তাদেরকে অগ্রাহ্য করে নজর বোলাল চারপাশে। গোলাগুলির চিহ্ন ফুটে রয়েছে সর্বত্র। ভাঙা গেটের দিকে তাকিয়ে চোয়াল শক্ত হলো তার ক্ষণিকের জন্য।

মাথা ঝুঁকিয়ে নাকামুরাকে অভিবাদন জানাল দুই সুপারভাইজর, গার্ড কমাণ্ডার ঠুকল সামরিক কায়দায় স্যালিউট। ক্যাপ্টেন হারুকি মুরাকামি জাপানিজ ইম্পেরিয়াল আর্মির প্রাক্তন কমাণ্ডো, মিথ্যে অভিযোগে চাকরিচ্যুত হবার পর মার্সেনারির খাতায় নাম লিখিয়েছে। সরাসরি তার চোখের দিকে তাকাল নাকামুরা। খসখসে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কিছু জানা গেছে?'

মাথা নাড়ল হারুকি। 'আপনাকে টেলিফোনে যতটুকু জানিয়েছি, তার বেশি আর কিছু নয়। দুজন ট্রেসপাসার... একজন পুরুষ, অন্যজন মহিলা... সবার অলক্ষে ঢুকে পড়েছিল এখানে। আমরা টের পেতেই গোলাগুলি করে পালিয়ে গেছে।'

'হেলিকপ্টারে চেপে, তা-ই না? মিলিটারি কায়দায়। সাধারণ কোনও চোর হতে পারে না। তা হলে কে? কিছু আন্দাজ করতে পারো?'

'এখনও নয়। হেলিকপ্টারের গায়ে কোনও মার্কিং ছিল না। আজ রাতে এই এলাকায় কেউ ফ্লাইট প্ল্যানও রেজিস্টার করেনি—আমি খোঁজ নিয়েছি। ব্যাপারটা ছোটখাট একটা রহস্যই বলা চলে।'

'ছোট নয়, অনেক বড় রহস্য,' চোয়াল শক্ত হলো নাকামুরার। 'কমপ্লেক্সে এত ওয়্যারহাউস থাকতে ওরা এখানেই বা হানা দিল কেন?'

'সেটা কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে,' বলল হারুকি। 'কী করছি আমরা এখানে, তা না জানলেও ফ্যাসিলিটির লোকাল ওয়ার্কাররা বাড়তি সিকিউরিটি দেখে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু সন্দেহ করছে। ওদেরই কেউ সন্দেহটা বাইরের কারও কাছে প্রকাশ করতে পারে।'

'তেমন কোনও প্রমাণ পেয়েছ?'

'না, তবে আমরা সবে ইনভেস্টিগেশন শুরু করেছি। ঘটনার

পর পরই পুরো কমপ্লেক্স বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ভিতরের সবাইকে একে একে জিজ্ঞাসাবাদ করছে আমার লোকেরা।'

'হুম। ওই ট্রেসপাসাররা আমাদের অপারেশনের কতখানি দেখতে পেয়েছে?'

মিথ্যে বলার সহজাত তাড়না অতিকষ্টে দমন করল হারুকি। নাকামুরার সঙ্গে মিথ্যে বলে পার পায় না কেউ। ইতস্তত করে সে বলল, 'ওরা সম্ভবত সোনাগুলো দেখে ফেলেছে।'

'বারের গায়ে খোদাই করা সিলগুলোও?' জানতে চাইল নাকামুরা।

'আমার তা মনে হয় না। দোতলার স্টোরেজ এরিয়া থেকে উঁকি দিচ্ছিল... অত দূর থেকে সিল দেখা যাবার কথা নয়।'

'সোনাই বা দেখল কীভাবে?' তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করল নাকামুরা। 'বারগুলো র‍্যাপিং করা ছিল না?'

'তা ছিল,' বলল হারুকি। 'কিন্তু মি. শিনযুকি একটার র‍্যাপিং খুলে নেড়ে-চেড়ে দেখেছেন।' দুই সুপারভাইজরের মধ্যে অপেক্ষাকৃত তরুণের দিকে ইশারা করল সে। 'ওরা তখন উপরেই ছিল।'

থমথমে হয়ে উঠল নাকামুরার চেহারা। শিনযুকির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'ব্যাপারটা কি সত্যি? তুমি একটা বারের র‍্যাপিং খুলেছ?'

ফ্যাকাসে হয়ে উঠল শিনযুকির মুখটা। মাথা নামিয়ে ফেলল সে ভয়ার্ত ভঙ্গিতে।

'কেন?' একই ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল নাকামুরা। 'লোভ সামলাতে পারছিলে না বুঝি?'

'আ... আমি দুঃখিত, স্যর...' বিড়বিড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করল শিনযুকি।

ঘাড় ফিরিয়ে ইশারা করল জাপানি টাইকুন। সঙ্গে সঙ্গে

বিদ্যুৎবেগে পোশাকের তলা থেকে একটা ছোট্ট পিস্তল বের করল ইরি। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই গুলি করল তরুণ সুপারভাইজরের বুকে।

আর্তনাদ করে উঠল শিনযুকি। বুক চেপে ধরল দু'হাতে, বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। কয়েক মুহূর্ত পর চিত হয়ে লুটিয়ে পড়ল কংক্রিটের উপর। কয়েক পা এগিয়ে আবার গুলি করল ইরি। কপালে তৃতীয় নয়ন সৃষ্টি হলো হতভাগ্য সুপারভাইজরের। কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল চিরতরে।

পিনপতন নীরবতা নেমে এসেছে ওয়্যারহাউসের ভিতরে। কয়েক মিনিট মূর্তি হয়ে রইল সবাই। শেষে গম গম করে উঠল নাকামুরার কণ্ঠ।

'আজকের এই ঘটনা একটা শিক্ষা হয়ে থাক সবার জন্য। এই প্রজেক্টের গুরুত্ব কতখানি, তা আগেও আমি বহুবার বলেছি। এখানে কোনও ধরনের ভুল-ত্রুটি... কোনও ধরনের গাফিলতি আমি সহ্য করব না। কেউ যদি ধরা পড়ে, তার কপালে কঠিন শাস্তি জুটবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?'

একযোগে মাথা ঝাঁকাল সবাই।

হারুকির দিকে ফিরল নাকামুরা। 'যারা এখানে চুরি করে ঢুকেছিল... আর যাদের সাহায্য নিয়ে ঢুকেছিল... তাদের সবাইকে খুঁজে বের করো। আমি চাই ওদের কপালে যেন শিনযুকির চেয়েও ভয়ঙ্কর শাস্তি জোটে।'

'ইয়েস, স্যর!' রুক্ষ গলায় সায় জানাল ক্যাপ্টেন।

'তাকাশি!' দ্বিতীয় সুপারভাইজরকে ডাকল নাকামুরা। 'ধরে নিচ্ছি এখানকার অপারেশন আর গোপন নেই। ঝুঁকি নিতে চাই না। সমস্ত সোনা ওয়্যারহাউস থেকে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করো... এবং সেটা আগামীকালের ভিতরে।'

'কাজটা কঠিন হয়ে পড়বে, স্যর,' নার্ভাস ভঙ্গিতে বলল

তাকাশি। 'ডেলিভারির নির্দিষ্ট শিডিউল আছে আমাদের। হঠাৎ করে এত সোনা...'

'জানি,' তাকে থামিয়ে দিল নাকামুরা। 'আগামীকালের শিপমেন্টে যতটা সম্ভব পাঠিয়ে দাও। বাকি সোনা কমপ্লেক্সের ভিতরেই অন্য কোথাও লুকিয়ে ফেলো। আর যা-ই হোক, কেউ তল্লাশি চালাতে এলে এই ওয়্যারহাউসে যেন কিছু না পায়।'

'আপনার যা মর্জি।'

আর কিছু না বলে মার্সিডিজের দিকে এগিয়ে গেল নাকামুরা। তাকে অনুসরণ করল ইরি। একটু পরেই দুই আরোহীকে নিয়ে ফিরতি পথে যাত্রা শুরু করল গাড়িটা, বেরিয়ে এল কোবায়াশি কমপ্লেক্স থেকে।

মার্সিডিজের মিনি-বার থেকে একটা ড্রিঙ্ক তৈরি করে নাকামুরার হাতে তুলে দিল ইরি। নিচু গলায় বলল, 'শাস্তিটা কি একটু বেশি হয়ে গেল না?'

'কী?' চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল নাকামুরার, ভুরু কুঁচকে তাকাল সঙ্গিনীর দিকে।

'শিনযুকি-র কথা বলছি। কাজের লোক ছিল... ভাল একজন সুপারভাইজর হারালাম আমরা।'

'টাকা ছড়ালে সুপারভাইজরের অভাব হয় না।' ড্রিঙ্কে চুমুক দিল নাকামুরা। 'হারুকিকে সতর্ক করে দেবার জন্য এর প্রয়োজন ছিল। ওর সিকিউরিটিতে খুঁত থাকার কারণেই আজকের এ-ঘটনা ঘটেছে।'

'সেক্ষেত্রে শাস্তিটা কি ওরই প্রাপ্য ছিল না?'

চুপ করে রইল নাকামুরা, কিন্তু জবাবটা আন্দাজ করতে অসুবিধে হলো না ইরির। টাকা ছড়ালে সুপারভাইজরের অভাব হয় না, কিন্তু হারুকির মত দক্ষ ও অনুগত সৈনিক পাওয়া কঠিন। তাই বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বন করেছে নাকামুরা—অনেকটা ঝিকে

মেরে বউকে শেখানোর মত আর কী।

ড্রিঙ্ক শেষ করে খালি গ্লাসটা ইরির হাতে তুলে দিল জাপানি টাইকুন। বলল, 'সেই বাঙালি ইনভেস্টিগেটরের খবর কী? কী যেন নাম... মাসুদ রানা, রাইট?'

মাথা ঝাঁকাল ইরি। 'রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির ডিরেক্টর। অসুস্থ হয়ে কয়েকদিন হাসপাতালে পড়ে ছিল। এখন সিজার পার্ক হোটেলে উঠেছে। ওখান থেকে খুব একটা বেরোয় না, বোধহয় বিশ্রামে থাকছে। এখন পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছু ঘটায়নি... কিংবা ঘটালেও আমাদের জানা নেই। লোকটা অত্যন্ত চালু, তা ছাড়া আপনিই বলেছিলেন ওর কাছে না ঘেঁষতে। দূর থেকে নজর রাখছি আমরা।'

'হুম। আর লিপিনে জার্নাল? ওটা কি ওর সঙ্গে আছে?'

'আমাদের সোর্স বলছে ওটা ও প্যারিসে রেখে এসেছে। সত্যি-মিথ্যে যাচাই করতে চাইলে ইন্টারোগেশনের প্রয়োজন হবে। আপনি চাইলে ওকে তুলে আনতে পারি।'

'দরকার নেই,' মানা করল নাকামুরা। 'লোকটা বিপজ্জনক, অযথা তাকে ঘাঁটানো উচিত হবে না। তা ছাড়া জার্নালটাও খুব জরুরি নয়। গুপ্তধন খুঁজে পেলে সেটাকে অথেণ্টিকেট করবার মত আরও অনেক পুরনো ডকুমেন্ট আছে আমাদের হাতে। প্যারিসে হামলা চালাতে গিয়ে খামোকাই তিনজন লোক হারিয়েছি আমরা। মাঝখান থেকে রানা কৌতূহলী হয়ে উঠেছে, চলে এসেছে পানামায়। নাহ্, ওর কৌতূহল আর বাড়তে দেয়া যাবে না। যেমন আছে থাকুক, হাওয়া-বাতাস খাক। কিছু খুঁজে না পেলে ক'দিন পর এমনিতেই হাল ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে।'

'আর ও যদি তলে তলে কিছু ঘটায়? আজকের ঘটনার পিছনে ও-ই আছে কি না কে জানে!'

'তেমন কিছু ঘটে থাকলে সেটা হারুকি খুঁজে বের করবে।

ওর মুখ বন্ধ করবার ব্যবস্থা নেবে। তোমাকে এ-নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।'

কাঁধ ঝাঁকাল ইরি, চেহারায় মৃদু অসন্তোষ। সেদিকে না তাকিয়ে আবার ভাবনার জগতে ডুবে গেল নাকামুরা।

বারো

সেফ হাউসটা পানামা সিটির উত্তরে, নির্জন এলাকায়। একতলা বাড়ি, পুরনো, বিশেষত্বহীন। ইঁটের দেয়াল, টিনের ছাত; সামনে ছোট্ট বারান্দা। সবখানে অযত্ন আর অবহেলার ছাপ।

গাছপালায় ঘেরা অন্ধকার এক মাঠে হেলিকপ্টার থেকে নামানো হয়েছে রানা আর নেফারতিতিকে, তারপর একটা ভ্যানে উঠিয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা ড্রাইভ শেষে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। কোত্থেকে কোথায় আনা হলো ওদের, দুজনে কিছুই বুঝতে পারেনি। হেলিকপ্টারে অভিবাদন জানাবার পর আর কিছু বলেনি অঁবিন, এড়িয়ে গেছে রানার সব প্রশ্ন। সংক্ষেপে শুধু বলেছে, সময়মত সব ব্যাখ্যা করা হবে, ও যেন ধৈর্য ধরে।

ফরাসি লোকটা মুখে তালা আঁটলেও কিছু কিছু ব্যাপার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না রানার। ওদেরকে উদ্ধার করে আনা সৈনিকরা বহুজাতীয়—জার্মান, রাশান, এমনকী আফ্রিকানও রয়েছে। মার্সেনারি নয়, চালচলন ও যুদ্ধকৌশলে একই ধরনের সুশৃঙ্খল প্রশিক্ষণের ছাপ। দুনিয়ায় একটামাত্র বাহিনীতে বহুজাতিক সৈন্য

থাকে—ফ্রেঞ্চ লিজন। অঁবিন এদের নেতৃত্ব দিচ্ছে, তবে তাকে ঠিক সৈনিক মনে হয় না। তারমানে সে নিঃসন্দেহে ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্সের লোক... সম্ভবত *ডি.জি.এস.ই.* এজেন্ট।

পরিচয় আঁচ করতে পারার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় রক্ত চড়তে শুরু করেছে রানার। বুঝে ফেলেছে, এরাই সেই রহস্যময় তৃতীয় পক্ষ। আড়াল থেকে কলকাঠি নেড়ে চলেছে। দুভাঁর মাধ্যমে শত্রুদের সামনে টোপ বানিয়েছে ওকে, সুতোয় বাঁধা পুতুলের মত নাচাবার চেষ্টা করে চলেছে। রাগটা সংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়ল, সেফ হাউসে পা রেখেই অঁবিনের মুখে ধাঁই করে একটা ঘুসি মেরে বসল ও।

ককিয়ে উঠে কয়েক পা পিছিয়ে গেল ফরাসি এজেন্ট, তাল হারিয়ে এরপর ধপ্ করে বসে পড়ল মাটিতে। দু'হাতে চেপে ধরল মুখ। রানাকে বাধা দেবার জন্য লিজনের দু'জন সৈনিক এগিয়ে আসছিল, ঝট্ করে ওদের দিকে ঘুরে গেল রানা। রাগী গলায় বলল, 'মার খাবার শখ না হলে যেখানে আছ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো।'

ইতস্তত ভঙ্গিতে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল সৈনিকরা। কয়েক মুহূর্ত পর অঁবিন বলল, 'ইটস্ ওকে। লিভ হিম অ্যালোন।' আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল সে। রানার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'নাইস পাঞ্চ, মসিয়ো রানা!'

'ভাল লেগেছে? তা হলে আরেকটা দিই?' মুঠি পাকাল রানা।

'একটাই যথেষ্ট,' এক হাতে থুতনি মালিশ করল অঁবিন। 'কিন্তু দু'-দু'বার আপনার প্রাণ বাঁচাবার পর এই ঘুসি আমার প্রাপ্য ছিল না।'

'দু'বার?'

'অবশ্যই। প্যারিসের কথা ভুলে গেছেন? আমি যদি ডাইভারশন সৃষ্টি না করতাম, তা হলে লিপিনে জার্নাল নিয়ে

আপনি পালাতে পারতেন না। আজ রাতেও আরেকটু হলেই মারা পড়তেন আপনি।'

'আই ক্যান টেক কেয়ার অভ মাইসেলফ,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'আপনার সাহায্য আমি চাইনি। তা ছাড়া আমাকে বিপদে ফেলার পিছনে আপনার ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি, সেটা অস্বীকার করতে পারেন?'

জবাব দিল না অঁবিন।

'কীসের কথা বলছ তোমরা?' পাশ থেকে জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি, কিছুই বুঝতে পারছে না ও। 'কারা এরা?'

'ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স,' সংক্ষেপে বলল রানা।

ফ্যালফ্যাল করে ওর দিকে তাকিয়ে রইল নেফারতিতি, আরও কিছু শুনতে চাইছে।

অঁবিন বলল, 'সবই খুলে বলব। আসুন, আরাম করে বসুন। একটু বিশ্রাম নিন।' ঘরের এক কোণে সাজিয়ে রাখা সোফার দিকে ইশারা করল সে। তারপর সঙ্গীদের নির্দেশ দিল, 'তোমরা যেতে পারো। এঁদের সঙ্গে আমি থাকছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেল সৈনিকরা।

নেফারতিতিকে নিয়ে সোফায় বসল রানা। চোখ বোলাল ঘরের অভ্যন্তরে। সামনের কামরায় বসেছে ওরা। সোফা ছাড়াও রয়েছে সেন্টার টেবিল আর একটা শো-কেস। মেঝেতে সস্তা কার্পেট বিছানো। টেবিলের উপর রাখা অ্যাশট্রে ভরে গেছে সিগারেটের বাটে। অনুমান করল, এ-বাড়িতে অস্থায়ী আবাস গড়েছে লিজনের সৈনিকরা।

কিচেন থেকে বিয়ারের ক্যান নিয়ে এসেছে অঁবিন, দুই অতিথির সামনে নামিয়ে রাখল ওগুলো। তারপর মুখোমুখি সোফায় বসে বলল, 'আপ্যায়ন করবার মত আর কিছু নেই বলে দুঃখিত।'

বিয়ার নিল না রানা। থমথমে গলায় বলল, 'বেড়াতে আসিনি আমরা। যা শুনতে চাইছি, তা বলুন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অঁবিন। সোফায় হেলান দিয়ে বলল, 'বেশ... আপনার অভিযোগ মিথ্যে নয়। প্যারিসে অগাস্ত দুভাঁর সাহায্য নিয়ে সত্যিই টোপ বানানো হয়েছিল আপনাকে। আপনার বন্ধুর কোনও দোষ নেই, ওর কিছু করবার ছিল না। আমরাই বাধ্য করেছিলাম ওকে।'

'কেন?'

'পানামা ক্যানাল সংক্রান্ত ডকুমেণ্টগুলো কে কিনে নিচ্ছে, সেটা বের করতে চাইছিলাম আমরা। চাইছিলাম লিপিনে জার্নালটা হাতানোর জন্য তাকে যেন গর্ত থেকে মাথা বের করতে হয়।'

'কিন্তু কেন?' জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি। 'এতে আপনাদের কী স্বার্থ?'

'সোজা কথায় বলতে গেলে, ক্যাপ্টেন...' একটা সিগারেট ধরাল অঁবিন, 'আমরা এতে নাক গলাতে বাধ্য হয়েছি। কারণ আপনারা, মানে আমেরিকানরা, পানামার ব্যাপারে চোখ-কান বুজে রেখেছেন। এখানে কী ঘটছে না ঘটছে, তা নিয়ে কোনোই মাথাব্যথা নেই আপনাদের। আপনি কি জানেন, বিদেশিরা ধীরে ধীরে পুরো পানামাকে কিনে নিচ্ছে? এমনটা চলতে থাকলে খুব শীঘ্রি ক্যানালের নিয়ন্ত্রণ হারাবে পানামা সরকার।'

'এটা আমার প্রশ্নের জবাব হলো না,' অসন্তোষ প্রকাশ পেল নেফারতিতির কণ্ঠে। 'আমি জানতে চাইছি এখানে ফ্রান্সের কী স্বার্থ?'

'ভাল প্রশ্ন করেছ,' সায় দিল রানা। 'সেণ্ট্রাল আমেরিকার বিষয়ে আপনার দেশকে আমিও কখনও মাথা ঘামাতে দেখিনি। খুব কম সংখ্যক ফরাসি জাহাজ এখানকার ক্যানাল ব্যবহার করে।

কাজেই এটার নিয়ন্ত্রণ কার হাতে গেল না গেল, তাতে ফ্রান্সের অর্থনীতি মোটেই প্রভাবিত হবে না।'

'ঠিক,' স্বীকার করল অঁবিন। 'কিন্তু আমেরিকার আমদানি-রফতানির ষাট থেকে আশি শতাংশ মালামাল এই ক্যানাল দিয়ে আসা-যাওয়া করে। তারপরেও এখান থেকে নিজেদের সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করে নিয়েছে ওরা, পিছনে ফেলে গেছে প্রায় তিন বিলিয়ন ডলারের অ্যাসেট। তার মাঝে রয়েছে অ্যাঙ্কন হিলের ডগায় একটা সফিসটিকেটেড অ্যান্টেনা অ্যারে আর লিসেনিং স্টেশন।'

হঠাৎ করেই রহস্যটা আঁচ করতে পারল রানা। একটামাত্র শব্দ উচ্চারণ করল ও, 'এরিয়ান!'

প্রশংসার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল অঁবিন। 'ভেরি স্মার্ট, মসিয়ো রানা!'

'কী ওটা?' জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

'ইয়োরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির এরিয়ান রকেট প্রজেক্ট,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'ফ্রেঞ্চ গায়ানার কৌরু থেকে লঞ্চ করা হয় রকেটগুলো, জায়গাটা পানামার খুব কাছে। এখানকার অ্যান্টেনা অ্যারে আর লিসেনিং স্টেশনের সাহায্যে সহজেই নজরদারি করা সম্ভব ওগুলোর উপর। সব ধরনের কমিউনিকেশন ইণ্টারসেপ্ট করা সম্ভব।'

'কেন ইণ্টারসেপ্ট করবে?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

'কারণ রকেটগুলো স্রেফ সায়েণ্টিফিক মিশনে নয়, অরবিটাল ইণ্টেলিজেন্স গ্যাদারিঙেও ব্যবহার হয়। রাইট, মি. অঁবিন?'

'এ-বিষয়ে আমার কিছুই বলার নেই,' কাঁধ ঝাঁকাল অঁবিন।

'তার প্রয়োজনও নেই,' বলল রানা। 'আমি শুধু জানতে চাই, এর সঙ্গে আমাকে জড়ালেন কেন?'

'সেটা বলার আগে কয়েকটা ব্যাপার ব্যাখ্যা করা দরকার। ১৯৯৯ সালে ক্যানাল পরিচালনার ভার পানামা সরকারের হাতে ছেড়ে দিয়েছে আমেরিকানরা। তারপর থেকে বিদেশিরা নানা কৌশলে একটু একটু করে ক্যানালের চারপাশ দখল করে নিচ্ছে। এ-ব্যাপারে সবচেয়ে এগিয়ে আছে জাপানের কোবায়াশি কোম্পানি। পানামার ট্রান্সপোর্টেশন ও টেলিকমিউনিকেশন সেক্টরের সিংহভাগ কিনে নিয়েছে ওরা। আমেরিকান কোম্পানিকে হটিয়ে গায়ের জোরে লিজ নিয়েছে ট্রান্স-ইসমাস রেলরোডের। দেশের এক উপকূল থেকে আরেক উপকূল পর্যন্ত তৈরি করছে অয়েল পাইপলাইন—ওটা প্রায় শেষের পথে। এমনকী বালবোয়া কন্টেইনার পোর্টের এক-তৃতীয়াংশ নিয়ন্ত্রণও এখন ওদের হাতে।'

'কোবায়াশি জাপানি কোম্পানি—নাকামুরা গ্লোবাল ট্রান্সপোর্টেশনের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান,' বলল রানা। 'আপনারা একে জাপানি আগ্রাসন ভাবছেন?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল অঁবিন। 'জাপানকে আমরা কখনোই থ্রেট মনে করি না। তবে আমাদের বিশ্বাস, নাকামুরাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে চাইছে কোনও শত্রু রাষ্ট্র। পানামার বর্তমান সরকার রহস্যময় কোনও কারণে এ-ব্যাপারে উদাসীন। আমেরিকাও আমাদের সমস্যা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না। অগত্যা আমাদের নিজেদেরকেই...'

'বুঝতে পেরেছি,' হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'কিন্তু এর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা এখনও পরিষ্কার হলো না।'

'লিপিনে জার্নাল,' বলল অঁবিন, 'ওটার কারণে আপনি এতে জড়িয়েছেন। ইউ সি... নাকামুরা গ্লোবাল ট্রান্সপোর্টেশনের ব্যাপারে তদন্ত করতে গিয়ে আমরা জানতে পারি, ওটার মালিক কেনজি নাকামুরা পানামা সংক্রান্ত যত পুরনো ডকুমেন্ট পাচ্ছে, সব কিনে নিতে শুরু করেছে। তাকে একটা খোঁচা দেবার জন্য

লিপিনে জার্নালটা সরাবার প্ল্যান করি আমরা, আপনাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করি। মসিয়ো দুভাঁকে বাধ্য করা হয় আমাদেরকে সাহায্য করতে। আসলে আমরা নাকামুরার রিঅ্যাকশন দেখতে চাইছিলাম।'

'আমি মারা পড়তে পারতাম!'

'একটু যে ঝুঁকি ছিল, তা অস্বীকার করব না। আসলে আপনি ক্যাটাকুমে ঢোকাতেই যত সমস্যা হয়েছে। বাইরে আমি ছিলাম... আমার আরও লোক ছিল... আমরাই সাহায্য করতে পারতাম আপনাকে। আপনি ক্যাটাকুমে ঢুকে পড়ায় একা হয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য... একা হলেও নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন আপনি, এমনটা ধরে নিয়েই প্ল্যান সাজানো হয়েছিল। বলতে পারেন ক্যালকুলেটেড রিস্ক। ভুল যে করিনি, তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'কিন্তু কেন? জার্নালগুলোর গুরুত্ব কী?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল আঁবিন। 'ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ঘোলাটে। পুরনো ডায়েরি আর কাগজপত্রের ব্যাপারে নাকামুরা হঠাৎ পাগল হয়ে উঠল কেন, তার কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না আমরা। তার চরিত্রের সঙ্গে এই ফ্যাসিনেশন একেবারেই মেলে না। কী কাজে ওগুলো লাগবে, বা এখন পর্যন্ত যেগুলো কিনেছে, সেগুলো নিয়েই বা কী করেছে তা আমাদের জানা নেই।'

'কিছুই জানা যায়নি?'

'না। এখন পর্যন্ত নাকামুরার সংগঠনে ইনফিলট্রেট করতে পারিনি আমরা। আমাদের প্রতিটা প্রচেষ্টা বিফল হয়েছে। দু'সপ্তাহ আগে কোবায়াশির টার্মিনালে দুজন লোক ঢোকানো হয়েছিল, তিনদিন পর একজনের লাশ ভেসে উঠেছে লেক গাটুনে, অন্যজন সম্ভবত ভেসে গেছে প্যাসিফিকে। আজ আপনাদের কপালেও একই দশা হতো, যদি না সময়মত আমরা হাজির হতাম।'

খুশি হতে পারল না রানা। সময়মত হাজির হতে পারার কারণ পরিষ্কার—ওকে আর নেফারতিতিকে চোখে চোখে রাখছিল এরা। অথচ ও সেটা টের পায়নি।

'এনিওয়ে,' প্রসঙ্গ পাল্টাল অঁবিন, 'টার্মিনালের ভিতরে কী দেখেছেন আপনারা, জানতে পারি?'

'এখুনি নয়,' বলল রানা। 'আরও প্রশ্ন আছে আমার। আমাকেই কেন টোপ বানানো হলো, তা এখনও পরিষ্কার নয়। কাজটা আপনাদের নিজস্ব কাউকে দিয়েও করানো যেত।'

'বিশ্বাসযোগ্য কাভার তৈরি করবার মত সময় ছিল না আমাদের হাতে। তা ছাড়া মসিয়ো দুভাঁর মুখে শুনেছি, জার্নালটা আপনি এক বন্ধুর জন্য কিনছেন—ভদ্রলোক পানামায় নাকামুরার স্বার্থবিরোধী একটা আর্কিয়োলজিকাল প্রজেক্ট চালাচ্ছেন। সব মিলিয়ে...'

'আমাদেরকেই আগুনের মুখে ঠেলে দেয়া সহজ মনে হয়েছে আপনাদের কাছে, তাই না?' তিক্ত গলায় বলল রানা। 'আমার বন্ধু যে মারা গেছে, সেটা জানেন?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল অঁবিন। 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মসিয়ো রানা। জার্নালটা হাতে পাবার আগে ড. হায়দারের জীবন বিপন্ন হতে পারে, এটা আমরা ভাবিইনি।'

'ইটস্ ওকে,' বলল রানা। 'ওটা দুর্ঘটনা ছিল, হায়দারকে কেউ খুন করেনি।'

একটু অবাক হলো অঁবিন। 'সে কী! তবে যে শুনলাম...'

'ডেডবডির উপর গুলি চালিয়েছে নাকামুরার লোকেরা। ঘটনাটাকে কলাম্বিয়ান গেরিলা অ্যাটাকের মত দেখাতে চেয়েছে।'

'কিন্তু কেন?'

জবাব দেবার আগে এক মুহূর্ত দ্বিধা করল রানা। ফরাসি এজেন্টকে পছন্দ হয়নি ওর, কিন্তু রহস্যের কিনারা করতে চাইলে

পরস্পরকে সাহায্য করতে হবে ওদের। বোঝা যাচ্ছে, অনেক কিছু অঁবিনেরও অজানা। দারিয়েন প্রভিন্সে নাকামুরার অপারেশন, সেইসঙ্গে ফ্যাসিলিটিতে দেখা সোনা সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। কিন্তু সেগুলো বলবার আগে একটা বোঝাপড়ায় আসা দরকার। নেফারতিতির সঙ্গে চোখাচোখি হলো ওর, মেয়েটাও একই কথা ভাবছে।

ওর উদ্দেশে মৃদু মাথা ঝোঁকাল রানা। তারপর বলল, 'সবকিছু আপনাকে খুলে বলতে পারি, মি. অঁবিন, কিন্তু তার আগে একটা চুক্তি হওয়া উচিত আমাদের মাঝে।'

'কী ধরনের চুক্তি?'

'পারস্পরিক সহযোগিতার। ইনফরমেশন শেয়ার করব আমরা, কোনও কিছু গোপন করব না। প্রয়োজনে একে অন্যকে সাহায্য করব। রাজি আছেন?'

শ্রাগ করল অঁবিন। 'আমি তাতে কোনও অসুবিধে দেখছি না। একই প্রতিপক্ষ আমাদের, একসঙ্গে কাজ করলেই তো ভাল।'

'আগেই বলে রাখছি, কোনও ধরনের লুকোচুরি অথবা ছলচাতুরি চলবে না।'

'না, না, তার আর কোনও প্রয়োজন নেই। সে-পর্যায় পেরিয়ে এসেছি আমরা। প্লিজ, সব খুলে বলুন।'

বড় করে শ্বাস ফেলল রানা, ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল পানামায় পৌঁছুনোর পর থেকে ঘটে যাওয়া সব ঘটনা। ভলকানিক লেকের অভিজ্ঞতা বলতে শুরু করলে ওকে হাত তুলে থামাল অঁবিন। বলল, 'জাস্ট আ মিনিট, এসব আমার সহকারীরও শোনা প্রয়োজন। মিশনের মিলিটারি দিকটা ও-ই দেখছে।'

গলা চড়িয়ে ডাক দিতেই কালো ইউনিফর্ম পরা এক অফিসার হাজির হলো। ছ'ফুট লম্বা, ক্ষৌরি করা রুক্ষ চেহারা। অঁবিন পরিচয় করিয়ে দিল, 'মসিয়ো রানা, ক্যাপ্টেন শেফার্ড, এ হলো

মেজর সেড্রিক পিনোঁ—লিজনেয়ারদের টিম লিডার, আমার সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড।'

রানা আর নেফারতিতির সঙ্গে হাত মেলাল পিনোঁ, তারপর অঁবিনের পাশে বসল। অঁবিন বলল, 'দারিয়েন প্রভিন্সে মিলিটারি অপারেশন চালিয়েছে নাকামুরার লোকেরা। ব্যাপারটা তোমার শোনা দরকার।'

মাথা ঝাঁকাল পিনোঁ। 'প্লিজ, গো অ্যাহেড, মসিয়ো রানা।'

আবার বলতে শুরু করল রানা। মাঝে মাঝে ওকে কথা জোগাল নেফারতিতি। ভলকানিক লেকের হামলা, তারপর কোবায়াশির ওয়্যারহাউসে সোনার চালান... একে একে সবই খুলে বলল দুজনে। এড়িয়ে গেল শুধু মার্কোস পেরেইরা আর তার চাচাত ভাই ভিক্টরের নাম। চাইছে না ওদের পরিচয় প্রকাশ পেয়ে যাক।

'হুম,' সবকিছু শোনার পর বলল অঁবিন। 'আপনাদের ওই ফ্রেণ্ড... কোবায়াশির ফর্কলিফট অপারেটর... তাকে আরেকবার কাজে লাগানো যাবে? ওয়্যারহাউসটায় এবার আমরা হানা দিতে চাই।'

'সম্ভব নয়,' রাজি হলো না রানা। 'ওর বিপদ বাড়াতে চাই না আমি। এরই মধ্যে ওকে সন্দেহ করা হচ্ছে কি না কে জানে। তা ছাড়া ওয়্যারহাউসে হানা দিয়ে লাভ নেই। এতক্ষণে সবকিছু সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আমি হলে তা-ই করতাম।'

'তা হলে কী করা উচিত আমাদের?'

'উৎসেই খোঁজ নেয়া যেতে পারে। নাকামুরা তলে তলে যা-ই ঘটাবার প্ল্যান করে থাকুক, তার সঙ্গে ওই সোনার সম্পর্ক আছে।'

'উৎস?'

'দারিয়েন প্রভিন্সের ওই ভলকানিক লেকের কথা বলছি। যেভাবে ওখানে অপারেশন চালিয়েছে ওরা, তাতে মনে হচ্ছে

ইনকাদের ট্রেজার ওখানেই লুকানো আছে। ওগুলোই তুলে আনছে ওরা, গলিয়ে সোনার বার তৈরি করছে। ব্যাপারটা প্রমাণ করতে পারলে নাকামুরার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব। পানামার জাতীয় প্রত্নসম্পদ ধ্বংস করার দায়ে কাঠগড়ায় তোলা যাবে ওকে।'

'ভলকানিক লেকের পারে যদি কিছু পাওয়া না যায়?' সন্দেহ প্রকাশ করল মেজর পিনোঁ। 'পুরো প্রভিন্সে তল্লাশি চালাবার মত লোকবল নেই আমাদের।'

'তার প্রয়োজন হবে বলে মনে হয় না,' মাথা নাড়ল রানা। 'লিপিনের জার্নাল রয়েছে আমাদের হাতে। ওটা স্টাডি করলে গুপ্তধন আবিষ্কারের সূত্র পাওয়া যেতে পারে। নিদেনপক্ষে নাকামুরা কেন ওটার ব্যাপারে আগ্রহী, সেটা তো বুঝতে পারব।'

'কোথায় ওটা?'

'আমার হোটেলে।'

'হোটেলে আপনার ফেরা চলবে না,' বলল অঁবিন। 'নাকামুরা ওখানে লোক বসিয়ে রেখেছে। তা ছাড়া জার্নালটাও অপ্রয়োজনীয়। প্যারিসে আপনাকে গছাবার আগে আমি নিজে ওটা পড়ে দেখেছি, ওর ভিতরে কিচ্ছু নেই।'

'কীভাবে শিয়োর হচ্ছেন?' ভুরু নাচাল রানা। 'গুপ্তধন উদ্ধারের অভিজ্ঞতা আছে আপনার? পুরনো ডকুমেণ্ট থেকে লুকানো সূত্র খুঁজে বের করেছেন কখনও?'

মুখ কালো করে ফেলল অঁবিন। 'তারমানে কিছু মিস করে গেছি আমি?'

'সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায় কি? নিজে না দেখা পর্যন্ত শিয়োর হতে পারছি না।'

'বেশ। জার্নালটা আনার ব্যবস্থা করব?'

'আপনাকে কিছু করতে হবে না, ওটা আমিই আনিয়ে নিতে

পারব। তা ছাড়া এক্ষুণি ওটার দরকার নেই। আগে ওই লেকটা দেখা দরকার। আপাতত আমাকে ওখানে পৌঁছুবার ব্যবস্থা করে দিন। ব্যাকআপ হিসেবে সঙ্গে কয়েকজন লোক দিলে আরও ভাল হয়।'

একটু ভাবল অঁবিন। 'আপনার কথাই যদি ঠিক হয়, ওখানে আমাদেরও যাওয়া উচিত। তবে সবাইকে নেয়া সম্ভব নয়, পোর্টের উপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখতে হচ্ছে আমাদেরকে। হুমম... আমি আর মেজর পিনোঁ, সেইসঙ্গে দুজন সৈনিক নিলে চলবে?'

'যথেষ্ট। কখন যেতে পারব?'

'আগামীকাল দুপুরে। রাতটা আপনারা এখানেই কাটাতে পারেন।'

'ধন্যবাদ, তার প্রয়োজন নেই। প্রস্তুতি নিতে হবে আমাদের, সেটা এখানে বসে সম্ভব নয়।'

'তা হলে কোথায় যাবেন? হোটেলে ফিরছেন না তো?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল রানা। নেফারতিতির দিকে ইশারা করে বলল, 'ওর অ্যাপার্টমেন্টে। ওখান থেকেই কাজ গুছিয়ে নেয়া যাবে।'

'আপনি যা ভাল মনে করেন। সকালে চলে আসবেন। আর হ্যাঁ, সাবধানে থাকবেন।'

'অবশ্যই!' উঠে দাঁড়াল রানা। হাত মেলাল। 'সকালে দেখা হবে।'

'আপনাদের পৌঁছে দেব?' জিজ্ঞেস করল পিনোঁ।

'নাহ্। আমরা ট্যাক্সিতে চলে যাব।'

বিদায় নিয়ে সেফ হাউস থেকে বেরিয়ে পড়ল রানা আর নেফারতিতি। দশ মিনিট লাগল ট্যাক্সি পেতে। পিছনের সিটে উঠে অ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানা বলল নেফারতিতি, সেদিকে ছুটে

চলল গাড়িটা।

'কী ব্যাপার, বলো তো?' খানিক পর জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি। 'ওখান থেকে চলে এলে কেন?'

'পরে বলব,' ইশারায় ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দেখাল রানা। 'তোমার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে নিই।'

আধঘণ্টা লাগল গন্তব্যে পৌঁছুতে। শহরের একপ্রান্তে উঁচু একটা বিল্ডিঙের দোতলায় থাকে নেফারতিতি। সাগরের কাছাকাছি। দরজা খুলে লিভিং রুমে ঢুকল দুজনে, নেফি আলো জ্বাললে ভিতরে নজর বোলাল রানা। সাদামাঠা সাজসজ্জা, ফার্নিচারগুলো সম্ভবত অ্যাপার্টমেন্টের সঙ্গেই ছিল। দেয়ালে কয়েকটা ফটোগ্রাফ ঝোলানো। ফ্যামিলি পোর্ট্রেট, সেইসঙ্গে নেফির নিজের কয়েকটা ছবি। এক কোণে টেবিলের উপরে একটা টেলিফোন দেখা যাচ্ছে।

'আমি একটা ফোন করব,' বলে ওটার দিকে এগিয়ে গেল রানা। রিসিভার তুলে ফোন করল সিজার পার্ক হোটেলে। অপারেটরকে নিজের কামরার নাম্বারে সংযোগ দিতে বলল। দু'বার রিং হতেই সোহেলের কণ্ঠ শোনা গেল।

'হ্যালো?'

'সোহেল, আমি,' সংক্ষেপে বলল রানা।

'কোথায় তুই?' উদ্বেগ প্রকাশ পেল সোহেলের গলায়। 'সেই কখন থেকে অপেক্ষা করছি...'

অল্প কথায় রাতের ঘটনা ওকে বলল রানা। শেষে যোগ করল, 'একটা কাজ করতে হবে তোকে। নাকামুরার লোককে বোঝাতে হবে যে আমরা পানামা ছেড়ে চলে গেছি। সম্ভব?'

'কঠিন কিছু না। আমাদের নামে টিকেট কেটে অন্য কাউকে প্লেনে তুলে দেব। টাকা ছড়ালে লোক পেতে অসুবিধে হবে না।'

'গুড। তা হলে সকালেই হোটেল ছেড়ে দে। আমি আর

ফিরছি না। তুই আপাতত অন্য কোনও হোটেলে গিয়ে উঠিস। আর হ্যাঁ, লিপিনের জার্নালটা সঙ্গে নিতে ভুলিস না।'

এসব সোহেলের জন্য নতুন কিছু নয়, দ্বিরুক্তি না করে বলল, 'ঠিক আছে। আর কিছু?'

'আমি আগামীকাল অঁবিনের সঙ্গে যাচ্ছি, এদিকে তোকে অন্য একটা কাজ করতে হবে। কোবায়াশির কমপ্লেক্সে অনেকগুলো ডাম্প ট্রাক দেখেছি, ওগুলো কোথায় যায় খোঁজ নিবি।'

'ডাম্প ট্রাক?' একটু বিস্ময় প্রকাশ পেল সোহেলের গলায়।

'হ্যাঁ। আর্মার্ড ভ্যানটা এতক্ষণে গায়েব হয়ে গেছে, ট্রাকগুলোই ভরসা। কমপ্লেক্সে ডাম্প ট্রাকের উপস্থিতি সন্দেহজনক, ওগুলোর কোনও কাজ ছিল না ওখানে। অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ওগুলো রাখা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে আমার। চেষ্টা করবি ব্যাপারটা কী জানবার।'

'আচ্ছা। তুই সাবধানে থাকিস।'

'তুইও,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

ফরাসি সেফ হাউস থেকে চলে আসার কারণটা এতক্ষণে আঁচ করতে পারছে নেফারতিতি। রানার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'মি. অঁবিনের সামনে ফোন করতে চাইছিলে না তুমি, তাই না? ব্যাপার কী... ভদ্রলোককে তুমি বিশ্বাস করছ না?'

'ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটির খুব কম লোককেই আমি বিশ্বাস করি,' শান্ত গলায় বলল রানা।

'কিন্তু তারপরেও তো ওর সাহায্য নিচ্ছ... ওকে সাহায্য করছ!'

'বলতে পারো ওটা কার্যোদ্ধারের জন্য এক ধরনের কৌশল।'

'তারমানে ফরাসিদের মিশন নিয়ে তুমি মোটেই চিন্তিত নও? পানামা খাল কে দখল করে নিল না নিল, তাতে তোমার কিছু যায়-আসে না?'

‘একদমই না। ওটা আমেরিকা আর ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মাথাব্যথা।’

‘আমার কিন্তু তা মনে হয় না,’ একটু হাসল নেফারতিতি। ‘গত ক’দিন থেকেই তো দেখছি তোমাকে, খানিকটা বুঝতেও শুরু করেছি। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার লোক তুমি নও। অঁবিনও সেটা জানে। জানে বলেই তোমাকে জড়িয়েছে পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে। এবার ওর হয়ে তুমিই সমাধান করবে রহস্যের।’

‘আমাকে খেলানো বুঝি এতই সোজা?’ আহত গলায় বলল রানা।

‘নয়? তা হলে সোহেলকে ডাম্প ট্রাকের পিছনে লাগালে কেন? উঁহুঁ, ব্যাপারটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বার পাত্র তুমি নও। আমিও আছি তোমার দলে।’

‘এরই মধ্যে অনেক ঝুঁকি নিয়েছ তুমি,’ বলল রানা। ‘আর নেবার কোনও প্রয়োজন দেখছি না। আমার মনে হয় আগামীকাল তুমি না গেলেই ভাল হয়।’

‘কী! যেতে মানা করছ আমাকে?’ রাগী গলায় বলল নেফারতিতি। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। ‘আগেও বলেছি, এখনও বলছি, আমাকে অবহেলা কোরো না, রানা। বিপদের ভয়ে পিছিয়ে যাওয়ার মানুষ নই আমি।’

‘আর আমিও জেনেশুনে তোমাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি না,’ পাল্টা যুক্তি দেখাল রানা। ‘ভলকানিক লেক থেকে একবার মরতে মরতে বেঁচে এসেছি আমরা, এবার কী ঘটবে তার কোনও নিশ্চয়তা আছে? তোমার কিছু হয়ে গেলে বিবেকের কাছে অপরাধী হয়ে থাকব আমি।’

‘আমি একজন আর্মি অফিসার, বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে কাজ করাটা আমার দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে,’ জোর গলায় বলল নেফি।

'কিন্তু এখানকার পরিস্থিতিতে কাজ করবার জন্য কেউ আদেশ দেয়নি তোমাকে। মিশনটা সম্পূর্ণ আন-অথোরাইজড্। উল্টোপাল্টা কিছু ঘটে গেলে তোমার ক্যারিয়ার নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। আমি সে-কথাও ভাবছি।'

'ধন্যবাদ, কিন্তু ক্যারিয়ারটা আমার। কাজেই ওটার ভালমন্দের চিন্তা আমার উপরেই ছেড়ে দাও। এসব যুক্তি দেখিয়ে কোনও লাভ নেই। আমি তোমার সঙ্গে থাকছি, রানা... যা-ই ঘটুক না কেন! অ্যাণ্ড... দ্যাটস্ ফাইনাল।'

নেফির রাগী চেহারার দিকে তাকিয়ে বুঝে ফেলল রানা, ওকে নিরস্ত করা যাবে না। অগত্যা ও বলল, 'বেশ, যেতে পারো তুমি আমার সঙ্গে। কিন্তু শর্ত হলো, আমি যখন যে নির্দেশ দেব, বিনা তর্কে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে সেটা। রাজি আছ? ফিল্ডে গিয়ে কোনও ধরনের গোয়ার্তুমি করা চলবে না।'

'শর্ত দেবার দরকার নেই। যতক্ষণ না অযৌক্তিক কিছু করতে বলছ, ততক্ষণ আমি এমনিতেই তোমার কথামত চলব।'

তরুণী ক্যাপ্টেনের রণমূর্তির দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল রানা, সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা পেয়ে গেল মেয়েটা। তাড়াতাড়ি কোমর থেকে হাত নামিয়ে পাশ ফিরে দাঁড়াল। বুকে আলোড়ন উঠেছে ওর, গাল হয়ে উঠেছে আরক্ত। অজুহাত দেখাবার সুরে বলল, 'আমি শাওয়ার নিতে যাচ্ছি। তোমার কিছু লাগবে?'

'বাথরুম কি একটাই? আমারও ফ্রেশ হওয়া দরকার। সারা গায়ে মনে হচ্ছে কয়েক পোঁচ ময়লা জমেছে।'

'পনেরো মিনিট সময় দাও আমাকে, তারপর তুমি যেতে পারবে। ফ্রিজে বিয়ার আছে, চাইলে এই ফাঁকে গলা ভেজাতে পারো।'

রানাকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে চলে গেল নেফারতিতি। বেডরুমে গিয়ে কাপড় ছাড়ল, ঢুকে পড়ল

বাথরুমে। শাওয়ারের গরম পানির নীচে দাঁড়িয়ে চোখ বুজল ও, গা থেকে ধোঁয়ার মতো বাষ্প উঠছে। দেখতে দেখতে উজ্জ্বল লালচে হয়ে উঠল গায়ের চামড়া; সমস্ত ক্লান্তি যেন ধীরে ধীরে ধুয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে ভালো লাগার একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে দেহমনে। গায়ে সাবান ঘষতে ঘষতে রানার কথা ভাবল। অদ্ভুত এক মানুষ, আশ্চর্য একটা ব্যক্তিত্ব—অঁবিনের মত অভিজ্ঞ এজেন্টকেও ওর সামনে মাথা নত করতে হয়েছে। রানার সুঠাম দেহ আর সুদর্শন মুখটার কথা ভাবতেই আলোড়িত হলো হৃদয়... নগ্ন শরীর কেঁপে উঠল শিরশির করে। মনকে ধোঁকা দেয়া সম্ভব নয়; সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করছে নেফারতিতি, মানুষটার প্রেমে পড়েছে ও। কিন্তু ওকে বাঁধনে জড়াবার শক্তি যে ওর নেই! হতাশার এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুক চিরে।

শাওয়ার নেয়া হলে বাথরোব গায়ে বেরিয়ে এল নেফারতিতি। রানাকে ডাকতে গিয়ে দেখল, কাউচে শরীর এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ও। ঘুমন্ত অবস্থাতেও দুর্ধর্ষ দেখাচ্ছে চেহারা। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ভরা মুখটায় হাত বোলানোর ইচ্ছে বহু কষ্টে দমন করল নেফি। বেডরুম থেকে একটা চাদর এনে ঢেকে দিল দেহটা। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকল রানার নিষ্ঠুর মুখের দিকে। তারপর আলো নিভিয়ে চলে গেল বিছানায়—বাকি রাত নিদ্রাহীন ছটফট করে কাটাবার জন্য।

তেরো

বেলা দশটায় সেফ হাউসে ফিরল রানা আর নেফারতিতি। বাড়ির সামনের কামরায় মেজর পিনোঁ তখন দুজন সৈনিককে রাইফেল খোলা এবং জোড়া দেবার ট্রেইনিং দিচ্ছে। জানা গেল, এরাই ওদের সঙ্গে দারিয়েন প্রভিন্সের অপারেশনে যাবে।

ফ্রেঞ্চ লিজনের নাম শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে পুরনো আমলের হলিউডি ছবির দৃশ্য—সাহারা মরুভূমিতে দুর্গ গড়ে আরব দস্যুদের ঠেকাতে থাকা একদল সৈনিক; গায়ে ঢোলা খাকি ইউনিফর্ম, মাথায় কেপি টুপি, হাতে গাদা বন্দুক। তবে গত রাতেই পরিষ্কার হয়ে গেছে, সে-যুগ বহু আগে পেরিয়ে এসেছে লিজনেয়াররা। চোখের সামনে দুই সৈনিককে ট্রেইনিং নিতে দেখে রানা উপলব্ধি করল, এরা এখন সিল, গ্রিন বেরেট বা ডেল্টা ফোর্সের মত সুশৃঙ্খল ও পেশাদার এক বাহিনী। মেজর পিনোঁর তীক্ষ্ণ নির্দেশের সঙ্গে যন্ত্রচালিতের মত নড়ছে এরা, অস্বাভাবিক দ্রুততায় খুলে ফেলছে সামনে রাখা *ফামাস* অ্যাসল্ট রাইফেলের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ, পরবর্তী নির্দেশে আবারও জোড়া দিচ্ছে একই দ্রুততায়।

হাতে একটা স্টপওয়াচ নিয়ে সৈনিকদের টাইমিং দেখছে মেজর পিনোঁ। অস্ত্রদুটো কক করে ইন্সপেকশনের জন্য ওরা সামনে বাড়িয়ে ধরতেই বলল, 'আগেরবারের চেয়ে দু'সেকেণ্ড কম

লেগেছে, কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। আবার করো।'

সৈনিকরা রাইফেল ডিস্‌অ্যাসেম্বল করে ফেলল। নেফারতিতি বলল, 'এক্সকিউজ মি, মেজর। ব্যবহারের অস্ত্র নিয়ে বার বার এ-ধরনের ড্রিল করা কি বুদ্ধিমানের কাজ?'

একটু হাসল পিনোঁ। 'মোটেই না। সে-কারণেই শুধু ট্রেইনিঙের জন্য ব্যবহার করি এগুলো, কমব্যাট ওয়েপন ভিন্ন। ডোণ্ট ওয়ারি, ক্যাপ্টেন, আমরা আমাদের কাজ জানি।'

বাড়ির ভিতর থেকে উদয় হলো অঁবিন, দুই অতিথিকে দেখে হাসিতে উদ্ভাসিত হলো মুখ। সম্ভাষণ জানাবার ভঙ্গিতে বলল, 'গুড মর্নিং, মসিয়ো রানা, ক্যাপ্টেন শেফার্ড! আসুন, বসুন। কফি চলবে?'

আপত্তি করল না রানা। ঘুম পুরো হয়নি, সকাল হতেই নাকেমুখে সামান্য ব্রেকফাস্ট গুঁজে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল কেনাকাটার কাজে। সারা শরীরে এখনও রয়ে গেছে গতকালকের ক্লান্তি।

ফ্রেঞ্চ রোস্ট কফির মগ হাতে দিনের কর্মপরিকল্পনা খুলে বলল অঁবিন। লিজনেয়ারদের হেলিকপ্টারে এল্ রিয়াল পর্যন্ত যাবে ওরা, সঙ্গে নেবে একটা *যোডিয়াক* ইনফ্লেইটেবল বোট। তারপর সেই বোটে চড়ে রিও টুইরা নদী ধরে এগোবে, নেমে পড়বে হায়দারের ক্যাম্পের কাছাকাছি কোনও লোকেশনে। নলখাগড়ার ভিতরে বোট লুকিয়ে এরপর জঙ্গলের কাভার নিয়ে আগ্নেয়গিরির গোড়া পর্যন্ত যাবে ওরা; গতবার যে-পথ অনুসরণ করেছিল রানা আর নেফারতিতি, তার উল্টোদিকের ঢাল বেয়ে উপরে উঠবে।

ফরাসি এজেন্টের ব্রিফ শুনতে শুনতে ক্যামেরায় ফিল্ম ভরল রানা—আজ সকালেই কিনেছে ওটা। আরও কিনেছে একটা ফোর হাণ্ড্রেড এমএম টেলিফটো লেন্স। শত্রুদের কুকীর্তির ছবি তুলে রাখবে, সেগুলো পরে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করবে উপযুক্ত

কর্তৃপক্ষের সামনে। অঁবিনও অজুহাত পেয়ে যাবে জাপানি কোম্পানিটার বিরুদ্ধে অফিশিয়ালি তদন্ত চালাবার। প্ল্যানটা বেশ সরল... সেইসঙ্গে নিরাপদ। অন্তত কোবায়াশি টার্মিনালে অনুপ্রবেশের মত ঝুঁকি নেই এতে। টেলিফটো লেন্সের কারণে দূর থেকে ছবি তুলতে পারবে অনায়াসে, শত্রুদের নাগালের মধ্যে যেতে হবে না।

অভিযানের একমাত্র কঠিন অংশ হলো জঙ্গলের মাঝ দিয়ে অগ্রসর হওয়াটা। হিংস্র জানোয়ার, বিষাক্ত লতাপাতা কিংবা দুর্গম পথই একমাত্র বাধা নয়; ওখানে থাকতে পারে শত্রুদের পেতে রাখা ফাঁদ বা অ্যামবুশ। তবে অঁবিন আশ্বস্ত করে জানাল, তার দলের লিজনেয়াররা ফ্রেঞ্চ গায়ানার কৌরুতে নিয়োজিত থার্ড রেজিমেন্টের সদস্য—এরা জাঙ্গল ওয়ারফেয়ারের বিশেষজ্ঞ, বর্তমানে এরিয়ান স্পেসপোর্টের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব এদের উপরেই ন্যস্ত। লোকগুলোর দক্ষতা নিয়ে তেমন একটা সন্দেহ নেই রানার মনে, তারপরেও কেন যেন মন খচ্ খচ্ করছে ওর। না, লিজনকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে না। অন্য কিছু। কোবায়াশির পোর্ট ফ্যাসিলিটিতে কী যেন দেখেছে, ঠিক মনে পড়ছে না। পরিচিত কিছু।

সাধারণত এ-ধরনের জিজ্ঞাসার জবাব ঘুমের মধ্যে পেয়ে যায় ও, কিন্তু কাল তা ঘটেনি। ক্লান্তির সামনে হার মেনেছে অবচেতন মন। নেফি বাথরুমে যেতেই নিজের অজান্তে ঢলে পড়েছিল ও, কয়েক ঘণ্টার জন্য অচল হয়ে গিয়েছিল শরীর আর মগজ। সকালে নেফিই ডেকে তুলেছে ওকে। ঝটপট গোসল আর নাশতা সেরে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল, খটকাটা নিয়ে ভাববার সময় আর হয়নি। অঁবিনের ব্রিফ শুনতে শুনতে অস্বস্তিটা ফিরে এল রানার মাঝে।

ওর চেহারায় পরিবর্তন লক্ষ করেছে নেফারতিতি। বাহু স্পর্শ

করে জিজ্ঞেস করল, 'কী হলো? কোনও সমস্যা?'

সংবিৎ ফিরে পেল রানা। বলল, 'না, তেমন কিছু না। অন্য একটা ব্যাপারে ভাবছিলাম।' অঁবিনের দিকে নজর ফেরাল ও। 'কখন রওনা হচ্ছি আমরা?'

'লাঞ্চের পর,' জানাল অঁবিন। 'সন্ধ্যা সাতটায় ডুববে সূর্য; তার পর পরই বোট রাইড শুরু করতে চাই। অন্ধকারের কাভার নিয়ে সবার অলক্ষে এগোনো যাবে তা হলে। সঙ্গে নাইট-ভিশন গগলস্ থাকছে, অন্য কোনও বোটের সঙ্গে টক্কর খাবার ভয় নেই। অবশ্য আমরা যে-দিকে যাচ্ছি, সে-দিকে নৌকা চলাচল খুব কম। রাতটা আমরা বোটেই কাটাব, ভোরের আলো ফুটলে মার্চ করব লেকের দিকে।'

'তখন হেলিকপ্টারটা কোথায় থাকবে?'

'ইঞ্জিন ট্রাবলের অজুহাতে এল্ রিয়ালের এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করবে। আজ ভোরেই চেহারা পাল্টে ফেলা হয়েছে ওটার। ফিউজেলাজে একটা সাইট-সিয়িং কোম্পানির নাম বসানো হয়েছে; আশা করি ওটাকে দেখে কারও মনে সন্দেহ জাগবে না।'

'এল্ রিয়াল?' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'ওটা তো অন্তত বিশ মিনিটের ফ্লাইট ডিসট্যান্স। আমাদের যদি ইমার্জেন্সি ইভ্যাকুয়েশনের প্রয়োজন হয়?'

'জানি, সময়টা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে,' স্বীকার করল অঁবিন। চেহারা দেখে বোঝা গেল, ব্যাপারটা তার নিজেরও মনঃপূত নয়। 'কিন্তু আমরা নিরুপায়। ওদিকে হেলিকপ্টার রাখার মত আর কোনও জায়গা নেই।'

'কাল রাতে ঠিকমত বুঝতে পারিনি... কী মডেলের কপ্টার ওটা?'

'জেটরেঞ্জার ট্রিপল টু।'

'এক্সটেণ্ডেড ট্যাঙ্ক?'

'না। লা পালমা থেকে ফিউয়েল নেব আমরা, পানামা সিটিতে রিটার্ন ট্রিপের জন্য সেটা যথেষ্ট। তবে কাজ শেষে যোডিয়াক নিয়ে এল্ রিয়াল পর্যন্ত ফিরে আসতে হবে আমাদেরকে।'

'আমি এতে কোনও সমস্যা দেখছি না,' মন্তব্য করল নেফারতিতি।

রানা একমত হতে পারল না। ফরাসি এজেন্টের প্ল্যানে অনেক দুর্বলতা আছে—অনেক জায়গাতেই গড়বড় হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এ-মুহূর্তে এরচেয়ে ভাল কোনও প্ল্যান ওর নিজের মাথাতে আসছে না, অগত্যা ওটা মেনে নিতে বাধ্য হলো। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'বেশ, আপনার প্ল্যান মোতাবেকই এগোব আমরা।'

অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে মেজর পিনোঁ; পরের দু'ঘণ্টা তার সঙ্গে কাটাল ওরা, গবেষণা করল টার্গেট এরিয়ার ম্যাপ আর স্যাটেলাইট ইমেজ নিয়ে। পথের খুঁটিনাটি, গন্তব্য এলাকার বৈশিষ্ট্য, ইত্যাদি গেঁথে নিল মাথায়। মেজরকে ধীরে ধীরে পছন্দ করতে শুরু করল রানা—জাত সৈনিক হলেও সে মাথামোটা নয়, নেই কোনও হামবড়া ভাব। রানা আর নেফারতিতির প্রতিটা পরামর্শ গুরুত্ব দিয়ে শুনেছে সে, সেগুলোকে বিবেচনায় রেখে চূড়ান্ত পরিকল্পনা সাজিয়েছে।

লাঞ্চের জন্য আধঘণ্টার বিরতি দেয়া হলো। তারপর খানিক বিশ্রাম নিয়ে আরও আধঘণ্টা আলাপ-আলোচনা চলল। সবশেষে গাড়িতে চড়ে রওনা হয়ে গেল ছ'জনের ছোট্ট দলটা। পানামা সিটিকে পাশ কাটিয়ে সাগরের পাশ ঘেঁষে প্যান-অ্যামেরিকান হাইওয়ে ধরে ছুটে চলল ওদের ভ্যান।

ড্রাইভ করছে মেজর পিনোঁ; চল্লিশ মিনিটের মাথায় হাইওয়ে ছেড়ে একটা কাঁচা রাস্তায় নামিয়ে আনল গাড়ি। ঘন ঘন ঝাঁকি রানাকে বুঝিয়ে দিল, কপ্টার থেকে নামাবার পর গত রাতে

এ-পথেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওদেরকে। মনে মনে ম্যাপ স্মরণ করল, উপকূলীয় শহর *চেপো* থেকে কয়েক মাইল দূরে রয়েছে ওরা, শহরটার পরেই শুরু হয়েছে দারিয়েন গ্যাপের দুর্ভেদ্য অরণ্য।

সেই অরণ্যের প্রসারিত একটা শাখায় ঢুকছে ওরা। দেখতে দেখতে চারপাশের সিন-সিনারি অদৃশ্য হলো, সে-জায়গা দখল করল বুনো গাছপালা আর ঝোপঝাড়। আরও বিশ মিনিট পর গাছের সারি পেরিয়ে গত রাতের সেই মাঠে পৌঁছুল ভ্যান, ব্রেক কষে থমকে দাঁড়াল। দরজা খুলে নেমে পড়ল আরোহীরা। সূর্যের আলোয় ঘাস আর আগাছায় ভরা জমিটার উপর নজর বোলাল রানা, ঠিক মাঝখানে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওদেরকে উদ্ধার করে আনা হেলিকপ্টারটা। অঁবিন মিথ্যে বলেনি, সত্যিই চেহারা পাল্টে গেছে ওটার। কালো রঙের উপরে সাদা আর হলুদ কতগুলো রেখা আঁকা হয়েছে; এ ছাড়া লাগানো হয়েছে সাইট-সিয়িং কোম্পানির নাম-সহ স্টিকার। সাধারণ একটা আকাশযানের মত লাগছে ওটাকে। মাঠের একপ্রান্তে দেখা যাচ্ছে ভাঙাচোরা একটা একতলা বাড়ি। অঁবিন জানাল, জায়গাটা পরিত্যক্ত এক প্রাচীন প্ল্যান্টেশনের অংশ; বাড়িটা সেই আমলের।

গাড়ি থামতেই হেলিকপ্টার থেকে নেমে এসেছে ওভারঅল পরা দুজন লিজনেয়ার—এরাই ভোরবেলা এসে চেহারা পাল্টেছে হেলিকপ্টারের। মেজর পিনোঁ সংক্ষেপে তাদের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে ভ্যানের চাবি হস্তান্তর করল। ওদের একজন গাড়িসহ এখানেই অপেক্ষা করবে ওরা ফিরে না আসা পর্যন্ত; অপরজন হেলিকপ্টারের পাইলট... দলটাকে নিয়ে যাবে দারিয়েন প্রভিন্সে।

হেলিকপ্টারের দিকে এগোল অভিযাত্রীরা। হিঞ্জ থেকে পিছনের দরজাদুটো খুলে ফেলা হয়েছে... ভাঁজ করা যোডিয়াক বোটটা তোলা হয়েছে প্যাসেঞ্জার কেবিনে, পানিতে নামাবার আগে

বাতাস ভরে ফুলিয়ে নেয়া হবে। ডিফ্লেইটেড অবস্থাতেও অনেকখানি জায়গা দখল করেছে ওটা, পিছনের সিট উঠিয়ে ফেলতে হয়েছে ওটাকে রাখবার জন্য। সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর ঠিক করা হলো, অঁবিন সামনে পাইলটের পাশে বসবে; দলের বাকি পাঁচ সদস্য গাদাগাদি করে বসবে প্যাসেঞ্জার কেবিনের মেঝেতে।

একটু পরেই টেকঅফ করল হেলিকপ্টার, এক ঘণ্টা পর ল্যাণ্ড করল লা পালমার ছোট্ট এক এয়ারফিল্ডে। সেখানে ফিউয়েলিং করে আবারও আকাশে উড়ল ওরা, রওনা হলো গন্তব্যের উদ্দেশে। সাদা পোশাকে ছিল ওরা এতক্ষণ, এবার পিনোঁর নির্দেশে একে একে কমব্যাট ফেটিগ পরল সবাই। নেফারতিতির মধ্যে কোনও জড়তা লক্ষ করল না রানা, সহজ ভঙ্গিতে টি-শার্ট আর প্যান্ট খুলল সে... ক্ষণিকের জন্য সঙ্গীদের সামনে উন্মুক্ত হলো তার অন্তর্বাস পরা অর্ধ-নগ্ন মোহনীয় শরীর... ফেটিগের তলায় খানিক পরেই আবার ঢাকা পড়ে গেল সেই অপূর্ব দেহবল্লরী।

ঊরুতে আটকানো ম্যাপ দেখে দক্ষ হাতে হেলিকপ্টারকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে লিজনের অস্ট্রেলীয় পাইলট, ঘন ঘন বাঁক নিয়ে অনুসরণ করছে রিও টুইরা নদীর আঁকাবাঁকা প্রবাহ। জঙ্গলের প্রায় মাথা ছুঁয়ে এগিয়ে চলেছে কপ্টার, নীচে তাকালেই রানা দেখতে পাচ্ছে গাছের ডগায় লাফঝাঁপ দিতে থাকা বানরের দল কিংবা ভয় পেয়ে ডানা মেলা বুনো পাখির ঝাঁক। রোটরের অবিরাম আওয়াজ আর গাদাগাদি হয়ে থাকা প্যাসেঞ্জার কেবিনের অস্বস্তিকর পরিবেশ ওকে আর কিছু নিয়ে ভাবনাচিন্তার সুযোগ দিচ্ছে না। শামুকের মত গড়িয়ে চলল সময়।

যেন অনন্তকাল পর দিগন্তের ওপারে মুখ লুকাল সূর্য, পশ্চিম আকাশে তার চিহ্ন হিসেবে রয়ে গেল স্রেফ লালিমা। আঁধার

নামছে বাইরে। কবজিতে বাঁধা ট্যাগ-হিউয়ার ঘড়িতে নজর বোলাল রানা—সন্ধ্যা সাতটা দশ। পাইলট চমৎকার টাইম মেইনটেন করেছে।

হেলিকপ্টারের গতি কমানো হলো। নদী এখন ওদের ডানপাশে, সিকি মাইল দূরে—অন্ধকার জঙ্গলের বুক চিরে চলে যাওয়া গাঢ় এক ক্ষত যেন। ইনফ্রারেড মনোকিউলার তুলে নদীর উপরিভাগ জরিপ করল অঁবিন, দেখে নিল ওখানে বোটের ইঞ্জিন বা মানুষের শরীরের হিট সিগনেচার আছে কি না। নিশ্চিত হয়ে পাশ ফিরে পাইলটকে ইশারা করল, কয়েক মুহূর্ত পর পাশাপাশি হোভার করে পানির উপরে গিয়ে থামল কপ্টার।

নড়ে উঠল প্যাসেঞ্জার কেবিনে বসা লিজন-সদস্যরা। এক ঝটকায় সাইড ডোর খুলে ফেলল, এয়ার টিউবের ল্যানিয়ার্ড টেনে এক ধাক্কায় যোডিয়াকটা ফেলে দিল নীচে। শূন্যে থাকতেই ফুলে বোটের আকৃতি পেল ওটা, ঝপাস করে পানিতে পড়ল। ভাসছে। ওটার পিছু পিছু লাফ দিল দুই সৈনিক, তারপর নেফারতিতি, রানা আর অঁবিন। ওয়াটারপ্রুফ কয়েকটা ব্যাগ নীচে ফেলে সবশেষে ঝাঁপ দিল মেজর পিনোঁ। বোটের চারপাশের পানিতে আছড়ে পড়ল সবাই। আরোহীরা নেমে যেতেই হোভার করে সরে গেল কপ্টার, কিছুদূর গিয়ে মুখ ঘোরাল, রওনা হলো এল্ রিয়ালের উদ্দেশে। পুরো ব্যাপারটায় সময় লাগল মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ড।

পানিতে পড়েই অনেকটা তলিয়ে গিয়েছিল রানা, হাত-পা ছুঁড়ে ভেসে উঠতেই দেখল দুই সৈনিক ইতিমধ্যে উঠে পড়েছে যোডিয়াকে; দু'পাশে গিয়ে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে দিল। একে একে টেনে তুলল বাকিদের।

বোটে উঠেই ঘড়ি দেখল অঁবিন, সন্তুষ্টির হাসি হেসে বলল, 'গ্রেট টাইমিং।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল রানা। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।'

ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগগুলো তুলে নেয়া হলো বোটে। ভিতর থেকে বের করা হলো অস্ত্রশস্ত্র আর অন্যান্য ইকুইপমেন্ট। বিতরণ করা হলো সবার মাঝে। ইকুইপমেন্টের মাঝে হারনেসের সেট লক্ষ করে নেফারতিতি জিজ্ঞেস করল, 'এগুলো কেন? আপনাদের কপ্টারে তো উইঞ্চ নেই।'

'তাতে কী?' বলল মেজর পিনোঁ। 'ইমার্জেন্সি দেখা দিলে প্যাসেঞ্জার কেবিনের মেঝের হুকে দড়ি বেঁধে নীচে ফেলে দেবে পাইলট। দ্রুত কপ্টারে ওঠার জন্য তখন কাজে দেবে হারনেসগুলো। সবার জন্যই আছে এক সেট করে। পরে নিন।'

'আশা করা যাক তেমন পরিস্থিতি দেখা দেবে না,' রানা বলল। একটা বেরেটা পিস্তল দেয়া হয়েছে ওকে, ওটা কোমরের হোলস্টারে গুঁজল। ক্যামেরা নিয়েছে পিঠের ছোট্ট ব্যাকপ্যাকে। এরপর ঝটপট পরে ফেলল নিজের হারনেস।

নাইট ভিশন গগলস্ পরে বোটের সামনে পজিশন নিল মেজর পিনোঁ, দুই সৈনিক বাইতে শুরু করল বৈঠা। আউটবোর্ড ইঞ্জিন চালু করার সাহস পাচ্ছে না, অনেকদূর থেকে শোনা যাবে ইঞ্জিনের শব্দ। অঁবিন বসেছে ট্রানসমে, পিছন থেকে আর কোনও বোট উদয় হয় কি না সেদিকে খেয়াল রাখছে। দিনের আলো পুরোপুরি মিলিয়ে গেছে, মাথার উপরে এক চিলতে কালো আকাশে মিটমিট করে জ্বলছে কিছু তারা। চারপাশ থেকে জংলি জানোয়ারের আওয়াজ আর কীটপতঙ্গের গুঞ্জন শোনা না গেলে পরিবেশটাকে আঁধার মহাশূন্য বলে ভ্রম হতে পারত।

পাঁচ মাইল এগোনোর পর হঠাৎ হাত নেড়ে সঙ্কেত দিল মেজর পিনোঁ, সামনে কিছু একটা দেখতে পেয়েছে সে। নদীর মাঝখান ধরে এগোচ্ছিল যোডিয়াক, সঙ্কেত পাওয়ামাত্র ওটাকে ডানদিকে ঘোরাল দুই বৈঠাধারী সৈনিক, নিয়ে চলল পারের দিকে। কাছাকাছি পৌঁছুনোর পর পানি থেকে তুলে নেয়া হলো

বৈঠা। থমথমে উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল আরোহীরা।

কয়েক মিনিট পরেই দৃষ্টিসীমায় আবছাভাবে উদয় হলো একটা স্থানীয় ক্যানু—*পিরাগুয়া* বলে ওগুলোকে। দুজন আরোহী, আদিবাসী। আবছায়া পরিবেশে ভূতের মত লাগছে তাদেরকে, যন্ত্রের মত বৈঠা বাইছে। উল্টোদিক থেকে এসেছে ক্যানুটা, মাত্র ত্রিশ ফুট দূর দিয়ে পেরিয়ে গেল যোডিয়াককে। ওদের উপস্থিতি টের পায়নি বলেই মনে হলো, কোনও পরিবর্তন আসেনি ক্যানুর গতিতে। হুট করে যেমন উদয় হয়েছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই আবার হারিয়ে গেল ওটা। স্বস্তির শ্বাস ফেলল যোডিয়াকের আরোহীরা। নিশ্চিত হবার জন্য কিছুটা সময় অপেক্ষা করে আবার শুরু হলো পথচলা।

পরের চার ঘণ্টা স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করে উজানের দিকে এগিয়ে চলল যোডিয়াক। পালা করে বৈঠা বাইল বোটের ছয় আরোহী। যখন পালা এল, লিজনেয়ারদের চেয়ে ওরা কোনও অংশে কম নয়, এটা প্রমাণ করবার জন্যই বুঝি অন্যদের চেয়ে দ্রুতগতিতে বৈঠা বাইল রানা আর নেফারতিতি। এক ঘণ্টা পেরুলে রানার কাঁধে টোকা দিল পিনোঁ, ইশারা করল ডানদিকে—সরু একটা খালের মুখ দেখা যাচ্ছে। মাথা ঝাঁকিয়ে বোটের মুখ ওদিকে ঘোরাল রানা আর নেফারতিতি; ঢুকে পড়ল খালে। পানির গভীরতা কমতে শুরু করল, খানিক পর লগির মত ব্যবহার করতে হলো বৈঠাদুটোকে—খালের তলদেশে ঠেকিয়ে ঠেলতে হলো বোটকে। পাঁচশো গজ যাবার পর ছোট্ট একটা জলপ্রপাতের দেখা মিলল... মাত্র তিন ফুট উঁচু... ওটার কারণে সামনে এগোনোর পথ রুদ্ধ।

'ব্যস, এতেই চলবে,' নিচু গলায় বলল পিনোঁ। 'বোট লুকানোর জন্য জায়গাটা চমৎকার। বাকি পথ আমরা পায়ে হেঁটে যেতে পারব।'

'কতদূর এসেছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

হ্যাণ্ডহেল্ড জিপিএস রিসিভারের রিডিং দেখল মেজর, তারপর ম্যাপের সঙ্গে মিলিয়ে বলল, 'ভলকানিক লেক থেকে নামা পানির ধারা যেখানে রিও টুইরার সঙ্গে মিশেছে, আমরা তার পাঁচ মাইল ভাটিতে আছি। এই খালটাও সম্ভবত ওটারই একটা শাখা।'

'রাতে এখানেই ক্যাম্প করব?'

'হ্যাঁ। ভোরে রওনা হব লেকের উদ্দেশে।'

খালপারের একটা গাছের সঙ্গে বাঁধা হলো বোট, তারপর ঝটপট তীরে নেমে এল সবাই। দ্রুত সামান্য জায়গা পরিষ্কার করে ক্যাম্পসাইট বানানো হলো, বিছানো হলো স্লিপিং ব্যাগ, খাটানো হলো মশারি। আগুন জ্বালা হলো না, সঙ্গে আনা শুকনো খাবার দিয়ে ডিনার সারল ওরা, এরপর ঢুকে পড়ল স্লিপিং ব্যাগে। একজন সৈনিককে শুধু রাখা হলো পাহারায়।

ভোরে, সূর্য ওঠার আধঘণ্টা আগে সবাইকে ডেকে তুলল পাহারাদার। পনেরো মিনিট সময় দেয়া হলো মুখহাত ধোয়া, ব্রেকফাস্ট আর জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার জন্য। তারপর একসারিতে দাঁড়িয়ে রওনা হবার জন্য তৈরি হলো দলের পাঁচজন সদস্য। ষষ্ঠজন, অর্থাৎ পাহারাদার সৈনিকটি... জাতে ফরাসি, নাম দিদিয়ের... বোটের সঙ্গেই থেকে যাবে—রাতভর ঘুমায়নি সে, এবার বিশ্রাম নেবে, প্রয়োজনে ব্যাকআপ হিসেবে কাজ করবে। দ্বিতীয় সৈনিকটি জার্মান, নাম কার্ল, তাকে সবার পিছনে রেখেছে পিনোঁ, নিজে নিয়েছে সামনের পয়েণ্টম্যানের পজিশন। মাঝখানে থাকছে অঁবিন, রানা আর নেফারতিতি।

রওনা হবার আগে সংক্ষেপে একটা ব্রিফ দিল মেজর—নিজেদের মধ্যে পনেরো গজ দূরত্ব বজায় রেখে নদীর পার ধরে এগোবে ওরা; ঘন জঙ্গলের বাধা এড়ানো যাবে এতে, কেউ দলছুট হয়ে হারিয়ে যাবে না। মোটামুটি পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে ওরা

ফিরে আসতে পারবে বলে আশা করছে, তারপরেও অন্তত দুদিন চলবার মত খাবারদাবার আর দরকারি জিনিসপত্র বহন করবে ওরা। ব্রিফিং শেষ হলে হাঁটতে শুরু করল দলটা।

সূর্যের তেজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে শুরু করল আর্দ্রতা। ঘেমে নেয়ে উঠল অভিযাত্রীরা। জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে মরা গাছপালার পচা গন্ধ। গুমোট হয়ে উঠল বাতাস, ঠিকমত শ্বাস নেয়া যাচ্ছে না। উটকো যন্ত্রণা হিসেবে আছে পোকামাকড়—উড়ে এসে গায়ে বসছে, হুল ফোটাচ্ছে উন্মুক্ত চামড়ায়। সমস্ত অসুবিধে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলল ওরা।

চারপাশে বিষুবীয় এলাকার ঘন রেইন ফরেস্ট, কোনও দিকে বিশ-পঁচিশ কদমের বেশি দৃষ্টি চলে না। উপর থেকে গাছের ডাল আর লতাপাতা নেমে এসে যেন ওদের মাথা ছুঁতে চাইছে। পাতার ফাঁক গলে ঠিকমত নীচে পৌঁছুচ্ছে না সূর্যের রশ্মি, ফলে এই সাতসকালেও সবখানে অন্ধকার আর ছায়ার রাজত্ব। অশুভ পরিবেশ। দুর্গম। কোনোকালে কোনও মানুষ এ-পথে হেঁটেছে বলে মনে হলো না।

খালের পার ধরে কষ্টেসৃষ্টে ঘণ্টাখানেক এগোবার পর পাহাড়ি এক ঢালের গোড়ায় পৌঁছুল দলটা। উপরদিকে তাকাতেই আগ্নেয়গিরির পরিচিত অবয়ব দেখতে পেল রানা। জলপ্রপাতের দিকটায় নয়, আরেক পাশে পৌঁছেছে ওরা। এদিককার ঢালে কোনও ধাপ নেই, সরাসরি উঠে গেছে জ্বালামুখ পর্যন্ত। নীচের দিকটা গাছপালা আর ঝোপঝাড়ে ঢাকা, উপরের শ'খানেক ফুট ন্যাড়া। ইশারায় থামবার নির্দেশ দিল পিনোঁ, তারপর সবাইকে নিয়ে সন্তর্পণে ঘাপটি মারল ঝোপঝাড়ের আড়ালে। কেউ কোনও আওয়াজ করছে না, পাহাড়ের নীচে শত্রুপক্ষের পাহারাদার থাকতে পারে।

বিশ্রামের জন্য কয়েক মিনিট সময় দেয়া হলো। তারপর

সঙ্গীদের অপেক্ষা করতে বলে মাটিতে শুয়ে পড়ল পিনোঁ, ক্রল করে হারিয়ে গেল ঝোপঝাড়ের ভিতরে।

বিশ মিনিট পর ফিরল সে। ফিসফিস করে জানাল, 'আশপাশে কেউ নেই। তবে উপর থেকে ভারী যন্ত্রপাতির আওয়াজ শুনলাম।'

'নিশ্চয়ই জাপানিদের এক্সক্যাভেটিং ইকুইপমেন্ট,' অনুমান করল রানা। 'লেকের পারে খোঁড়াখুঁড়ি করছে ওরা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল পিনোঁ। বলল, 'আওয়াজ শুনে মনে হলো লেকের উল্টোদিকের পারে রয়েছে ওরা। এদিক থেকে উপরে ওঠা নিরাপদ।'

'তা হলে চলুন।'

ফরাসি মেজরের পিছু পিছু হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড়ি ঢাল ধরে উঠতে শুরু করল দলটা। প্রায় এক মিটার উঁচু ঘাস আর ঝোপঝাড়ে ঢাকা পড়ে রয়েছে ঢালটা, পাহাড়চূড়ার একশো ফুট নীচে শেষ হয়েছে তার বিস্তার, তারপর ন্যাড়া মাটি-পাথর। ঝোপঝাড়ের মাঝ দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে হাত-পা ছড়ে গেল সবার, বাড়তি উপদ্রব হিসেবে নানা ধরনের পোকামাকড় তো আছেই। কিন্তু উঠে দাঁড়াল না কেউই। খোলা অংশটায় পৌঁছুতেই কড়া রোদে শরীর ঝলসে যাবার উপক্রম হলো। দিগন্তের কাছে কালো মেঘ দানা বাঁধতে দেখল রানা, বোধহয় বৃষ্টি আসবে।

মন্দ হয় না তা হলে, মনে মনে ভাবল ও। নজরদারির জন্য ঝড়বাদলের কাভারটা কাজে লাগবে। তবে এ-ও ঠিক, বৃষ্টিভেজা পথে যোডিয়াকে ফিরে যাওয়া আগের চেয়ে কঠিন হয়ে উঠবে।

কনুই আর হাঁটুতে ব্যথা নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছুল ওরা। জ্বালামুখের পাড়ে ছোট-বড় খাঁজ আছে, তার মাঝে শরীর লুকিয়ে সাবধানে উঁকি দিল নীচে।

নিথর হয়ে আছে লেকের পানি। মাঝখানের ছোট্ট দ্বীপটা

পরিষ্কার দেখতে পেল রানা, সেখানে কারও পা পড়েছে বলে মনে হলো না। তবে লেকের পারে রীতিমত তাণ্ডব বয়ে যাচ্ছে। যেন শ্রমিকদের পুরো একটা বাহিনী নিয়োগ করা হয়েছে, চাষের জমির মত খুঁড়ে একাকার করে ফেলছে মাটি। এয়ারলিফট করে বেশ ক'টা এক্সক্যাভেটর উঠিয়ে আনা হয়েছে, হাইড্রলিক আর্ম দিয়ে বড় বড় গর্ত খুঁড়ে চলেছে ওগুলো, বুলডোজারের সাহায্যে খুঁড়ে তোলা মাটির স্তূপ ঠেলে ফেলে দেয়া হচ্ছে লেকে। পারের কাছে পানি ঘোলা হয়ে গেছে মাটি মিশে। হার্ড হ্যাট পরা স্থানীয় শ্রমিকরা মেশিনগুলোকে গাইড করছে, প্রয়োজনে কোদাল-বেলচা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে গর্তে; আরেক দল লোক নেটের ছাঁকনিতে মাটি ছাঁকছে, বোঝার চেষ্টা করছে ওতে সোনা আছে কি না। অটোমেটিক রাইফেলধারী বেশ কিছু প্রহরীও দেখা গেল, শ্রমিকদেরকে চোখে চোখে রাখছে তারা... কেউ যেন কিছু চুরি করতে না পারে।

ক্যানভাসের বড় বড় তাঁবু খাটানো হয়েছে শ্রমিকদের জন্য। তার সঙ্গে আছে ফিল্ড কিচেন, ল্যাট্রিন, আর গার্বেজ ডাম্প। শ'খানেক লোককে অনায়াসে সাপোর্ট দিতে পারবে ওগুলো। সৈকতে ল্যাণ্ড করা চকচকে একটা হেলিকপ্টার দেখা গেল, ইঞ্জিন বন্ধ। কাছেই লেকের পানিতে খালি ড্রাম আর প্লাইউডের সাহায্যে বানানো হয়েছে একটা ভাসমান জেটি; তার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে কতগুলো অ্যালুমিনিয়াম বোট—সবগুলোতে শক্তিশালী আউটবোর্ড ইঞ্জিন লাগানো।

বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইল অভিযাত্রীরা—ছোটখাট একটা শহর খাড়া করে ফেলা হয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ লুটপাটের জন্য। নির্ভয়ে কাজ করে চলেছে লুটেরার দল, এই নির্জন জায়গায় সহজে কেউ খোঁজ পাবে না ওদের। শরীরের ব্যথা-বেদনা ভুলে গেল রানা—হাত-পায়ের ক্ষত বা চামড়ায়

পোকামাকড়ের কামড় আর অনুভব করছে না। অনুভব করছে স্রেফ রাগ—প্রতিপক্ষের দুঃসাহস দেখে। এত খোলামেলাভাবে চুরি-ডাকাতি করা সম্ভব! ব্যাকপ্যাক থেকে ক্যামেরা বের করে আনল ও। লেন্স সেট করে সুইচ অন করল, চোখ রাখল ভিউয়ারে।

এক লাফে কয়েক গুণ বড় হয়ে দেখা দিল দৃশ্যটা। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হতে পারল না ও। এই কুকীর্তি যে জাপানিদের, সেটা প্রমাণ করবার জন্য আরও পরিষ্কার ছবি চাই ওর। ক্যামেরা নামিয়ে পিনোঁর দিকে তাকাল। বলল, 'এখান থেকে কারও চেহারা বোঝা যাচ্ছে না। আরও কাছে যেতে হবে।'

মাথা ঝাঁকাল ফরাসি মেজর। 'নীচে নেমে আরেক পাশ দিয়ে উঠে আসতে পারি আমরা—ক্যাম্পসাইটের মাথার উপরে। ওখান থেকে ছবি তুলতে পারবেন।'

'তা হলে চলুন।'

হামাগুড়ি দিয়ে আবারও ঝোপঝাড়ের আড়াল পর্যন্ত নেমে গেল অভিযাত্রীরা। এবার পথ দেখাবার দায়িত্ব নিল রানা। পাহাড়ের পাশ ধরে চক্রপথে এগোতে থাকল, এক্সক্যাভেটর মেশিনগুলোর আওয়াজ জোরালো হয়ে উঠলে ঢাল ধরে আবার শুরু করল উঠতে। গগনবিদারী শব্দের কারণে ওদের উপস্থিতি ফাঁস হবার সম্ভাবনা কম, তবুও সতর্ক রইল রানা। এক সারিতে হামাগুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে জ্বালামুখের কিনার পর্যন্ত উঠে এল ওরা পাঁচজন। আবারও মাটির খাঁজে লুকাল, তারপর মাথা তুলে নজর দিল নীচে।

যেখানটায় খোঁড়াখুঁড়ি চলছে, তার খুব কাছে উঠে এসেছে অভিযাত্রীরা। বিনকিউলার বা টেলিফটো লেন্সের প্রয়োজন হচ্ছে না, খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে কর্মব্যস্ত মানুষগুলোকে। গার্ড এবং মেশিন অপারেটরদের বেশিরভাগই জাপানি; কায়িক পরিশ্রম

করছে স্থানীয় পানামানিয়ান শ্রমিকের দল।

নেতৃস্থানীয় কাউকে আলাদা করতে পারল না রানা, যন্ত্রের মত কাজ করে চলেছে সবাই, কেউ হাঁকডাক করছে না। ক্যামেরা বের করে ছবি তুলতে শুরু করল রানা। হঠাৎ কাঁধে নেফারতিতির টোকা পেয়ে ঘাড় ফেরাল ও। সামনের একটা তাঁবুর দিকে ইশারা করছে মেয়েটা।

ওদিকে তাকাতেই ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটল রানার। তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা জাপানি লোকটাকে চিনতে পেরেছে। খাকি প্যান্ট আর বুশ জ্যাকেট পরে আছে সে, কিন্তু দু'রাত আগে একেই সুট পরা অবস্থায় কোবায়াশির ওয়্যারহাউসে দেখেছে ওরা। দুই সুপারভাইজরের একজন। ঝটপট তার ছবি তুলে নিল ও। ভলকানিক্ লেকে এই লোকের উপস্থিতিই প্রমাণ করে দিচ্ছে, এটা কোবায়াশির অপারেশন।

ওয়াকি-টকি হাতে দুজন সার্ভেয়ারের সঙ্গে কথা বলছে জাপানি সুপারভাইজর, সামনের ওঅর্কটেবিলে একটা ম্যাপ বিছানো। টেলিফটো লেন্সের সাহায্যে ম্যাপটা জরিপ করল রানা। নানা ধরনের মার্কিং দেখা যাচ্ছে। ভুরু কুঁচকে গেল ওর, নির্দিষ্ট কোনও স্পট নয়... লেকের চারপাশেই দাগ দেখতে পাচ্ছে। মাথা তুলে এক্সক্যাভেশন এরিয়ায় নজর বোলাল, সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারল অপারেশনের ছন্নছাড়া ভাবটা। পুরো এলাকাতেই খোঁড়াখুঁড়ি করছে জাপানিরা। তারমানে ইনকাদের গুপ্তধন ঠিক কোথায় লুকানো আছে, তা ওরা জানে না। এখনও খুঁজে পায়নি। তা হলে ওয়্যারহাউসে দেখা সোনার উৎস কী? কোত্থেকে এল ওগুলো?

আনমনে মাথা নাড়ল রানা। এখানে এসে যে-সব প্রশ্নের জবাব পাবে বলে ভেবেছিল, তা আরও জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

ওর ঠিক পাশেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে পিনোঁ আর অঁবিন।

দুজনে নিচু গলায় কী যেন ফিসফিস করছে। ওদের দিকে ঘাড় ফেরাতেই ফরাসি এজেন্টকে তার পাউচে অচেনা একটা ইকুইপমেন্ট ঢোকাতে দেখল... পিনোঁর কাছ থেকে নিয়েছে। কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই ওর দিকে ফিরে মেজর বলল, 'আপনাদেরকে এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, মসিয়ো রানা। মসিয়ো অঁবিন আর আমি ক্যাম্পে ঢুকব। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টেন্টটা স্পট করতে পেরেছি, ওখানে তল্লাশি চালানো দরকার।'

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব। রওনা হবার আগে সবাই মিলে প্ল্যান ঠিক করেছে, তখন ক্যাম্পে ঢোকার কথা একবারও উচ্চারণ করেনি এরা। এখন বোঝা যাচ্ছে, শুরু থেকে এ মতলবই ছিল এদের। রাগে গা জ্বালা করে উঠল রানার। দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'আপনাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

রানার প্রতিক্রিয়াকে গ্রাহ্য করল না পিনোঁ। শান্ত গলায় বলল, 'কার্ল থাকছে আপনাদের সঙ্গে। আমরা যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব।'

'খামোকা কেন ঝুঁকি নিচ্ছেন?' প্রতিবাদের সুরে বলল নেফারতিতি। 'ছবি তোলার কথা ছিল, তোলা হয়েছে। এখন এখান থেকে সরে যাওয়া উচিত।'

'দুঃখিত, ক্যাপ্টেন,' বলল অঁবিন। 'ওখানে আমাকে যেতেই হবে।'

'আপনি আমাদের মিশনকে বিপদের মধ্যে ফেলছেন!'

'ওখানে ঢোকাটাই আমার মিশন,' চাঁছাছোলা গলায় বলল অঁবিন।

আর কাউকে কিছু বলতে না দিয়ে হামাগুড়ি দিতে শুরু করল সে আর মেজর পিনোঁ। জ্বালামুখের পাড় থেকে ঢাল বেয়ে নামতে থাকল শত্রুপক্ষের ক্যাম্পের দিকে। চুপচাপ ওদের দিকে তাকিয়ে রইল রানা। সৈকতে পৌঁছে সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখা

কতগুলো ফিউয়েল ড্রামের পিছনে ক্ষণিকের জন্য বিরতি নিল দুজনে, তারপর দৌড়ে পার হতে লাগল একটার পর একটা তাঁবু। প্রতিটার পিছনে মুহূর্তের জন্য থামছে, উঁকি নিয়ে দেখে নিচ্ছে আশপাশ, তারপর আবার ছুটছে।

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টেন্টটা রানাও চিনতে পেরেছে, ওটার সামনে দাঁড়িয়েই কথা বলছিল জাপানি সুপারভাইজর। তাঁবুটার কাছাকাছি একটা বালিয়াড়ির পিছনে অঁবিন আর পিনোঁকে থামতে দেখে আনমনে মাথা নাড়ল ও। আরও প্রায় ত্রিশ মিটার পেরুতে হবে ওদেরকে, পুরোটাই ফাঁকা জায়গা। সবার অলক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। নিচু গলায় গাল দিয়ে উঠল ও। দুই ফরাসি কেন এই ঝুঁকি নিচ্ছে জানে না, কিন্তু ওরা যে মস্ত ভুল করছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করেছে, আর চুপ করে থাকা চলে না, পরিস্থিতির দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেবার সিদ্ধান্ত নিল ও।

উপুড় হওয়া লিজনেয়ারের দিকে ঘাড় ফেরাল রানা। 'কার্ল, চপারটাকে ডাকো। এখুনি আসতে বলো এখানে।'

'কেন?' বিস্ময় ফুটল কার্লের কণ্ঠে। 'মেজর পিনোঁ একটু পরেই চলে আসবেন।'

'তোমার মেজর একটু পরেই ধরা পড়বে। কথা বাড়িয়ো না, চপারটাকে ডাকো!'

চোদ্দ

আবারও প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল কার্ল, বাধা পেল কোমরে ঝোলানো রেডিও সেট খড়খড় করে ওঠায়। স্পিকারে শোনা গেল দিদিয়েরের কণ্ঠ, যাকে যোডিয়াকের পাহারায় রেখে আসা হয়েছে।

'মেজর পিনোঁ, দিদিয়ের বলছি। সশস্ত্র একটা টহল দল উদয় হয়েছে এখানে। ওদের চোখ ফাঁকি দেবার জন্য আমি সরে এসেছি, কিন্তু খালের পার ধরে ওরা যদি এগোতে থাকে, যোডিয়াকটা দেখে ফেলবে। কী করব?'

একটু অপেক্ষা করল কার্ল, কিন্তু রেডিওতে পিনোঁর গলা শোনা গেল না। জ্বালামুখের ভিতরে সম্ভবত রেডিও কমিউনিকেশন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। খানিক পরে রানার ইশারা পেয়ে রেডিও মুখের কাছে তুলল। 'দিদিয়ের, কার্ল বলছি। শত্রুদের ক্যাম্পে ঢুকেছেন মেজর, কথা বলতে পারবেন না।'

'কিন্তু তাঁর পরামর্শ দরকার আমার!'

কী বলবে বুঝতে পারল না কার্ল। ওদের অসহায়ত্ব বুঝতে পারছে রানা—দুজনেই সৈনিক, হুকুম তামিল করে অভ্যস্ত; সিদ্ধান্ত নিতে জানে না। দেরি না করে কার্লের কাছ থেকে রেডিওটা নিয়ে নিল ও।

ট্রান্সমিট বাটন টিপে বলল, 'দিদিয়ের, দিস ইজ রানা। দলটা

কতজনের?’

‘চারজনকে দেখেছি আমি।’

‘দূর থেকে খতম করতে পারবে?’

‘উঁহুঁ। সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, গাছপালার কাভার ব্যবহার করছে।’

‘শিট! তা হলে পিছু হটা ছাড়া উপায় নেই।’ রেডিও ফিরিয়ে দিল রানা। ‘চপারকে ডাকো, কার্ল! দেরি কোরো না!’

‘কিন্তু...’

‘ড্যামিট, কার্ল!’ বলে উঠল নেফারতিতি। ‘তর্ক কোরো না! মেজর রানার কথা শোনো!’

রানার মুখের দিকে একবার চাইল কার্ল। শ্রাগ করে মুখের কাছে আবার রেডিও তুলল, ‘অপেক্ষা করো, দিদিয়ের।’ তারপর চ্যানেল বদলে ডাকতে শুরু করল হেলিকপ্টারকে, ‘বার্ড ওয়ান... বার্ড ওয়ান, দিস ইজ গ্রাউণ্ড। কাম ইন, প্লিজ। তোমাকে আমাদের দরকার। ওভার।’

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল পাইলট। ‘দিস ইজ বার্ড ওয়ান। তোমাদের কথাবার্তা আমি শুনতে পেয়েছি... ইঞ্জিনও চালু করে দিয়েছি। ই.টি.এ. বিশ মিনিট। কোথায় পিকআপ করব তোমাদের?’

‘সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। আগে আকাশে ওড়ো, আমি একটু পরে তোমাকে ইভ্যাক পয়েন্ট জানাচ্ছি।’ আবার চ্যানেল বদলাল কার্ল। ‘দিদিয়ের, সিচুয়েশন রিপোর্ট দাও। শত্রুরা কোথায়?’

‘চার মিনিটের মধ্যে আমার কাছাকাছি পৌঁছুবে। চেষ্টা করলে পালিয়ে যেতে পারি, কিন্তু বোটটা সরাবার উপায় নেই।’

কার্লের কাছ থেকে সেটটা আবার নিল রানা। বলল, ‘দিদিয়ের, আর যা-ই ঘটুক, ওরা যেন কিছুতেই বেস ক্যাম্পের

সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারে। তা হলে নির্ঘাত মরব আমরা!'

'কী করতে বলেন আমাকে, মসিয়ো রানা?'

'ওদের রেডিওম্যানকে খতম করো, তারপর গা ঢাকা দাও জঙ্গলে। যদি সম্ভব হয় তো দূরে চলে যেয়ো। আমরা ফেরার পথে তোমাকে তুলে নেব।'

'ঠিক আছে।'

নীরব হয়ে গেল রেডিও। কয়েক মুহূর্ত পর দূর থেকে ভেসে এল ফামাস অ্যাসল্ট রাইফেলের গুঞ্জন—টহল দলের উপর গুলি চালাচ্ছে দিদিয়ের। তার জবাবে আরও কিছু গুলি ছোঁড়া হলো। উঁচুতে থাকায় আবছাভাবে শোনা যাচ্ছে শব্দগুলো।

নীচে তাকাল রানা। এক্সক্যাভেটিং ইকুইপমেন্টের গগনবিদারী শব্দের কারণে ক্যাম্পের লোকেরা শুনতে পাচ্ছে না কিছু। তবে এ-অবস্থা বেশিক্ষণ থাকবে না। দিদিয়ের পিছু হটলেই রেডিও উদ্ধার করবে টহল দলের বাকিরা। ক্যাম্পে রিপোর্ট করবে। অঁবিন আর পিনোঁ ফাঁদে পড়ে গেছে... ওরা নিজেরাও তা জানে না।

নার্ভাসনেসে আক্রান্ত হলো কার্ল। লিজনেয়ার বাহিনীতে একেবারেই নতুন সে, প্রথম শ্রেণীর ট্রেইনিং পেলেও আগে কখনও সত্যিকার বিপদ দেখেনি। মনে মনে কপাল চাপড়াল, এই মিশনে ভলান্টিয়ার হতে গেল কেন! রানার দিকে তাকিয়ে শ্রদ্ধা জাগল... এতটুকু ঘাবড়ায়নি লোকটা, শান্ত চোখে জরিপ করছে পরিস্থিতি, সম্ভবত প্ল্যান আঁটছে। ওকে দেখে কিছুটা হলেও সাহস পাচ্ছে সে।

হেলিকপ্টারের কথা ভাবল কার্ল—ওদের উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায়। কিন্তু ওটা ওদেরকে তুলবে কোথা থেকে? আদর্শ জায়গা হিসেবে জ্বালামুখের পাড় ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না... কিন্তু সেটা একেবারে উন্মুক্ত। কপ্টারটাকে দেখামাত্র ঝাঁকে

ঝাঁকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করবে শত্রুরা। তা ছাড়া মেজর পিনোঁ আর অঁবিন নীচে রয়ে গেছে... ওদেরকেই বা উঠিয়ে আনবে কীভাবে? অনেক ভেবেও কোনও সমাধান পেল না।

'ইয়ে... মসিয়ো রানা...' ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল সে, 'চপারটাকে কোথায় আসতে বলব?'

'লেকের উপর,' বলল রানা, 'পানিতে থাকব আমরা।'

'কী বললেন?' চমকে উঠল কার্ল।

'ভুল শোনোনি,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা।

সিদ্ধান্তটা যথেষ্ট হিসেব করে নিয়েছে ও। টহল দলের রিপোর্ট পেয়েই জঙ্গলে তল্লাশি চালাবে শত্রুরা, তখন ওদের ক্যাম্পের ভিতরে লুকিয়ে থাকা অনেক বেশি নিরাপদ—কেউ সেটা আন্দাজ করতে পারবে না। সুযোগ বুঝে একটা বোট নিয়ে নেমে পড়া যাবে লেকে, পানির উপর থেকে ওদেরকে তুলে নেয়া সহজ হবে হেলিকপ্টারের জন্য। তা ছাড়া অঁবিন আর পিনোঁকে ফেলে যাওয়াও চলে না। এতক্ষণে পরিষ্কার হয়ে গেছে—রহস্যের চাবিকাঠি রয়েছে ওদের কাছে, সেটা জানতেই হবে রানাকে।

কয়েক সেকেণ্ড দ্বিধা করল কার্ল, কিন্তু বিকল্প কিছু ভাবতে না পেরে রানার নির্দেশ ট্রান্সমিট করল পাইলটের কাছে। একটু পরেই দূর থেকে ভেসে এল চাপা বিস্ফোরণের আওয়াজ। গ্রেনেড... অনুমান করল রানা, দিদিয়েরকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছুঁড়েছে টহল দলের সৈনিকরা। ফরাসি লিজনেয়ার তার আগেই সরে যেতে পেরেছে কি না কে জানে, রেডিও নীরব রইল। থেমে গেল গোলাগুলির আওয়াজও। দিদিয়ের সম্ভবত মারা পড়েছে।

পিছনে খসখসে শব্দ শুনে ঘাড় ফেরাল রানা, তাকাল পাহাড়ের ঢালের দিকে। ঝোপঝাড় নড়তে শুরু করেছে... কেউ উঠে আসছে ওখান দিয়ে। ঝট্ করে পিস্তল বের করল ও, দেরি না করে গুলি ছুঁড়ল ঝোপ লক্ষ্য করে।

'মুভ!' চেঁচাল রানা।

ক্রল করে জ্বালামুখের ভিতরে নেমে গেল নেফারতিতি আর কার্ল, প্রতিপক্ষের দিকে গুলি ছুঁড়ে ওদেরকে সুযোগ করে দিল রানা। একটু পরেই ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে উদ্যত অস্ত্র হাতে বেরিয়ে এল চারজন মানুষ—আরেকটা টহল দল! শেষবারের মত একটা গুলি ছুঁড়ে উঠে দাঁড়াল রানা, ডাইভ দিল সঙ্গীদের পিছনে। ওকে ধাওয়া করে ছুটে এল এক পশলা গুলি, গায়ের উপর দিয়ে চলে গেল ওগুলো।

নেফারতিতি ইতিমধ্যে পিস্তল বের করে ফেলেছে, উপরদিকে ফাঁকা গুলি করল। খপ্ করে ওর কবজি চেপে ধরল রানা, হাতটা নামিয়ে আনল নীচে। ক্যাম্পের লোকজন এখনও কিছু টের পায়নি, কিন্তু জ্বালামুখের ভিতরে গোলাগুলি করলে ওদের অবস্থান ফাঁস হয়ে যাবে এখুনি। টহল দল থেকে রেডিও করবার আগে মূল্যবান কয়েকটা সেকেণ্ড হয়তো পাওয়া যাবে... সেটা কাজে লাগাতে হবে গা ঢাকা দেবার জন্য।

'ওঠো,' এক লাফে উঠে দাঁড়াল রানা। 'ক্রল করবার সময় শেষ।'

ঢাল ধরে ছুট লাগাল ও, পিছু পিছু নেফারতিতি আর কার্ল। পৌঁছে গেল বড় একটা তাঁবুর পিছনে—ওটা ওয়ার্কারদের ডরমিটরি। ঝাঁপ সরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল তিনজনে। দ্রুত নজর বোলাল রানা, সবগুলো বাঙ্ক ফাঁকা, ওয়ার্কাররা খোঁড়াখুঁড়ি করতে গেছে। অল্প সময়ের জন্য হলেও একটা আশ্রয় পাওয়া গেছে।

কার্লের কাছ থেকে রেডিও নিয়ে ডাকল রানা, 'মেজর পিনোঁ, দিস ইজ রানা। কাম ইন!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব শোনা গেল। 'মসিয়ো রানা! হোয়াট দ্য হেল... রেডিও সাইলেন্স ব্রেক করছেন কেন?'

'পরিস্থিতি গুরুতর বলে। আমাদের উপস্থিতি ফাঁস হয়ে

গেছে। দিদিয়ের সম্ভবত মৃত, বোটটাও দেখে ফেলেছে একটা টহল দল। হেলিকপ্টারকে খবর দেয়া হয়েছে, আপনারা ঢালের গোড়ার ডরমিটরি টেণ্টে চলে আসুন। আমাদেরকে পালাতে হবে।'

'কী বলছেন এসব?'

'সামনাসামনি কথা হবে, তাড়াতাড়ি আসুন।'

তাঁবুর ঝাঁপ সরিয়ে বাইরে চোখ রাখছিল নেফারতিতি, রানার কথা শেষ হতেই বলল, 'ওরা খবর পেয়ে গেছে, রানা। ওয়্যারহাউসের ওই সুপারভাইজর চেঁচামেচি করছে। দাঁড়াও... স্যাটেলাইট ফোনে কাকে যেন কল করছে...'

'নিশ্চয়ই নাকামুরাকে,' আন্দাজ করল রানা। 'অঁবিন বা পিনোঁকে দেখতে পাচ্ছ?'

ঝাঁপ আরেকটু ফাঁকা করল নেফারতিতি। 'হ্যাঁ। আসছে ওরা।'

কয়েক মিনিট পরেই হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁবুতে ঢুকল দুই ফরাসি। চোখ-মুখ লাল।

'এসবের মানে কী?' রাগী গলায় বলল অঁবিন। 'আপনারা উপরে অপেক্ষা করলেন না কেন?'

'ওখানে আরেকটা টিম উদয় হয়েছে,' জানাল রানা। 'খেল খতম... পাততাড়ি গোটানো ছাড়া উপায় নেই।'

'আমাদের বোট? দিদিয়ের?' উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল পিনোঁ।

'আশা ছেড়ে দেয়াই ভাল। দিদিয়ের বেঁচে থাকলে যোগাযোগ করবে, তখন নাহয় ওকে তুলে নেব। হেলিকপ্টারটা শীঘ্রি এসে পড়বে। লেকের মাঝখান থেকে আমাদেরকে পিকআপ করবার জন্য বলা হয়েছে পাইলটকে। শত্রুদের রেঞ্জের বাইরে ওটাই একমাত্র খোলা জায়গা।'

‘এ-ই বুঝি আপনার প্ল্যান?’ বাঁকা সুরে জিজ্ঞেস করল অঁবিন। ‘লেকের মাঝখানে যাব কী করে? সাঁতার কেটে?’

‘ডক থেকে একটা বোট চুরি করব,’ রানা বলল। ‘কপাল ভাল হলে গোলমালের মাঝে কেউ খেয়াল করবে না আমাদের।’

অঁবিনকে সন্তুষ্ট মনে হলো না। কিন্তু পিনোঁ বলল, ‘মসিয়ো রানা ঠিকই বলছেন। আর কোনও উপায় নেই। বোটই একমাত্র ভরসা।’

মেকশিফট ডকটা ডরমিটরি টেন্ট থেকে একশো গজ দূরে। তাঁবুর ঝাঁপ সরিয়ে বাইরের পরিস্থিতি যাচাই করে নিল রানা। অস্ত্রধারী প্রহরীরা তল্লাশি শুরু করে দিয়েছে, তবে সেটা ঢালের কাছাকাছি। তাঁবুর কাছে নেই কেউ। হতভম্ব ভঙ্গিতে কিছু শ্রমিক দাঁড়িয়ে আছে ডকের আশপাশে, তবে তাদেরকে গোনায় না ধরলেও চলে।

মুখের কাছে রেডিও তুলল পিনোঁ। ‘বার্ড ওয়ান, দিস ইজ গ্রাউণ্ড। কখন পৌঁছুবে তুমি?’

‘জিপিএস বলছে ছয় মিনিট,’ বলল পাইলট। ‘পাঁচ মিনিটের মধ্যে রোটরের আওয়াজ শুনবেন।’

‘রজার।’

পরক্ষণেই গুলির আওয়াজ হলো। কেউ খেয়াল করেনি তাঁবুর বিপরীত প্রান্তের ঝাঁপ সরিয়ে একজন সৈনিক ঢুকেছে ভিতরে। ওদেরকে দেখতে পেয়েই অটোমেটিক রাইফেল তুলে গুলি চালিয়েছে সে। সবচেয়ে কাছে ছিল কার্ল, তাকেই হজম করতে হলো বুলেটের ধারা। সুতোয় বাঁধা পুতুলের মত নেচে উঠল সে, তারপরেই রক্তাক্ত দেহ নিয়ে আছড়ে পড়ল মাটিতে। বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। পিস্তল তুলে ট্রিগার চাপল ও, কপালে তৃতীয় নয়ন নিয়ে ছিটকে পড়ল কার্লের খুনি।

ঘটনার আকস্মিকতায় থমকে গেছে সবাই। কার্লের পাশে

গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। প্রয়োজন নেই, তবু পালস চেক করল। নিথর হয়ে গেছে নাড়ি, কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রাণ হারিয়েছে তরুণ লিজনেয়ার। তার রাইফেলটা তুলে নিল রানা। আবেগ সংবরণ করে বলল, 'এখানে নিরাপদ নই আমরা, এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে।'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল পিনোঁ। তাঁবুর ঝাঁপ সরিয়ে জরিপ করল পরিস্থিতি। গুলির আওয়াজ শুনেছে শত্রুরা, কিন্তু উৎস ঠাহর করতে পারেনি। ছোটাছুটি করছে এদিক-সেদিক। দৃষ্টিসীমার মধ্যে কয়েকজন জটলা করছে, তবে ডকের দিকটা ফাঁকা। ঘাড় ফিরিয়ে সঙ্গীদেরকে ইশারা দিল সে।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই জ্যা-মুক্ত তীরের মত তাঁবু থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল চার অভিযাত্রী, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগাল ডকের দিকে। হতভম্ব শ্রমিকদেরকে চোখের পলকে পাশ কাটাল, কয়েকজন বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেও তা গ্রাহ্য করল না। ত্রিশ সেকেণ্ডের মাথায় পৌঁছে গেল গন্তব্যে। পিঠে গুলি খাওয়ার ভয় করছিল ওরা প্রতি মুহূর্তে, গুলি আসেনি... তাই বলে বিপদ কাটেনি মোটেই।

চারজনের ভারে দুলতে শুরু করেছে কাঠের তক্তা আর খালি ড্রাম দিয়ে তৈরি ভাসমান ডক, ভারসাম্য রক্ষা করে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ওরা। বড় বোটটার পাশে পৌঁছেই তাতে লাফ দিয়ে চড়ে বসল নেফারতিতি, ব্যস্ত হয়ে পড়ল ইঞ্জিন নিয়ে। ছুরি বের করে বোটের বাঁধন কাটতে শুরু করল অঁবিন। রানা আর পিনোঁ হাঁটু গেড়ে বসল, অ্যাসল্ট রাইফেলের সাইটের মাঝ দিয়ে নজর রাখল সৈকতের উপরে... বিপদ মোকাবেলার জন্য তৈরি। হেলিকপ্টারের পাশে মুভমেণ্ট লক্ষ করল রানা, উড়াল দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে ওটা।

পিনোঁও দেখতে পেয়েছে ব্যাপারটা। দাঁতে দাঁত পিষে বলল,

'আমাদের চপার পৌঁছানোর আগেই ওটা যদি আকাশে ওঠে, আমরা শেষ!'

'প্রার্থনা করুন যেন তেমনটা না ঘটে,' বলল রানা।

বিকট শব্দে জ্যান্ত হয়ে উঠল বোটের ইঞ্জিন, সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে ওটায় উঠে পড়ল দলের তিন পুরুষ সদস্য। পরক্ষণে এক ঝাঁক গুলি ছুটে এল ডক লক্ষ্য করে। ঘাড় ফেরাতেই একদল সৈনিককে দেখতে পেল রানা, তাঁবুর সারির পিছন থেকে বেরিয়ে এসেছে... ছুটে আসছে ওদের দিকে। দলনেতাকে মুখের কাছে রেডিও তুলে চেঁচাতে দেখা গেল।

'মুভ!' গর্জে উঠল পিনোঁ।

থ্রটল দিয়ে সবেগে বোটকে আগে বাড়াল নেফারতিতি, ছোট্ট এক লাফ দিয়ে ছুটতে শুরু করল জলযানটা। ডকে বাঁধা দ্বিতীয় বোটটা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল রানা আর পিনোঁ, খোল ফুটো করে দিতে চায়, শত্রুরা যেন পানিতে নেমে ওদেরকে ধাওয়া করতে না পারে।

সৈকতে দাঁড়ানো হেলিকপ্টারের ডানা ঘুরতে শুরু করেছে, পিছনের হোল্ডে উঠে বসেছে অন্তত ছ'জন অস্ত্রধারী। সেদিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল রানা। ওখানেই বিপদের শেষ নয়, অঁবিনের চিৎকার শুনে সামনে তাকাতেই আরেক দফা পিলে চমকানোর পালা। দ্বীপের পিছন থেকে বেরিয়ে আসছে একটা ইনফ্লেইটেবল বোট, তাতে অস্ত্র হাতে বসে আছে আরও কয়েকজন সৈনিক—ওরা লেকের উল্টোপাশের সৈকতে শ্রমিকদের পাহারা দিচ্ছিল, দ্বীপের আড়ালে থাকায় এতক্ষণ দেখা যায়নি।

'সান অভ আ বিচ!' খিস্তি করে উঠল পিনোঁ।

পলাতকদের দেখতে পেয়েই গুলি ছুঁড়ল বোটের অস্ত্রধারীরা। তবে ওরা রেঞ্জের বাইরে রয়েছে, পানিতে ছোট ছোট ফুলঝুরি তোলা ছাড়া কিছুই করতে পারল না। দ্বিধা ফুটল নেফারতিতির

চোখে—লেকের মাঝখানে যেতে হবে ওদেরকে, কিন্তু সেখানেই উদয় হয়েছে শত্রুরা, কাছে গেলেই গুলি খেয়ে ঝাঁঝরা হয়ে যেতে হবে। দাঁড়িয়ে থাকারও উপায় নেই, পিছন থেকে ছুটে আসছে প্রতিপক্ষের হেলিকপ্টার।

'আমাকে দাও,' বলে থ্রটলে বসল রানা। বোটকে ঘুরিয়ে নিল, এবার ছুটে চলেছে লেকের আরেক প্রান্তে, যেখান দিয়ে জলপ্রপাত হয়ে নামছে পানির ধারা।

'কী করছেন আপনি!' হতভম্ব চোখে রানার দিকে তাকাল অঁবিন।

'লেকের মাঝখানে যাওয়া সম্ভব নয়, সৈকতের দিকেও যাওয়া সম্ভব নয়... এখন ওদিকটাই ভরসা,' তাকে বলল রানা।

'তাই বলে ঝাঁপ দেবেন?'

'উঁহুঁ, যতক্ষণ সম্ভব খোলা জায়গায় থাকতে চাই, যাতে আমাদেরকে পিকআপ করতে পারে আপনাদের পাইলট। ওদিকটা পুরোই ফাঁকা।'

সভয়ে সামনে তাকাল ওর সঙ্গীরা। সিকি মাইল দূরে, জ্বালামুখের উঁচু পাড়ের মাঝখানে বিশাল এক ফাঁক, সগর্জনে উত্তাল ঢেউয়ের আকার নিয়ে পানি ছুটে চলেছে ওদিকে, জলপ্রপাত হয়ে আছড়ে পড়ছে নীচে, উঠে আসছে কুয়াশার মত জলকণা। আবছা হয়ে আছে জায়গাটা। যত এগোচ্ছে, ততই বাড়ছে জলপ্রপাতের গুম গুম আওয়াজ। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল রানা, নাক ঘুরিয়েছে শত্রুদের বোট, ইন্টারসেপ্ট করবার জন্য সবেগে ছুটে আসছে।

'গুলি করুন!' পিনোঁকে বলল ও। 'ওদেরকে কাছে আসতে দেবেন না!'

দেরি না করে রাইফেল তুলল দুই ফরাসি, ট্রিগার চাপতে শুরু করল। রানার রাইফেল নিয়ে ওদের সঙ্গে যোগ দিল

নেফারতিতি। কয়েক মিনিট চলল গুলি-বিনিময়, তারপর হঠাৎ... জলপ্রপাতের আওয়াজ ছাপিয়ে শোনা গেল রোটরের আওয়াজ। কুয়াশার মেঘ ভেদ করে আকাশে উদয় হলো কালচে একটা আকৃতি।

লিজনের জেটরেঞ্জার! ডিটেকশন এড়াবার জন্য অনেক নীচ দিয়ে উড়ে এসেছে পাইলট, একেবারে জ্বালামুখের পাশে এসে উপরে উঠেছে। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে যাচাই করে নিল পরিস্থিতি। অফেন্সিভ কোনও ওয়েপন নেই জেটরেঞ্জারে, কাজেই ধাওয়া করতে থাকা বোটটাকে ঠেকানো সম্ভব নয় তার পক্ষে। রেডিওতে জিজ্ঞেস করল, 'মেজর, কী করতে হবে আমাকে?'

'দাঁড়াতে পারব না আমরা,' মুখের কাছে ওয়াকি-টকি তুলে চেঁচাল পিনোঁ। 'প্রিপেয়ার ফর ফাস্ট এক্সট্র্যাকশন!'

'ইয়েস, স্যর।'

'তাড়াতাড়ি! দেরি করলেই জলপ্রপাত টপকে নীচে পড়ে যাব আমরা।'

ঝটপট দড়ি নামিয়ে দিল পাইলট। একটা চক্কর দিয়ে বোটের সঙ্গে অ্যালাইন করল হেলিকপ্টার। এখন ওদের ঠিক সামনে ভেসে রয়েছে। থ্রটল বাড়িয়ে ঝুলন্ত দড়ির দিকে বোটকে এগিয়ে নিয়ে গেল রানা। পিছন থেকে আবারও গুলি করল শত্রুরা।

'হারি আপ!' চিৎকার করল রানা। জলপ্রপাতের একেবারে কাছে চলে এসেছে বোট; ইঞ্জিনের প্রয়োজন নেই, স্রোত এখন তুমুল বেগে ওদিকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে ওদেরকে।

গতি অ্যাডজাস্ট করে বোটের উপরে এসে গেল জেটরেঞ্জার। দু'পাশ থেকে ঝুলছে নায়লনের দুটো রোপ, রোটরের ডাউনড্রাফটে সাপের মত কিলবিল করছে। একটা দড়ি ধরে ফেলল পিনোঁ, হুকের সাহায্যে আটকে ফেলল হারনেসে, কিন্তু অন্যটা রয়ে গেল নাগালের বাইরে। ভীষণভাবে দোল খেয়ে

আচমকা ওটা আঘাত হানল নেফারতিতির পিঠে। হুমড়ি খেয়ে বোটের কিনার টপকে পড়ে যাবার উপক্রম হলো ওর, খপ্ করে পিছন থেকে ওর বেল্ট ধরে ফেলল রানা, বাঁচাল ভয়ানক পরিণতির হাত থেকে।

'থ্যাঙ্কস্,' ঘাড় ফিরিয়ে কাঁপা গলায় বলল নেফারতিতি।

'মেনশন নট,' সংক্ষেপে বলল রানা। 'কিন্তু সাবধান থেকো।'

পিছন থেকে আবার গুলি করা হলো, ঠক ঠক শব্দে বোটের গায়ে বিঁধল কয়েকটা বুলেট। কোর্স বদলে একটু বাঁয়ে সরে এল রানা, মুক্ত দড়িটা যাতে দোল খেয়ে ওদের উপরে চলে আসে। তা-ই ঘটল। এবার তৈরি ছিল নেফারতিতি, নাগালে পেয়েই শক্ত হাতে ধরে ফেলল ওটা, হারনেসের হুকে আটকে ফেলল।

শত্রুদের উদ্দেশে গুলি ছুঁড়ছে অঁবিন, তাকে লক্ষ্য করে চেঁচাল রানা, 'অঁবিন, কী করছেন? জলদি দড়ি ধরুন!'

মাথা ঘুরিয়ে আঁতকে উঠল ফরাসি এজেন্ট—জলপ্রপাত আর মাত্র পঞ্চাশ ফুট দূরে... ভীষণ বেগে সেদিকে ছুটে চলেছে বোট। পড়িমরি করে প্রথমে দড়িটা ধরে ফেলল সে। ব্যস্ত হয়ে পড়ল হুক আটকানোয়।

জলপ্রপাতের ডগায় প্রবল আক্রোশে গর্জে উঠছে পানি, বড় বড় ঢেউয়ের মাঝে পড়ে ঝাঁকি খেতে লাগল বোট। ওটাকে স্থির রাখাই মুশকিল। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হাল ধরে থাকল রানা; পানির পতন যখন মাত্র পনেরো ফুট দূরে, তখন ঝাঁপ দিল দড়ি লক্ষ্য করে, দু'হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে ফেলল ওটা। কয়েক সেকেণ্ড পরেই পায়ের তলা থেকে সরে গেল ওদের বাহন, এক ঝটকায় চার আরোহীকে শূন্যে তুলে ফেলল জেটরেঞ্জার। ঝুলন্ত অবস্থায় পাক খেতে খেতে হারনেসের হুক আটকাল রানা, তারপর তাকাল পিছন দিকে। ওদের বোট জলপ্রপাত টপকে নীচে পড়ে যাচ্ছে। ক্ষণিকের জন্য যেন বাতাসে ভেসে রইল, তারপর পানির

প্রবল ধারার সঙ্গে পাহাড়ি ধাপে আছড়ে পড়ল ওটা, টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে গেল চারদিকে। ভাঙা টুকরোগুলো এরপর ভাসতে ভাসতে রওনা হলো জলপ্রপাতের দ্বিতীয় ধাপের দিকে।

মৃদু চিৎকার শুনে লেকের দিকে নজর ফেরাল রানা। নিজেদের বোট নিয়ে যুঝছে শত্রুরা—স্রোতের গতি-প্রকৃতি বা শক্তি সম্পর্কে আঁচ করতে পারেনি, চলে এসেছে জলপ্রপাতের বড্ড কাছে; এখন ইঞ্জিনের পুরো শক্তি খাটিয়েও কিছুতেই ফিরতে পারছে না। প্রমত্তা পানি বোটটাকে নিয়ে চলেছে জলপ্রপাতের কিনারে। মায়াই হলো রানার, কিন্তু কিছুই করার নেই। কয়েক সেকেণ্ড পরেই জলপ্রপাতের চূড়া থেকে নীচে খসে পড়ল ওদের বোট, ছিটকে পড়ল মানুষগুলো, গলা ফাটিয়ে আর্তনাদ করছে। দূর থেকে মনে হলো হাত-পা ছুঁড়তে থাকা কতগুলো পুতুল যেন। নীচে আছাড় খেতেই থেমে গেল সেই আর্তনাদ। চোখ ঘুরিয়ে নিল রানা।

শরীরের ওজনে হারনেসের স্ট্র্যাপ মাংস কেটে বসে যাচ্ছে কাঁধ, কোমর আর উরুতে। বাতাসের তোড়ে পেণ্ডুলামের মত দুলছে ওরা চারজন। বাড়তি ওজনের টানে ব্যালান্স ঠিক থাকছে না জেটরেঞ্জারের, নড়ে উঠছে বার বার। কোর্স মেইনটেন করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে পাইলট।

রানার ঠিক উপরে ঝুলছে পিনোঁ। তার দিকে মুখ তুলে গলা চড়িয়ে ও বলল, 'উপরে উঠুন, মেজর! এভাবে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। ওদের কপ্টারটা এক্ষুণি চলে আসবে। আমাদেরকে এভাবে ঝুলিয়ে রেখে ম্যানুভার করতে পারবে না পাইলট।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ধীরে ধীরে দড়ি বাইতে শুরু করল পিনোঁ। রানা তাকাল নেফারতিতির দিকে। চুলের বাঁধন খুলে গেছে, বাতাসে উড়ছে ওর এলোচুল, অদ্ভুত সুন্দর লাগছে! পরক্ষণে সচেতন হলো, শাসন করল মনকে—এখন কি রোমাণ্টিক হবার

সময়? নেফারতিতির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই একটু হাসল। ইশারায় উপরে উঠতে বলল ওকে। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল মেয়েটা। অঁবিনও দেখেছে ইশারাটা, বুড়ো আঙুল তুলে বুঝতে পেরেছে বলে সঙ্কেত দিল।

বাতাসের তীব্র অত্যাচার অগ্রাহ্য করে ইঞ্চি ইঞ্চি করে উঠতে থাকল চারজনে। হাত-পায়ের পেশিতে খিল ধরে গেল, তাই বলে থামল না। দাঁতে দাঁত পিষে ক্লাইম্ব করে চলল। যেন অনন্তকাল পরে জেটরেঞ্জারের রিয়ার কেবিনে উঠে এল ওরা, ওখানে পৌঁছেই সটান হয়ে শুয়ে পড়ল মেঝেতে। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক, কাঁপছে হাত-পা।

একটু স্থির হয়ে উঠে বসল রানা। দৃষ্টি নিক্ষেপ করল আগ্নেয়গিরির দিকে। জ্বালামুখের ঠিক উপরে, আকাশের গায়ে ফুটে উঠেছে একটা কালো বিন্দু, ধীরে ধীরে আকারে বড় হচ্ছে ওটা। ছুটে আসছে ওদেরকে লক্ষ্য করে। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও।

বিপদ কাটেনি এখনও।

পনেরো

এক হাতে নিজেদের চপারের ডোর ফ্রেম ধরে বকের মত গলা বের করে রেখেছে ক্যাপ্টেন হারুকি, আরেক হাত দিয়ে চোখে ঠেকিয়ে রেখেছে বিনকিউলার। র‍্যাপেলিং করে প্রতিপক্ষের চার

সদস্যকে তাদের হেলিকপ্টারে উঠে যেতে দেখল। শত্রু হলেও ওদের কর্মকাণ্ড মুগ্ধ করছে তাকে। দড়ি বেয়ে এভাবে একটা উড়ন্ত কপ্টারে চড়া সহজ কাজ নয়, তাও আবার বাতাসের বিপরীতে।

প্রফেশনাল দৃষ্টিতে বিচার করলে পুরো অপারেশনটার জন্য ওদের প্রশংসা না করে উপায় নেই। ছোট্ট একটা দল, মাত্র ছ'জন সদস্য... যদিও দু'জনকে হারিয়েছে, তারপরেও ওদের সাফল্যকে অগ্রাহ্য করা যায় না। নিরাপত্তায় বিন্দুমাত্র ছাড় দেয়নি হারুকি, কিন্তু ওর নিজের হাতে সাজানো নিখুঁত সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেণ্ট ভেদ করেছে এরা। ঢুকে পড়েছে ক্যাম্পে, কী করেছে না করেছে খোদাই জানে... এরপর কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগে বেরিয়েও গেছে! পলায়ন-পর্বটা ছিল সবচেয়ে দর্শনীয়, রীতিমত দুঃসাহসের কাজ। হারুকির সঙ্গে নিজেদের হেলিকপ্টার না থাকলে এতক্ষণে ওরা পগার পার হয়ে যেত। বাহবা দিতেই হচ্ছে।

তবে চিন্তিত নয় হারুকি, কারণ এতকিছুর পরেও জয় তারই হবে। পালাতে পারবে না অচেনা প্রতিপক্ষ। একটা চপার নিয়ে ইতিমধ্যে ধাওয়া শুরু করেছে সে, কয়েক মিনিটের ভিতর হেভি মেশিনগান-সহ আরও দুটো হেলিকপ্টার টেকঅফ করবে কোবায়াশির ফ্যাসিলিটি থেকে... রেডিওতে মেসেজ পাঠানো হয়েছে। ওদের তিনটে হেলিকপ্টারের মাঝখানে ফাঁদে পড়ার দশা হবে প্রতিপক্ষের।

কোনও সন্দেহ নেই হারুকির মনে, ওয়্যারহাউসের অনুপ্রবেশকারী আর আজকের লোকগুলো একই দলের। সাধারণ কেউ নয় এরা, চালচলনে প্রশিক্ষিত কমাণ্ডোর ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু কোথাকার কমাণ্ডো? সেটাই জানতে হবে তাকে। মি. নাকামুরার গোপন অপারেশনের কতটুকু এরা জেনে ফেলেছে, সেটা কার কার কাছে ফাঁস করেছে—সব উত্তর পেতে হবে তাকে। আর

সেজন্যে ওদের অন্তত একজনকে জ্যান্ত পাকড়াও করবার চেষ্টা করতে হবে। শেষ পর্যন্ত যদি সেটা সম্ভব না-ই হয়, কপ্টারটাকে ধ্বংস করে দিতে হবে। আর যা-ই ঘটুক, ওদেরকে পালাতে দেবে না সে।

পিছিয়ে এসে সিটে হেলান দিয়ে বসল ক্যাপ্টেন হারুকি। বিনকিউলার নামিয়ে হাতে তুলে নিল নিজের সাবমেশিনগান।

গুড়গুড় করে মেঘ ডাকল, পরমুহূর্তেই ঝমঝমিয়ে নামল বৃষ্টি। দরজা না থাকায় অবাধে প্যাসেঞ্জার কেবিনে ঢুকছে বৃষ্টির ছাঁট, ভিজিয়ে দিচ্ছে আরোহীদেরকে। ঘাড় ফিরিয়ে সঙ্গীদের দিকে তাকাল রানা। বিশ্রাম নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসেছে সবাই।

'সবাই ঠিক আছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

পিনোঁ কিছু বলল না, তবে অঁবিন আর নেফারতিতি মাথা ঝাঁকাল।

'বোটটা দারুণ হ্যাণ্ডেল করেছেন,' প্রশংসার সুরে বলল ফরাসি এজেন্ট। 'আপনার কারণেই ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছি, মসিয়ো রানা।'

'ওসব নিয়ে পরে কথা বলা যাবে,' তার দিকে ঘুরল রানা। 'তার আগে জানতে চাই, আপনারা দুজন ক্যাম্পের ভিতরে করছিলেনটা কী?'

'পরে বলব।' হামাগুড়ি দিয়ে ককপিটের দিকে এগোবার চেষ্টা করল অঁবিন। পাইলটের পাশে... নিজের পুরনো সিটে ফিরে যেতে চায়।

তাকে বাধা দিল নেফারতিতি। 'আপনি হেলিকপ্টার চালাতে জানেন?'

মাথা নাড়ল অঁবিন।

'ওখানে তা হলে আমাকে যেতে দিন। ঝড় শুরু হয়েছে;

পিছনের দরজাদুটো না থাকায় আমাদের ব্যালান্স আর স্পিড... দুটোই অ্যাফেক্টেড। আপনার পাইলটের সাহায্য দরকার।'

'আপনি কো-পাইলট হতে চাইছেন? ফ্লাই করতে পারেন?'

সায় জানাল নেফারতিতি।

আপত্তি না জানিয়ে রাজি হয়ে গেল অঁবিন। 'বেশ, যান।'

নেফারতিতি ককপিটে ঢুকে গেলে প্যাসেঞ্জার কেবিনের র‍্যাক থেকে দু'জোড়া হেডসেট নামাল সে। একজোড়া রানাকে দিল, অন্যজোড়া নিজে পরে কথা বলতে শুরু করল ওদের অস্ট্রেলীয় পাইলটের সঙ্গে। পিনোঁ একচুল নড়ল না, দুই সঙ্গীকে হারিয়ে ভীষণ নাড়া খেয়েছে সে। সত্যিকার একজন সৈনিকের জন্য তার সহযোদ্ধারা পরিবারের মত। শোকে মূহ্যমান হয়ে গেছে সে।

অস্ট্রেলীয় পাইলটের নাম কনরাড, হেডসেটে তার কাছে পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইল অঁবিন।

'অন্য চপারটার থেকে পাঁচ মিনিট এগিয়ে আছি আমরা, স্যর,' ফরাসি ভাষায় বলল পাইলট, কড়া অস্ট্রেলীয় টান। 'ওটাকে *গ্যাযেল* মডেলের বলে মনে হলো আমার কাছে। জেটরেঞ্জারের চেয়ে দ্রুত ছুটতে পারে। ঝড়ের কাভার ব্যবহার করছি আমি, কিন্তু এই কাভার বেশিক্ষণ টিকবে না।'

'কী করা যায়?' পরামর্শ চাইল অঁবিন।

সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকি খেলো জেটরেঞ্জার, আচমকা বাতাসের ডাউনড্রাফটে পড়ে নেমে এল প্রায় পঞ্চাশ ফুট। বামদিক থেকে বাতাস বইছে, কিন্তু ঝড়ের ঝাপটা আসছে চারদিক থেকেই। পুরো আকাশ জুড়ে যেন তাণ্ডব শুরু হয়েছে। কনরাডের ডানপাশের সিটে কণ্ট্রোল আঁকড়ে ধরে বসে আছে নেফারতিতি, পাইলটকে সাহায্য করতে তৈরি। ফরাসি না বোঝায় ইংরেজিতে জানতে চাইল কী নিয়ে কথা হচ্ছে।

'আমরা আমাদের অপশন নিয়ে ভাবছি, ক্যাপ্টেন শেফার্ড,'

বলল কনরাড। 'পিছনের গ্যাযেলটা ধরে ফেলবে আমাদের... ঝড়ের কাভার নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছুনো সম্ভব নয়।'

'আরও বিপদ আছে,' রানা বলল। 'পোর্টে আরও চপার আছে কোবায়াশির। ওদের জায়গায় আমি থাকলে ওগুলোকেও পাঠাতাম আমাদের ইন্টারসেপ্ট করতে।'

'এ তো দেখছি উভয় সঙ্কট!' বলল নেফারতিতি। 'কোথায় যাব আমরা?'

ঠোঁট কামড়ে একটু ভাবল রানা। তারপর বলল, 'চেপো-র দিকে যাওয়া ঠিক হবে না, বড্ড নির্জন ওদিকটা। তারচেয়ে কণ্টিনেণ্টাল ডিভাইডের রিজের দিকে যাওয়া যাক। কপাল ভাল হলে গ্যাযেলটাকে ফাঁকি দেয়া যাবে, ক্যানাল পেরিয়ে পশ্চিম দিক থেকে ঢুকতে পারব পানামা সিটিতে। বাকি চপারগুলো যদি আমাদেরকে নাগালেও পায়, টোকুমেন এয়ারপোর্টের রেডার কাভারেজের ভিতরে হামলা করবার সাহস পাবে না।'

মনে মনে পানামার ম্যাপ স্মরণ করল নেফারতিতি। 'পোর্টের চপারগুলোকে পাশ কাটাতে চাইছ তুমি?'

'হ্যাঁ। খোলা বা নির্জন জায়গায় কোনও আশা নেই আমাদের। নিশ্চিন্তে আক্রমণ করতে পারবে ওরা। তাই এমন কোথাও যাওয়া দরকার, যেখানে গোলাগুলি শুরু করবার আগে দশবার ভাবতে হবে ওদেরকে।'

'তা-ই করো!' পাইলটকে নির্দেশ দিল অঁবিন।

কপ্টারকে উত্তরদিকে ঘোরাল কনরাড, দ্রুত কমিয়ে আনল উচ্চতা। উইণ্ডশিল্ড ভেদ করে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাচ্ছে সামনে, দেখতে চাইছে কণ্টিনেণ্টাল ডিভাইডের পর্বতমালা, শিরদাঁড়ার মত গোটা পানামার মাঝ দিয়ে মাথা তুলে রেখেছে এই পাহাড়সারি।

মাথায় হেডফোন পরল মেজর পিনোঁ, টেনে তুলে নিল

র‍্যাপেলিঙের দড়িদুটো। ওগুলোকে সেফটি লাইন হিসেবে ব্যবহার করল পিছনের তিন আরোহী, নিজেদেরকে বেঁধে ফেলল কেবিনের কাঠামোর সঙ্গে। একটু পরেই ইভেসিভ ম্যানুভার শুরু করবে ওদের পাইলট, দরজা না থাকায় গড়িয়ে বাইরে পড়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাইরে নজর বোলাল রানা—বৃষ্টির তোড় বেড়েছে, আধমাইলের বেশি দৃষ্টি চলে না। এর মাঝে দেখা নেই ধাওয়ারত গ্যাযেলের। তাই বলে নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই, হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাতেই দূরে ভেসে উঠল ওটার আবছা কাঠামো, পরক্ষণে হারিয়ে গেল অন্ধকারে। অনেকটাই এগিয়ে এসেছে। ঘুরপথে যাচ্ছে ওরা, অন্তত এক ঘণ্টা লাগবে ক্যানালে পৌঁছুতে, তারপর পানামা সিটি কয়েক মিনিটের পথ। ততক্ষণ কি এড়িয়ে থাকা যাবে শত্রুদের?

অলটিচ্যুড আরেকটু কমাল পাইলট। নীচের টপোগ্রাফি পরিষ্কার হলে একটা বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়ল পর্বতমালার ভিতরে। আঁকাবাঁকা গিরিখাত ধরে বিপজ্জনক গতিতে ছুটে চলল জেটরেঞ্জার। দু'পাশে গাছপালায় ছাওয়া পাহাড়ি ঢাল, তার ওপর বর্ষণমুখর আবহাওয়া... যে-কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। পেটের ভিতরে সুড়সুড়ি অনুভব করল রানা।

ঘন ঘন মোড় নিচ্ছে হেলিকপ্টার, মাংস কেটে বসে যাচ্ছে সেফটি লাইনের বাঁধন। ব্যালান্স রাখার জন্য একটা সিটের পায়া আঁকড়ে ধরল ও। তারপরেও রেহাই নেই, প্রতি মুহূর্তে এদিক-সেদিক ছিটকে যেতে চাইছে দেহ। একবার খোলা দরজা দিয়ে ঊর্ধ্বাঙ্গ বেরিয়ে গেল, আরেকবার মাথা গিয়ে ঠোকর খেলো প্যাসেঞ্জার কেবিনের ছাতে, পরক্ষণে অঁবিনের গায়ে আছড়ে পড়ল ও। ব্যথায় একসঙ্গে ককিয়ে উঠল দুজনেই। মনে হলো যেন নিয়ন্ত্রণহীন কোনও রোলার কোস্টারে উঠেছে ওরা।

হেডফোনে কনরাড আর নেফারতিতিকে পাইলটসুলভ ভাষায় আলোচনা করতে শুনছে রানা, কিন্তু সেদিকে মনোযোগ দিল না। মনোযোগ দিচ্ছে ফুরসত পেলেই কপ্টারের পিছনের আকাশে নজর বোলাতে। একে একে ত্রিশ মিনিট পেরিয়ে গেল, একবারও গ্যাযেলকে দেখতে পেল না। শেষে যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে যাবে, তখুনি দেখা পেল ওটার। ঝোড়ো মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে, বিজলির আলোয় চকচক করে উঠেছে যান্ত্রিক ফড়িংটার গা। কয়েক সেকেণ্ড পরেই আবার কুয়াশার মাঝে ডাইভ দিয়ে হারিয়ে গেল।

'ওরা এখনও পিছনে আছে,' হেডফোনে শান্ত গলায় জানাল রানা।

'কত দূরে?' জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

'বলা কঠিন। সম্ভবত সিকি মাইল।'

ডাইভ দিল জেটরেঞ্জার, ঢুকে পড়ল নাম না জানা এক উপত্যকায়, নীচে ঘন জঙ্গল। গাছপালার প্রায় মাথা ছুঁয়ে প্রাণপণে ছুট লাগাল।

'হ্যাং অন!' চেঁচাল কনরাড, তারপরেই শুরু হলো অ্যারোব্যাটিক ম্যানুভার। উল্টে-পাল্টে, মোচড় খেয়ে পর্বতমালার গভীর থেকে গভীরে ঢুকে পড়ছে। লোকটার পাইলটিং স্কিল মুগ্ধ করল রানাকে।

কিন্তু গ্যাযেলের পাইলটও কম যায় না, আঠার মত লেগে রয়েছে পিছনে। দু'বার ওটাকে দেখল রানা, ওদেরকে অনুসরণ করে একই পথে ছুটে আসছে। দুর্লঙ্ঘ্য গিরিপর্বত আর ক্রুদ্ধ ঝড়-বাদলের মধ্যে চলছে দুই আকাশযানের ইঁদুর-বেড়াল খেলা। দুটোই এড়িয়ে চলা উচিত সুস্থ মস্তিষ্কের যে-কোনও পাইলটের। আরও পনেরো মিনিট পেরুল। এবার সমীকরণে যুক্ত হলো সাবমেশিনগানের গুলি।

সবার আগে মাযল ফ্ল্যাশ দেখল মেজর পিনোঁ। তবে নির্বিকার রইল সে। এক্সট্রিম রেঞ্জে রয়েছে ওরা, এতদূর থেকে লক্ষ্যভেদ কিংবা হেলিকপ্টারের কোনও ধরনের ক্ষতি করতে পারবে না গুলি। তা ছাড়া এ-মুহূর্তে কিছু করারও নেই। তাই ইশারায় শুধু সঙ্গীদেরকে দেখাল ব্যাপারটা। তারপর ফের দৃষ্টি ফেলল বাইরে। রক্তের গন্ধ পাওয়া শিকারি কুকুরের মত ওদের ট্রেইল ধরে ছুটে আসছে গ্যাযেল, লিজনের অস্ট্রেলীয় পাইলটের প্রতিটি মুভমেণ্ট অনুকরণ করছে নিখুঁতভাবে।

খানিক পরেই পলাতকদের উপরে উদয় হলো আরও দুটো হেলিকপ্টার। আকারে গ্যাযেলের চেয়ে বড়, দুটোতেই রয়েছে ডোর-মাউন্টেড পয়েন্ট থ্রি জিরো ক্যালিবারের হেভি মেশিনগান। অনেক দেরিতে ওগুলোকে দেখল কনরাড আর নেফারতিতি, তখন ওরা ফায়ার ওপেন করেছে। বৃষ্টিতে ঘোলা হয়ে যাওয়া অন্ধকার আকাশ চিরে ছুটে এল দু'জোড়া ট্রেসার বুলেটের ধারা। নেফারতিতির চিৎকার শুনে ঝটকা দিয়ে জেটরেঞ্জারকে কাত করল কনরাড, সরে এল বুলেটের গতিপথ থেকে। প্যাসেঞ্জার কেবিনের তিন আরোহী সেফটি লাইনের চাপে কাতরে উঠল।

কয়েক সেকেণ্ডের ব্যবধানে আবারও গুলি ছুঁড়ল কপ্টারদুটো, আবারও বাউলি কাটার ভঙ্গিতে ফাঁকি দিল কনরাড। খোলা দরজা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল রানা, লিড চপারটাকে চিনতে পারল। কালো রঙের কনভার্টেড হেলিকপ্টার গানশিপ... ওটাই লেকের পানিতে সেদিন ডেপথ চার্জ ফেলেছিল। অলটিচ্যুড কমিয়ে দুটো গানশিপই নেমে এল নীচে, প্রথমটা গ্যাযেলের সামনে অবস্থান নিল, দ্বিতীয়টা চলে গেল পিছনে... একটু কোনাকুনি পজিশনে। চমৎকার ফায়ারিং ফরমেশন। সুযোগ পেলেই একসঙ্গে গুলি চালাতে পারবে সবগুলো চপার।

নিজের রাইফেল থেকে কয়েকটা গুলি করল মেজর পিনোঁ।

পাঁচশো গজ দূর থেকে কিছু করা কঠিন; তবে শত্রুদের জানিয়ে দেয়া হলো যে, ওরা একেবারে নিরস্ত্র নয়। প্রয়োজনে কামড় দিতে পারবে।

'এবার কী?' দমে যাওয়া কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল অঁবিন।

'প্রার্থনা করুন যাতে ওঁদের উপরে বাজ পড়ে,' হালকা গলায় বলল রানা।

ওর রসিকতায় কেউ প্রতিক্রিয়া দেখাবার সময় পেল না, তার আগেই হেডফোনে শোনা গেল নেফারতিতির আঁতকে ওঠা কণ্ঠ।

'ওহ্ মাই গড! কনরাড, সামনে!'

সংকীর্ণ এক উপত্যকায় ঢুকে পড়েছে জেটরেঞ্জার। উপত্যকার মাঝ দিয়ে, এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে চলে গেছে অনেকগুলো হাই-টেনশন ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যায়ার—তিন মাইল দক্ষিণের ম্যাডেন বাঁধ থেকে উৎপাদিত জল-বিদ্যুৎ পরিবাহিত হচ্ছে ওগুলোর মধ্য দিয়ে। ভিজিবিলিটি কম থাকায় দূর থেকে বিদ্যুতের তারগুলো দেখা যায়নি, দেখা গেছে একেবারে শেষ মুহূর্তে... তাও স্রেফ নেফারতিতির কড়া নজরের জন্যে।

'হোল্ড অন্! আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।' বলল কনরাড।

উচ্চতা বাড়াল না সে, বরং পাওয়ার লাইনের সঙ্গে সংঘর্ষ হবার মত কোর্সে এগিয়ে গেল। আশা করছে পিছনের চপারগুলো ওদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, দেখতে পাবে না তারগুলো। প্ল্যানটা সফল হবার জন্য ওদের অন্যমনস্ক থাকাটা খুবই জরুরি।

নব্বুই নট গতিতে, ঝোড়ো হাওয়াকে মোকাবেলা করে যতটা সম্ভব কাছে চলে গেল কনরাড... তারপর এক ঝটকায় উপরে ওঠাল জেটরেঞ্জারকে। নিখুঁত টাইমিং, পাওয়ার লাইনকে মাত্র ছ'ফুট উপর দিয়ে অতিক্রম করল কপ্টারের স্কিড। পিছনের গানশিপের পক্ষে সেটা সম্ভব হলো না, রিঅ্যাকশনের জন্য যথেষ্ট

সময় পায়নি ওটা। কনরাডের ধারণাই ঠিক, পাইলটের নজর সেঁটে রয়েছিল শিকারের উপর, আশপাশে নজর রাখেনি সে। জেটরেঞ্জার আচমকা উপরে উঠে যেতেই দেখতে পেল বাধাটা, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। একটাই উপায় ছিল—নীচে ডাইভ দিয়ে পাওয়ার লাইনের তলায় চলে যাবার চেষ্টা করতে পারত, তবে মাথা কাজ করল না তার। কনরাডকে অনুকরণ করে উপরে ওঠার প্রয়াস নিল, ফলে পাওয়ার লাইনে বেধে গেল স্কিড দুটো।

প্রচণ্ড এক ঝটকায় থেমে গেল গানশিপ। আলোর ফুলঝুরি দেখা দিল। সাপের মত এঁকেবেঁকে শত-সহস্র বিদ্যুৎশিখা উঠে এল ধাতব শরীরটাতে, বয়ে গেল কয়েক লাখ ভোল্টের ইলেকট্রিসিটি। বিদ্যুতের তারে আটকানো বাদুড়ের মত উল্টো হয়ে ঝুলে পড়ল গোটা কাঠামো। বিকট শব্দে ফাটতে শুরু করল ইলেকট্রনিক কনসোলগুলো, সেই সঙ্গে পুড়ে গেল ভিতরের মানুষগুলো। খুলির ভিতরে সেদ্ধ হয়ে গেল মগজ; বাষ্প হয়ে গেল রক্ত; কাবাব হয়ে গেল মাংস। তীব্র তাপে এরপর গলতে শুরু করল অ্যালুমিনিয়ামের ফিউজেলাজ। জ্বলন্ত একটা গোলার মত একটু পরেই লাইন ছিঁড়ে উপত্যকার মেঝেতে আছড়ে পড়ল গানশিপ।

গ্যাযেল আর দ্বিতীয় গানশিপ সময় পেয়েছে বিপর্যয় এড়াবার, তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে দু'দিকে সরে গেছে ওগুলো। কয়েক সেকেণ্ড পর হারিয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে।

'ব্রাভো, কনরাড!' প্রশংসা করল রানা। 'দারুণ দেখিয়েছেন!'

বাকিরাও সুর মেলাল।

শ্যাগ্রেস নদীর উপরে চলে এসেছে ওদের হেলিকপ্টার, দু'মাইল দূরে পানামা ক্যানাল। খালের পানির মূল উৎস এই নদী। পানামা সিটি এখন পঁচিশ মাইল দূরে। প্রতিপক্ষের একটা

চপার ধ্বংস হলেও পুরোপুরি স্বস্তি পাবার উপায় নেই। বাকিদুটো ফিরে আসবে যে-কোনও মুহূর্তে।

তা-ই ঘটল। কয়েক মুহূর্ত পর বাইরের দিকে ইশারা করে চেঁচিয়ে উঠল পিনোঁ। দ্বিতীয় গানশিপ উদয় হয়েছে দৃষ্টিসীমায়। কোনাকুনি পথে এগিয়ে আসছে, যাতে গুলি করবার জন্য যথেষ্ট জায়গা পায় ওটার গানার।

রেঞ্জে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার ওপেন করা হলো। হেভি মেশিনগানের প্রথম গুলিধারা অল্পের জন্য মিস করল জেটরেঞ্জারকে। কয়েক ফুট দূর দিয়ে চলে গেল ওগুলো। দ্বিতীয় দফা গুলি করা হলো কয়েক সেকেণ্ডের তফাতে। এবার তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না। ঠিক ঠিক করে জেটরেঞ্জারের লেজে আঘাত হানল ভারী বুলেট। দুলে উঠল আকাশযানটা। দ্রুত বাইরে দৃষ্টি বোলাল পিনোঁ, কিন্তু তার আগেই পজিশন বদলে আড়ালে চলে গেছে গানশিপ।

'রানা, আপনার পাশ থেকে আসছে!' বলল সে।

ঘাড় ফেরাতেই স্টারবোর্ড সাইডে কালচে একটা আকৃতি আবছাভাবে দেখতে পেল রানা। নিশ্চিত হবার জন্য দেরি করল না, হাতের রাইফেল তুলে গুলি করল তৎক্ষণাৎ। তবে ওর ঠুনকো প্রতিরোধকে পাত্তাই দিল না হামলাকারী গানশিপ। ভারী গুলিবর্ষণ আবারও ক্ষতবিক্ষত করল জেটরেঞ্জারকে।

'কনরাড! নীচে নামুন!' খালি ম্যাগাজিন বদলাতে বদলাতে নির্দেশ দিল রানা।

ডাইভ দিয়ে নদীর পানে নেমে গেল জেটরেঞ্জার। লেভেল হলো পানির কয়েক ফুট উপরে পৌঁছে। কয়েক মুহূর্ত ওভাবে এগিয়ে আবারও কণ্ট্রোল কলাম টানল কনরাড। সামনে একটা ব্রিজ পড়েছে—একপাশে রেললাইন, অন্যপাশে গাড়ি চলাচলের রাস্তা; ডারবি-ঘোড়ার মত টপকে গেল ওটাকে।

বাঁয়ে ঘুরে গেইলার্ড কাটের দিকে এগোবার চেষ্টা করল কনরাড, কিন্তু থমকে গেল কিছুদূর গিয়ে। ওদের পথ আটকে ওখানে হোভার করছে গ্যাযেল। জেটরেঞ্জারকে দেখামাত্র খুলে গেল পিছনের একটা দরজা, সেখান দিয়ে বেরিয়ে এল কয়েকটা সাবমেশিনগানের ব্যারেল। একসঙ্গে ফায়ার করল ওগুলো, চিড় ধরল জেটরেঞ্জারের প্লেক্সিগ্লাসের ক্যানোপিতে। তাড়াতাড়ি দোল খাওয়ার ভঙ্গিতে কপ্টারকে লাইন অভ ফায়ার থেকে সরিয়ে আনল কনরাড, মুখ দিয়ে খিস্তি বেরুচ্ছে।

ফাঁদে পড়ে গেছে জেটরেঞ্জার। ক্যানালের উপরে পৌঁছে গেছে ওরা, দু'পাশে অনেকদূর পর্যন্ত উঁচু পাহাড়ি ঢাল, ভূমিধস ঠেকাবার জন্য কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে। অলটিচ্যুড বাড়িয়ে ঢালের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া যায়, কিন্তু সেক্ষেত্রে কমে যাবে গতি... ওদেরকে নাগালে পেয়ে যাবে সামনে-পিছনের দুই চপার। উপায়ান্তর না দেখে ডানে মোড় নিল কনরাড, ছুটে গেল একটা কণ্টেইনার শিপের দিকে—হেলেদুলে গেইলার্ড কাটের চোক পয়েন্ট থেকে বেরিয়ে এসেছে ওটা।

ক্যানালের সবুজ রঙের পানি থেকে মাত্র পনেরো ফুট উঁচুতে উড়ে চলেছে জেটরেঞ্জার। এখান থেকে সামনের কণ্টেইনার শিপটাকে দেখাচ্ছে লোহা-লক্কড়ে তৈরি নিরেট ও সচল এক পাঁচিলের মত। ডেকের উপরে বহুবর্ণের কণ্টেইনারের স্তূপ যেন আকাশ ছুঁয়েছে, ঢেকে দিয়েছে দিগন্ত। জাহাজের ডানাসদৃশ ব্রিজটা পুরো ষাট ফুট উঁচুতে।

উচ্চতা কমিয়ে জেটরেঞ্জারের পোর্ট কোয়ার্টারে চলে এল গানশিপ, ফায়ার করল মেশিনগান। তৈরি ছিল কনরাড, একপাশে চেপে এড়িয়ে গেল গুলির ধারাকে... লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেটগুলো কণ্টেইনার শিপের পুরু খোলে আঘাত হেনে ফুলকি ওড়াল।

তীব্র বেগে জাহাজের স্টার্ন অতিক্রম করল জেটরেঞ্জার,

আড়াল থেকে বেরোতেই দেখতে পেল একটা ট্যাঙ্কার শিপ—উল্টোদিক থেকে এগিয়ে আসছে। ওটার ঠিক পিছনে রয়েছে একটা বিশাল প্রমোদতরী—সম্পূর্ণ সাদা রঙ করা, পানির বুকে রাজহংসের মত ভেসে চলেছে পেদ্রো মিগুয়েল লকের দিকে।

'এবার কোন্‌দিকে যাব?' ইন্টারকমে জানতে চাইল কনরাড, কণ্ঠে উত্তেজনা।

'ক্রুজ শিপ থেকে দূরে থাকুন,' বলল রানা। 'ওটা যেন ক্রসফায়ারে না পড়ে।'

অস্ফুট আওয়াজ করে অসন্তোষ প্রকাশ করল অঁবিন, বিশাল জাহাজটার পিছনে কাভার নেবার প্রস্তাব দেবে বলে ভেবেছিল সে।

মাথা ঝাঁকিয়ে রানার পরামর্শ মেনে নিল কনরাড। 'অন্য কোথাও যেতে হবে আমাদেরকে।'

'গ্যামবোয়ায় গেলে কেমন হয়?' ম্যাপ দেখে বলল নেফারতিতি। ছোট্ট ওই শহরটায় ক্যানালের ড্রেজিং অপারেশনের হেডকোয়ার্টার, ওখানে হেলিপ্যাড থাকার কথা।

'তা-ই সই,' শ্রাগ করল কনরাড। 'এরচেয়ে ভাল কিছু তো দেখছি না আশপাশে।'

ট্যাঙ্কার আর ক্রুজ শিপের মাঝখানে পাঁচশো গজ ফাঁকা জায়গা। দূরত্বটা পেরুনোর সময় আবারও হামলা চালাল গানশিপ। তবে এবার পিছন থেকে নয়, উপর থেকে। অলটিচ্যুড বাড়িয়ে ওদের উপরে চলে এল ওটা, ফায়ার করল হেভি মেশিনগান থেকে।

পানিতে পড়ল বেশিরভাগ শেল, তবে যে-ক'টা টার্গেটে আঘাত হানল, সেগুলো কম ক্ষতি করল না। গুলি খেয়ে আচমকা কেশে উঠল জেটরেঞ্জারের ইঞ্জিন, ঝাঁকি খেলো গোটা কাঠামো।

দুলতে শুরু করল মাতালের মত।

'ইঞ্জিনে লেগেছে!' চেঁচিয়ে জানাল কনরাড। 'অয়েল প্রেশার ড্রপিং!'

ঠোঁট কামড়াল রানা, গ্যামবোয়া এখনও এক মাইল দূরে। শেষ রক্ষা বুঝি আর হলো না। অসহায় বোধ করছে, হাতের রাইফেল কোনও কাজে আসছে না। উপরে পজিশন নেয়ায় গানশিপকে ঘায়েল করা সম্ভব নয়, রাইফেলের ঠুনকো ক্যালিবারের বুলেটকে ঠেকিয়ে দেবে জেটরেঞ্জারের পাক খেতে থাকা রোটর ব্লেডগুলো।

হেভি মেশিনগানের পরের ঝাপটায় এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেল জেটরেঞ্জার—দগদগে ঘায়ের মত অনেকগুলো গর্ত সৃষ্টি হলো পুরো ফিউজেলাজ জুড়ে। রানার মাত্র তিন ইঞ্চি সামনে মেঝে ফুটো করল একটা বুলেট, আরেকটু হলেই ও নিজে ঘায়েল হতো। নাকে ভেসে এল ধাতুর পোড়া গন্ধ। টারবাইনের ছন্দোবদ্ধ আওয়াজে যতি পড়তে শুরু করেছে, ইঞ্জিন থেকে বেরুতে শুরু করেছে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

জেটরেঞ্জারকে স্থির রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ল কনরাডের জন্য, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দুলতে দুলতে আটশো ফুট লম্বা ক্রুজ শিপকে পেরুতে শুরু করল ওটা... পিছনে রক্তক্ষরণের মত রেখে যাচ্ছে ধোঁয়ার রেখা। খোলা দরজা দিয়ে ডেকের উপরে যাত্রীদেরকে বেরিয়ে আসতে দেখল রানা, রেলিঙের পাশে এসে জড়ো হয়েছে, বিস্মিত চোখে দেখছে ওদেরকে। পিছনে বাকি দুটো চপার উদয় হতেই একসঙ্গে সেদিকে ঘুরে গেল সবার মাথা।

দ্রুত ককপিটের গজগুলোর উপর চোখ বোলাল নেফারতিতি। হেডফোনে রানা জিজ্ঞেস করল, 'কী বুঝছ?'

'গ্যামবোয়া পৌঁছুনো আর হচ্ছে না আমাদের,' শান্ত গলায় জানাল তরুণী ক্যাপ্টেন। 'ক্র্যাশ করব যে-কোনও মুহূর্তে।'

'চেষ্টা করলে কয়েক মিনিট ভেসে থাকতে পারব,' বলল কনরাড। 'আপনারা লাফ দিয়ে পানিতে নেমে যেতে পারবেন।'

প্রস্তাবটা পছন্দ হলো না রানার। দুটো কারণ। প্রথমত, হেলিকপ্টারকে বাতাসে ভাসিয়ে রাখবার জন্য কন্ট্রোলে থাকতে হবে কনরাডকে, লাফ দেবার সুযোগ পাবে না সে। মরবে ক্র্যাশ করে। দ্বিতীয়ত, পানিতে লাফ দিলেই যে বাকিরা প্রাণে বাঁচবে, তার গ্যারাণ্টি নেই। ভাসমান অবস্থায় ওদের উপরে গুলি চালাতে পারবে শত্রুরা। সাঁতার কেটে কিছুতেই দুটো হেলিকপ্টারকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়।

'উঁহুঁ, অন্য কোনও প্ল্যান দরকার,' বলল ও।

'আই অ্যাম ওপেন টু সাজেশন্স,' কনরাড বলল।

সেফটি লাইন খুলে ককপিটের মাঝখানে ঊর্ধ্বাঙ্গ গলিয়ে দিল রানা, ব্যস্ত চোখে জরিপ করল সামনেটা। ক্রুজ শিপের মাইলখানেক পিছনে, ক্যানালের বাঁক ঘুরে আরেকটা অতিকায় জাহাজকে বেরিয়ে আসতে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলল কী করতে হবে। পাইলটের কাঁধে টোকা দিয়ে বলল, 'ওদিকে চলুন!'

নতুন জাহাজটা দেখতে অদ্ভুত। যেন একটা জাহাজের খোলের উপরে বিশাল এক চৌকো বাক্স বসিয়ে দেয়া হয়েছে। কোনও পোর্টহোল বা জানালা নেই। সাড়ে সাতশো ফুট দীর্ঘ, প্রস্থে একশো ফুট... প্রায় নব্বুই ফুট উঁচু সুপারস্ট্রাকচার। চৌকো আকৃতিটার একেবারে সামনে, একধাপ উঁচু করে বানানো হয়েছে পাইলটহাউস। পুরো শরীর সবুজ রঙ করা, তবে সেই রঙ ছাপিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বেরিয়ে এসেছে মরিচা। ওয়াটারলাইনের লাল অংশটা অনেকখানি ভেসে উঠেছে পানির উপরে—বোঝা গেল, ধারণক্ষমতার চেয়ে অনেক কম কার্গো বহন করছে জাহাজটা।

অদ্ভুতদর্শন এই জাহাজ চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না রানার—ওটা আসলে একটা অটোমোবিল ক্যারিয়ার... সম্ভবত

আনলোডিং শেষে জাপান বা ইয়োরোপে ফিরে যাচ্ছে। চৌকো আকৃতিটার ভিতরে রয়েছে আট থেকে বারোটা ডেক... র‍্যাম্পের সাহায্যে কানেক্টেড... হঠাৎ দেখায় বহুতল কার পার্কের মত দেখায়। পাঁচ থেকে সাত হাজারের মত গাড়ি বহন করতে পারে এ-সব জাহাজ, বিশ নট বেগে পাড়ি দিতে পারে সাগর। স্টারবোর্ড সাইডে লোডিং র‍্যাম্প রয়েছে, আর ভিতরে রয়েছে সংকীর্ণ রাস্তা... যাতে প্রতিটা গাড়ি ড্রাইভ করে ভিতরের নির্ধারিত পার্কিং স্পেসে নিয়ে যাওয়া যায়।

কাছাকাছি যেতেই অটো-ক্যারিয়ারের স্টার্নের কাছে ইঞ্জিন এগজস্টের ফানেল দেখা গেল। পাশেই রয়েছে একটা অ্যাক্সেস বক্স, তলায় সিঁড়ি... ওখান দিয়ে জাহাজের ভিতরে ঢোকা যায়। ওদিকে ইশারা করল রানা।

'ওখানে ল্যাণ্ড করুন,' কনরাডকে বলল ও। 'জাহাজের ভিতরে ঢুকতে পারলে আশা আছে আমাদের।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কপ্টারকে সেদিকে নিয়ে চলল অস্ট্রেলীয় পাইলট। কয়েক সেকেণ্ড পরেই ওদেরকে লক্ষ্য করে আবারও ছুটে এল হেভি মেশিনগানের গুলি। ভীষণভাবে কেঁপে উঠল জেটরেঞ্জার, কন্ট্রোল থেকে ছুটে গেল কনরাডের দু'হাত, নিজের ঊরু চেপে ধরল সে। আঙুলের ফাঁকে রক্ত দেখতে পেল রানা। তাড়াতাড়ি নেফারতিতিকে বলল, 'নেফি! টেক কন্ট্রোল!'

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল অঁবিন।

'কনরাডের পায়ে গুলি লেগেছে।'

'সিরিয়াস?' উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল মেজর পিনোঁ।

'বুঝতে পারছি না,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কনরাড। 'জিযাস! পা মনে হচ্ছে ছিঁড়ে পড়ে যাবে!'

এক টানে গলায় বাঁধা স্কার্ফ খুলে দিল নেফারতিতি। 'এটা দিয়ে বেঁধে ফেলুন।'

অটোমেটিক রাইফেলের কর্কশ আওয়াজ হলো। রেঞ্জের মধ্যে গানশিপকে দেখতে পেয়ে গুলি ছুঁড়েছে পিনোঁ। খালি করে ফেলল ক্লিপ। পাক খেয়ে পিছিয়ে গেল গানশিপ, সরে গেল লাইন অভ ফায়ার থেকে।

ককপিট থেকে শরীর বের করে আনল রানা। 'গ্যাযেলটা কোথায়?'

'জানি না।' রাইফেলে নতুন ক্লিপ ভরছে পিনোঁ।

'ওটার কথা ভুলে যাও,' হেডফোনে বলল নেফারতিতি। 'গেট রেডি ফর ক্র্যাশ ল্যাণ্ডিং!'

বিপজ্জনক ভঙ্গিতে ঝাঁকি খেতে খেতে অটো-ক্যারিয়ারের দিকে ছুটে চলেছে জেটরেঞ্জার। চকিতে পরিস্থিতি দেখে নিল রানা। তারপর বলল, 'সবাই যার যার অস্ত্র তুলে নিন। ডেকে নামামাত্র সিঁড়ির দিকে ছুট লাগাবেন।'

আবারও কেশে উঠল জেটরেঞ্জারের ইঞ্জিন, আকাশ থেকে খসে পড়তে চাইছে। কন্ট্রোল নিয়ে রীতিমত যুদ্ধ করছে নেফারতিতি; যে-করেই হোক, জাহাজের রেলিং পেরুতে হবে। ওটা এখনও ওদের চেয়ে ত্রিশ ফুট উপরে। ওদিকে তাকিয়ে ঘাম জমল কপালে—যদি উপরে উঠতে না পারে, সরাসরি জাহাজের গায়ে গিয়ে আছড়ে পড়বে কপ্টার, ছাতু হয়ে যাবে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর আচমকা বাড়িয়ে দিল ইঞ্জিনের পাওয়ার, সেইসঙ্গে হ্যাঁচকা টান দিল কন্ট্রোল স্টিকে।

মরিয়ার মত একটা ঝাঁপ দিল জেটরেঞ্জার, কোনোমতে পেরিয়ে গেল অটো-ক্যারিয়ারের রেলিং। পরমুহূর্তেই থেমে গেল রোটর, ভারী পাথরের মত ডেকের উপরে আছড়ে পড়ল হেলিকপ্টারটা।

ষোলো

ডেকের সঙ্গে সংঘর্ষে বিকট আওয়াজ তুলে ভেঙে গেল জেটরেঞ্জারের একপাশের ল্যাণ্ডিং স্ট্রাট, কাত হয়ে বৃষ্টিভেজা ডেকে পিছলাতে শুরু করল গোটা কাঠামো, কয়েক ফুট এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। ঝটপট ফিউয়েল ভালভ বন্ধ করে দিল কনরাড, খোলা দরজা দিয়ে পিছনের তিন আরোহী টপাটপ নেমে পড়ল। জাহাজের দুইশ' গজ দূর থেকে ছুটে আসছে গ্যাযেল। গানশিপটা দেখা যাচ্ছে না, ওটা ডেক লেভেল থেকে নীচে রয়ে গেছে এখনও।

অ্যাকসেস ডোরের দিকে ছুট লাগাল অঁবিন। রানা আর পিনোঁ গেল দুই পাইলটকে সাহায্য করতে। নেফারতিতি ইতিমধ্যে সিটবেল্ট খুলে ফেলেছে, একাই নেমে এল। রানা হাত লাগাল পিনোঁর সঙ্গে, ধরাধরি করে হেলিকপ্টার থেকে বের করে আনল কনরাডকে। ওরা সোজা হয়ে দাঁড়াতেই বিনা নোটিশে জাহাজের পাশ দিয়ে উঠে এল গানশিপ। রোটরের ধাক্কায় বৃষ্টির পানি ছিটাচ্ছে, ধীরে ধীরে পাশ ফিরতে শুরু করেছে, যাতে গানার সহজে গুলি ছুঁড়তে পারে।

স্লিঙে ঝোলানো ফামাস রাইফেল তুলল রানা, গানশিপটা মাত্র পঞ্চাশ ফুট দূরে... এত কাছ থেকে নিশানা মিস করবার প্রশ্নই ওঠে না। রাইফেলটা কোমরের কাছে রেখেই চাপতে শুরু করল

ট্রিগার। গানশিপের ধাতব শরীরে ফুলকি তুলল প্রথম কয়েকটা বুলেট, পরেরগুলো খুঁজে নিল হেভি মেশিনগানের পিছনে বসা গানারকে। গুলির আঘাতে প্রথমে কুঁজো হয়ে গেল লোকটা, পরমুহূর্তে চিৎ হয়ে পড়ল চপারের ভিতরে। ফায়ার ওপেন করবার সুযোগ পায়নি। পাগলের মত ঘুরে গেল গানশিপ, তাড়াতাড়ি সরে গেল দূরে।

'জলদি চলো!' চেঁচিয়ে বলল নেফারতিতি। 'গ্যায়েলটা আসছে!'

দু'পাশ থেকে কনরাডকে ধরল রানা আর পিনোঁ, ছুট লাগাল অ্যাকসেস ডোরের দিকে। পাল্লা খুলে ধরে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে অঁবিন। গ্যায়েলের দিকে ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে ওদেরকে কাভার দিল। স্টেয়ারওয়েলে ঢুকেই এক টানে দরজা আটকে দিল নেফারতিতি, দেয়ালের ব্র্যাকেটে ঝোলানো ফায়ার অ্যাক্স খুলে হাতলের মাঝখানে গুঁজে দিল রানা। না ভেঙে এবার আর ওপাশ থেকে দরজা খুলতে পারবে না শত্রুরা।

এতক্ষণে দম ফেলার ফুরসত মিলল। চারদিকে নজর বোলাল রানা। স্টেয়ারওয়েলটা একটা চওড়া শাফটের মাথায়। একেবারে নীচের ডেক পর্যন্ত এঁকেবেঁকে নেমে গেছে লোহার সিঁড়ি। প্রত্যেক ডেকে রয়েছে ছোট্ট ল্যাণ্ডিং, তার পাশে ভারী দরজা। দরজা গলে একেকটা ডেকে যেতে হয়।

'চলুন, নামি,' বলল ও।

'নীচে কোথাও গা ঢাকা দিতে চাও?' জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

'উঁহুঁ। ওয়াটারলাইনের এক ডেক উপরে লাইফবোট থাকার কথা। রেইলে বসানো থাকে, বাঁধন খুলে দিলে পিছলে নেমে যায় পানিতে। একটায় যদি উঠতে পারি, পালিয়ে যাওয়া সম্ভব।'

'চপারদুটো চুপচাপ পালাতে দেবে আমাদেরকে?' ভুরু

কোঁচকাল পিনোঁ।

'জাহাজের লোকজন ওদেরকে গোলাগুলি করতে দেখেছে, এতক্ষণে নির্ঘাত পোর্ট কন্ট্রোল আর পুলিশে খবর চলে গেছে। ওরা এখন আর খোলা জায়গায় হামলা করবার ঝুঁকি নেবে বলে মনে হয় না। বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদেরকে। ভিতরে থাকলেই বরং বিপদ।'

'বেশ, তা হলে নীচে যাওয়া যাক।'

সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করল ওরা। দুটো ডেক পেরুতেই উপর থেকে ভেসে এল বিস্ফোরণের আওয়াজ। গরম বাতাস বয়ে গেল শাফটের ভিতরে। কী ঘটেছে বুঝতে অসুবিধে হলো না কারও। ল্যাণ্ড করেছে গ্যাযেল। সৈনিকরা নেমে এসেছে। অ্যাকসেস ডোর ভেঙে ধাওয়া করতে চাইছে ওদেরকে।

আহত পাইলটকে বইতে গিয়ে ওদের গতি কমে গেছে, সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেলে ধরা পড়ে যাবে খুব শীঘ্রি। এখুনি স্টেয়ারওয়েল থেকে সরে যাওয়া দরকার। পরের ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছেই বাল্কহেডের গায়ে একটা দরজা দেখতে পেয়ে ওটা খুলে ফেলল রানা, সবাইকে নিয়ে ঢুকে পড়ল ওটা গলে।

ওপাশে কার্গো ডেক। পাল্লা আটকে উল্টো ঘুরতেই চোখে পড়ল বিশাল হোল্ড—আকারে অতিকায় কোনও গুহা যেন। পুরো ডেক জুড়ে সার বেঁধে দাড়িয়ে আছে প্রায় হাজারখানেক ছোটবড় গাড়ি, তারপরেও পুরোটা ভরেনি। ঘন অরণ্যের মত এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো সাপোর্ট কলাম। ছাত বেশ নিচু, যেন নিজের ভারেই ঝুঁকে পড়েছে। আলো বলতে অল্প কিছু লাইট বালব জ্বলছে এখানে-সেখানে। আলোছায়ায় ঢাকা পড়ে আছে গোটা হোল্ড... আধিভৌতিক আবহ বিরাজ করছে। বাতাসে ভাসছে ধাতব গন্ধ। আবছা আলোটা চোখে সয়ে আসতেই হোল্ডের মাঝখানে একটা র‍্যাম্প দেখা গেল, নীচের

ডেকে চলে গেছে। একই রকম আরেকটা র‍্যাম্প নেমে এসেছে উপরের ডেক থেকে।

ঠোঁটের উপর আঙুল তুলে সবাইকে চুপ থাকতে ইশারা করল রানা। কয়েক মুহূর্ত পরেই দরজার ওপাশ থেকে ভেসে এল ধুপধাপ পদশব্দ—ধীরে ধীরে বাড়ল, তারপর আবার কমে গেল। সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে যাচ্ছে শত্রুসৈনিকরা। ওরা যে মাঝখানেই স্টেয়ারওয়েল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, তা বুঝতে পারেনি।

'আমাদেরকে নীচে না পেলেই আবার উপরে উঠে আসবে,' বলল নেফারতিতি। 'এক-এক করে সব ডেকে তল্লাশি চালাবে।'

'জাহাজের ক্রু-দের খুঁজে বের করা দরকার,' মন্তব্য করল অঁবিন।

'না,' আপত্তি জানাল রানা। 'ওদেরকে এর ভেতর জড়ানো ঠিক হবে না। অযথাই খুন হয়ে যাবে ওরা... আমাদেরকে সাহায্য করুক বা না-ই করুক।'

মুখ লাল হয়ে গেল অঁবিনের। 'তা হলে কী করতে চান?'

'আপাতত এখান থেকে সরে যাওয়াই ভাল। নইলে দরজা খোলামাত্র আমাদেরকে খুঁজে পাবে ওরা।'

র‍্যাম্প লক্ষ্য করে হাঁটতে শুরু করল রানা। চঞ্চল দৃষ্টি বোলাচ্ছে চারপাশে। কাজে লাগাবার মত একটা কিছুও যদি পাওয়া যায়! কিন্তু লাভ হলো না। পার্ক করে রাখা গাড়ির জটলা ছাড়া আর কিছুই নেই। একটু পরেই পৌঁছে গেল র‍্যাম্পের সামনে। থামল না, ঢাল ধরে উঠে গেল উপরের ডেকে। কনরাডকে ধরাধরি করে একটু পরেই বাকিরাও পৌঁছুল ওর পাশে।

'কী হলো? কী ঠিক করলে?'

নেফারতিতির প্রশ্নটা কোনও ভাবান্তর সৃষ্টি করল না রানার মাঝে। ওর দৃষ্টি আটকে আছে সামনে পার্ক করা একটা গাড়ির

উপর। ঘন নীল রঙ ওটার, মাথার উপর নিঃসঙ্গ একটা বালব থেকে ছড়ানো আলোয় ঝিকমিক করছে পুরো চেসিস। চোখে প্রশংসা ফুটল ওর। *বেণ্টলি কণ্টিনেণ্টাল আর*-এর সৌন্দর্য সত্যিই নজরকাড়া। দুনিয়ার গাড়িপ্রেমীরা একবাক্যে একে ভেহিকেল ডিজাইনের সবচেয়ে নিখুঁত নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। শুধু গাড়ি নয়, এ এক শিল্প। দেখতে যেমন মনোরম, তেমনি বাহন হিসেবেও অদ্বিতীয় এই গাড়ি। তিন টন ওজন, প্রায় শব্দহীন টার্বো-চার্জড ভি-এইট ইঞ্জিন রয়েছে হুডের তলায়, ঘণ্টায় অনায়াসে দেড়শো মাইল বেগে ছুটতে পারে। অত্যাধুনিক নেভিগেশন সিস্টেম রয়েছে সেই সঙ্গে, ভিতরে রয়েছে আরাম-আয়েশের চূড়ান্ত আয়োজন। একেকটা গাড়ির দাম প্রায় তিন লাখ ডলার, কেনার সামর্থ্য সবার হয় না। নইলে ইয়োরোপ-আমেরিকার ঘরে ঘরে শোভা পেত এই বেণ্টলি। গাড়ির সমঝদার না হলেও এসব জানা আছে রানার।

'চমৎকার গাড়ি,' পিছন থেকে মন্তব্য করল অঁবিন।

আস্তে আস্তে সঙ্গীদের দিকে ফিরল রানা, ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেছে এক টুকরো হাসি। 'এটাকে খানিক সময়ের জন্য ধার নিলে কারও আপত্তি আছে?'

'কীসের জন্য?'

র‍্যাম্পের দিকে ইশারা করল রানা। 'একদম নীচ পর্যন্ত যাওয়া যাবে ওখান দিয়ে। সঙ্গে একজন আহত মানুষ নিয়ে কষ্ট করে হাঁটাহাঁটির প্রয়োজন কী? হাতের কাছে এত চমৎকার গাড়ি যেহেতু আছে?'

'ইঞ্জিন চালু করবেন কীভাবে? এ-ধরনের হাই-এণ্ড গাড়ি চোরাই পদ্ধতিতে স্টার্ট দেয়া যায় না।'

'চাবিটা ভিতরেই থাকার কথা। নইলে কয়েক হাজার চাবি যদি একসঙ্গে রাখা হয়, গোলমাল বেধে যেতে পারে।'

'সত্যি?'

'দেখাই যাক,' বলে বেণ্টলির দরজায় হাত দিল রানা। হাতল ধরে টান দিতেই খুলে গেল ওটা। লক করা হয়নি, চলন্ত জাহাজে গাড়ি চুরির ভয় নেই। চাবিও পাওয়া গেল ইগনিশনে লাগানো অবস্থায়। মোচড় দিতেই মৃদু গুঞ্জন তুলে জ্যান্ত হলো ইঞ্জিন। জানালা দিয়ে মুখ বের করল ও। 'আসুন, বাহন প্রস্তুত!'

পিছনের দরজা খুলে কনরাডকে বসানো হলো ব্যাকসিটে। আহত পায়ে এতক্ষণ টুর্নিকেট বাঁধার সুযোগ পাওয়া যায়নি। এবার শার্টের হাতা ছিঁড়ে খুলে বেঁধে দেয়া হলো। তার দু'পাশে বসল অঁবিন আর পিনোঁ। নেফারতিতি বসল সামনে, রানার পাশে।

'চলো।'

হ্যাণ্ডব্রেক রিলিজ করে গিয়ার দিল রানা, পার্কিং স্পেস থেকে বের করে আনল গাড়ি, মোড় নিয়ে আইল ধরে এগোল, তারপর র‍্যাম্প ধরে নামতে শুরু করল নীচে। পিছনের জানালার কাঁচ নামিয়ে নিয়েছে অঁবিন আর পিনোঁ, সেখান দিয়ে বের করে রেখেছে ফামাস রাইফেলের নল। লড়াইয়ের জন্য তৈরি।

একে একে সাতটা ডেক পেরিয়ে এল বেণ্টলি, এরপর দেখা দিল বিপদ। পরের র‍্যাম্পের দিকে বাঁক নিচ্ছে রানা, এমন সময় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা কতগুলো বিএমডব্লিউ-র আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দুটো ছায়ামূর্তি। চিৎকার শোনা গেল, পরক্ষণে ছুটে এল এক ঝাঁক গুলি। তবে তাড়াহুড়োয় নিশানা ঠিক করতে পারেনি প্রতিপক্ষ, গাড়ির আশপাশ দিয়ে ছুটে গেল লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট। অ্যাকসেলারেটর চেপে ধরল রানা, বনবন করে ঘোরাল স্টিয়ারিং, মাতালের মত স্কিড করে ঘুরে গেল বেণ্টলি। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য ব্রেক কষে গাড়িটাকে পরের র‍্যাম্পের সঙ্গে অ্যালাইন করল ও, তারপর ছিটকে সামনে এগোল।

ততক্ষণে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে তল্লাশি চালাতে থাকা সৈনিকেরা বেরিয়ে এসেছে আড়াল থেকে, একযোগে গুলি ছুঁড়ল তারা। র‍্যাম্প ধরে নেমে যাওয়া বেণ্টলির উপর দিয়ে চলে গেল গুলির ধারা।

'ওরা বুঝে ফেলেছে আমরা কোথায় যাচ্ছি,' চেঁচিয়ে উঠল অঁবিন।

'কিছুই করার নেই,' সংক্ষেপে বলল রানা।

পরের ডেকে সবেগে র‍্যাম্প থেকে নেমে এল বেণ্টলি। মেঝেতে ঘষা খেয়ে ফুলকি তুলল আণ্ডারক্যারিজ। মোড় নেবার সময় নেই, অ্যাকসেলারেটর চেপে উল্টোদিকের র‍্যাম্পের দিকে গাড়ি ছোটাল ও। উপর থেকে বেশ ক'জন সৈনিককে নেমে আসতে দেখল ওই র‍্যাম্প ধরে, হাতে উদ্যত অস্ত্র। গতি কমাল না, দাঁতে দাঁত পিষে অ্যাকসেলারেটর চেপে ধরল আরও।

'গুলি করুন!' চেঁচাল নেফারতিতি।

বলার প্রয়োজন ছিল না, জানালা দিয়ে ইতিমধ্যে শরীরের একাংশ বের করে ফেলেছে মেজর পিনোঁ, ট্রিগার চাপল শত্রুদের লক্ষ্য করে। তার দেখাদেখি অঁবিনও। লাফঝাঁপ দিয়ে সরে গেল কয়েকজন সৈনিক। অতি সাহসী, কিংবা অতি বোকা একজন শুধু পথ আগলে দাঁড়াল... ধৃষ্টতা দেখাল পাল্টা গুলি করবার। নির্দ্বিধায় বেণ্টলি নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা।

সংঘর্ষে ভাঁজ হয়ে গেল লোকটার শরীর, হুডের উপর আছড়ে পড়ল ঊর্ধ্বাঙ্গ, তারপর গোটা শরীর নিয়ে উড়ে চলে গেল বেণ্টলির উপর দিয়ে। প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। ভ্রূক্ষেপ না করে র‍্যাম্পে নেমে গেল রানা, ঢাল ধরে কয়েক সেকেণ্ডের ভিতর পৌঁছে গেল নীচের ডেকে।

ওয়াটারলাইনের ঠিক উপরে এসে গেছে বেণ্টলি, এটাই লোডিং ডেক। চারদিকে তাকাতেই পরিষ্কার বোঝা গেল। অন্যান্য ডেকগুলো ছিল মাত্র আট ফুট উঁচু, এটা বিশ ফুটের কম নয়।

স্টারবোর্ড সাইডে দেখা যাচ্ছে বিশাল ড্রব্রিজ ডোর—ওখান দিয়ে জাহাজে ওঠানো হয় গাড়ি। স্টার্ন র‍্যাম্পের কাছে একটা সাইনবোর্ড রয়েছে, জাহাজের লাইফবোট স্টেশন রয়েছে নীচের ডেকে।

উপরের ডেকগুলোয় যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা থাকলেও এই ডেকে গিজগিজ করছে গাড়ি। নীচের ডেকেও একই অবস্থা হবে, আন্দাজ করল রানা। জাহাজের স্ট্যাবিলিটি রক্ষার জন্য গাদাগাদি করে গাড়ি রেখে নীচদিকে বাড়ানো হয়েছে ওজন। গাড়ির এই বিপুল ভিড়ের মাঝে সংকীর্ণ দুটো আইল ছাড়া চলাচলের কোনও পথ নেই, শত্রুরা আক্রমণ চালালে নড়াচড়ার যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যাবে না। সাতপাঁচ ভেবে ব্রেক কষল ও।

'নামুন সবাই।'

'কিন্তু আরও এক ডেক নামতে হবে আমাদেরকে!' প্রতিবাদ জানাল নেফারতিতি।

'সিঁড়ি ব্যবহার করো,' রানা বলল। 'নীচে এই গাড়ি নিয়ে মুভ করা যাবে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দরজা খুলল নেফারতিতি, কিন্তু নামবার আগে থমকে গেল। ইঞ্জিন বন্ধ করেনি রানা। ঝট্ করে তাকাল ওর দিকে। 'মতলবটা কী তোমার?'

'আমি এখানেই থাকছি,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'চেষ্টা করব ডাইভারশন তৈরি করে ওদেরকে ব্যস্ত রাখতে। নইলে কেউই পালাতে পারব না।'

'কী বলছ এসব? আমরা একসঙ্গে থাকছি!'

'তা হলে সবাই মরব। পাগলামি কোরো না, যা বলছি সেটা করো।'

আরও কিছু বলতে চাইছিল নেফি, বাধা পেল পিছন থেকে অঁবিন মুখ খোলায়।

'ওরা এসে গেছে!' সামনে ইশারা করল সে। মিডশিপের র‍্যাম্প ধরে সতর্ক ভঙ্গিতে নেমে আসছে দুজন সৈনিক।

রাইফেল তুলতে যাচ্ছিল পিনোঁ, কিন্তু তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'না, কিচ্ছু করবার দরকার নেই। গাড়ির কারণে পিছনটা দেখতে পাচ্ছে না ওরা। আপনারা ওদিক দিয়ে কেটে পড়ুন। বোট নিয়ে পানিতে নেমে যেতে পারলে আর ভয় নেই।'

'আর তুমি?' জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

হাসল রানা। 'মরবার খায়েশ নেই আমার। একটু পর আমাকেও পানিতে পাবে। তুলে নিয়ো তখন।'

'কীভাবে নামবে?'

লোডিং ডোরের দিকে ইশারা করল রানা। 'ওখান দিয়ে উড়াল দেব।'

'মাথাই খারাপ হয়ে গেছে তোমার...'

'আর কথা নয়। নামো এখুনি।'

কনরাডকে নিয়ে ইতিমধ্যে নেমে পড়েছে অঁবিন আর পিনোঁ, শ্রাগ করে ওদের পিছু নিল নেফারতিতি। বেণ্টলির চেসিসকে কাভার হিসেবে ব্যবহার করে কিছুদূর গেল, তারপর ঢুকে পড়ল পার্ক করা গাড়ির জঙ্গলে। কুঁজো হয়ে এগোতে থাকল স্টেয়ারকেসের দরজার দিকে।

ওদেরকে দূরে সরে যাবার সুযোগ দিতে একটু অপেক্ষা করল রানা। ইঞ্জিনকে আইডলে রেখেই কয়েকবার অ্যাকসেলারেটর চাপল। যেন চাপা হুঙ্কার ছেড়ে হুমকি দিল শত্রুদের। তারপর হঠাৎ ব্রেক রিলিজ করে জ্যা-মুক্ত তীরের মত সামনে বাড়ল।

বেণ্টলির প্রস্থের চেয়ে আইল মাত্র কয়েক ইঞ্চি চওড়া, সাবধানে এগোলে ক্ষতি নেই, কিন্তু গতি বাড়ানোয় দু'পাশে পার্ক করা গাড়িগুলোর বাম্পার আর বনেটে ঘন ঘন ঠোকর খেতে থাকল ওটা। ক্ষয়ক্ষতি দু'দিকেই হলো—ডেণ্ট পড়ল চেসিসে,

চিড় ধরল হেডলাইটে, ভেঙে গেল বেন্টলির সাইডভিউ মিরর। কিন্তু রানা নির্বিকার, গোঁয়ারের মত এগিয়ে চলল শত্রুদের দিকে। সৈনিকরা ওকে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু গুলি ছুঁড়ল না। উপরের ডেকে শিক্ষা যা হবার হয়ে গেছে ওদের, এবার নিশ্চিত না হয়ে কিছু করতে চাইছে না। শিকারকে রেঞ্জের ভিতরে পাবার পর অস্ত্র তুলল, তারপর টিপল ট্রিগার।

বেন্টলির পুরু শরীর আর্মারের মত কাজ করল। চেসিস ভেদ করবার বদলে পিছলে এদিক-সেদিক ছিটকে গেল গুলিগুলো। কয়েকটা খুঁজে নিল উইণ্ডশিল্ড। চোখের সামনে কাঁচে মাকড়সার জালের মত ফাটল ধরতে দেখল রানা। তবু থামল না, গতিও কমাল না। যেভাবে ছুটছিল সেভাবেই ছুটে চলল র‍্যাম্পের দিকে। শেষ মুহূর্তে টের পেল সৈনিকরা, পাগলের পাল্লায় পড়েছে... এ-লোক চাইছে ওদের গায়ে চড়ে বসতে। উল্টো ঘুরে পড়িমরি করে ছুটতে শুরু করল তারা, উপরে ফিরে যেতে চায়।

বুল-ফাইটিঙে অংশ নেয়া ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের মত আক্রোশে র‍্যাম্পে উঠল বেন্টলি, ধাওয়া করল পলায়মান দুই শত্রুকে। বাম্পারের ধাক্কায় উড়িয়ে দিল একটাকে। অন্যজনের কপাল ভাল, গাড়ির গুঁতো খাবার আগেই পৌঁছে গেল উপরে, ডাইভ দিয়ে সরে গেল সামনে থেকে।

লাফ দিয়ে র‍্যাম্প থেকে বেরিয়ে এল বেন্টলি। দ্রুত স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে একশো আশি ডিগ্রি টার্ন করল রানা, আবারও নেমে পড়ল র‍্যাম্পে। লোডিং ডেকে ফিরতে সময় লাগল মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। বাঁক নিয়ে আউটার আইলে ঢুকে পড়ল, ছুটল ড্রব্রিজ ডোরের দিকে। উত্তেজনায় হিসেবে গড়বড় হয়ে গেল, ডোরের কাছাকাছি পৌঁছে ব্রেক চাপতেই স্কিড করে সামনে এগিয়ে গেল গাড়ি, নাক দিয়ে সবেগে আঘাত হানল দাঁড়িয়ে থাকা একটা এস.ইউ.ভি-র গায়ে। বিস্ফোরণের মত আওয়াজ করে স্টিয়ারিং হুইলের মাঝ

থেকে ডেপ্লয় হলো এয়ারব্যাগ, তার উপর এলিয়ে পড়ল রানা।

কয়েক সেকেণ্ড আচ্ছন্নের মত পড়ে রইল ও। সচেতন হতেই গাল দিল ভাগ্যকে। সর্বনাশ হয়ে গেছে এয়ারব্যাগ ডেপ্লয় হওয়ায়। লোডিং ডোর খুলে গাড়িসহ ওখান দিয়ে ক্যানালে ঝাঁপ দেবে ভেবেছিল, পানির সঙ্গে সংঘর্ষের সময় এয়ারব্যাগ রক্ষা করত ওকে... এখন আর তা সম্ভব নয়। সিটবেল্ট অক্ষত আছে যদিও, কিন্তু সেটার উপর নির্ভর করে ঝুঁকি নেয়া যায় না।

তাড়াতাড়ি ড্যাশবোর্ডের গজগুলোর উপর নজর বোলাল রানা—আশার ব্যাপার একটাই, বেণ্টলি এখনও সচল রয়েছে। ইঞ্জিনের ছন্দোবদ্ধ আওয়াজে পরিবর্তন ঘটেনি একটুও। এয়ারব্যাগ ইতিমধ্যে চুপসে গেছে; ব্যাক গিয়ার দিয়ে বেণ্টলিকে পিছিয়ে আনল ও, নাক ঘুরিয়ে উঠে এল আইলে, এগোল মিডশিপের র‍্যাম্পের দিকে। যা হবার হয়ে গেছে, এখন আর নিজেকে নিয়ে ভাবছে না, ভাবছে সঙ্গীদের নিয়ে। শত্রুদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখতে হবে, যাতে ওরা পালাবার সুযোগ পায়।

চোখের কোণে নড়াচড়া লক্ষ করে ঘাড় ফেরাল ও। নিঃসঙ্গ একজন মানুষ উদয় হয়েছে... শত্রুপক্ষের সৈনিক নয়, শিপের ক্রু। চেঁচিয়ে তাকে গা ঢাকা দিতে বলল, কিন্তু লোকটা বোধহয় বুঝল না কথাটা। অগত্যা নিজের ফামাস রাইফেলটা তুলে এক ঝলক দেখাতে হলো রানাকে। পড়িমরি করে ছুটে পালাল নাবিক।

র‍্যাম্প ধরে উপরে উঠতেই ইউনিফর্মধারী চারজন সৈনিককে একটা পার্ক করা মার্সিডিজ এস.ইউ.ভি-র সামনে জটলা করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও। বোধহয় এ-ক'জনই অবশিষ্ট রয়েছে দলটায়। বেণ্টলিকে দেখামাত্র তড়িঘড়ি করে এস.ইউ.ভি-তে উঠে পড়ল একজন, ইঞ্জিন চালু করে সামনে এগোল। ঝটপট ওটায় উঠে পড়ল বাকিরা। বুদ্ধি খুলেছে লোকগুলোর, এবার গাড়ি নিয়ে

ধাওয়া করতে চলেছে। ইচ্ছে করেই ওদেরকে কাছে পৌঁছুবার সময় দিল রানা, টোপ সেজে ওদেরকে নিয়ে যাবে দূরে।

শুরু হলো ধাওয়া। এঁকেবেঁকে আরেক পাশের আইলে চলে গেল রানা, ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে গাড়ি ছোটাল আফট র‍্যাম্পের দিকে। রিয়ারভিউ মিররে মার্সিডিজকে প্রবল আক্রোশে ছুটে আসতে দেখে মুচকি হাসল ও—কাজে লেগেছে ডাইভারশন। এখন ওদেরকে মিনিট পনেরো আটকে রাখতে পারলেই হয়। লাইফবোট নামিয়ে গ্যামরোয়ায় পৌঁছে যাবে নেফারতিতি আর অন্যেরা।

র‍্যাম্প ধরে পরের ডেকে উঠে এল বেণ্টলি, কয়েক মিনিট কানামাছি খেলল গাড়ির ভিড়ের মাঝে, সুযোগ দিল না পিছনের লোকগুলোকে ক্লিয়ার শট নেবার। দুই গাড়ির মাঝে দূরত্ব একটু বাড়লে আবারও র‍্যাম্প ধরল, চলে গেল উপরের ডেকে। একই ভাবে ওখানেও কাটাল কিছুক্ষণ, তারপর আবার নেমে গেল নীচে। উপরে যাবার আর চেষ্টা করছে না রানা, টপ ডেকে পৌঁছে কোনও লাভ নেই। জাহাজ এতই উঁচু, উপর থেকে গাড়ি-সহ বা গাড়ি ছাড়া, যে-ভাবেই ঝাঁপ দিক সেটা আত্মহত্যার নামান্তর।

রানার কৌশল মন্দ নয়, তবে পিছনের মার্সিডিজের ড্রাইভার ক্যাপ্টেন হারুকিও যথেষ্ট কৌশলী। খুব শীঘ্রি টের পেল, এভাবে ধাওয়া করে বিশেষ লাভ হবে না। ব্রেক কষে দুজন সৈনিককে নামিয়ে দিল এস.ইউ.ভি. থেকে, বলে দিল আরও দুটো গাড়ি নিয়ে দু'পাশের র‍্যাম্প আগলে দাঁড়াতে। ফাঁদে ফেলতে চাইছে বেণ্টলিকে। দুই সৈনিককে নামিয়েই আবার শুরু করল ধাওয়া, সব মিলিয়ে সময় নষ্ট হলো মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ড।

ইতিমধ্যে জাহাজের কয়েকজন ক্রু ও অফিসার এসে পড়েছে হোল্ডে, একপাশে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে দেখছে ঘটনা। বেশ কিছু গাড়ির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সেগুলোর জন্য শেষ পর্যন্ত তাদেরকেই

জবাবদিহি করতে হবে। জাহাজের ভিতরে হামলা আর গোলাগুলির ঘটনা কাউকে বিশ্বাস করাতে পারবে কি না সন্দেহ। একজন তাই মোবাইল ফোন তুলে ভিডিও করছে। লোকগুলোর জন্য সহানুভূতি বোধ করল রানা, কিন্তু কিছু করার নেই। বরং ওরা এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে যে-কোনও মুহূর্তে গুলি খেতে পারে। রাইফেল তুলে ওদেরকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করল, যাতে পালিয়ে যায়। কিন্তু পায়ে যেন শিকড় গজিয়ে গেছে নাবিক ও অফিসারদের, একচুল নড়ল না। অগত্যা গাড়ির নাক ঘুরিয়ে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করল রানা, গোলাগুলি শুরু হলে ওরা যেন আহত না হয়।

ক্লান্তি অনুভব করছে রানা, গতরাত থেকে এখন পর্যন্ত কম ধকল যায়নি, এরপরেও শরীর যে সচল রয়েছে সেটাই আশ্চর্য। কিন্তু ধীরে ধীরে পরাজিত হতে শুরু করেছে স্নায়ু। যতটা তীক্ষ্ণ থাকা উচিত, তা আর নেই। চকিতে হাতঘড়ি দেখল... পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেছে, তারমানে ওর সঙ্গীরা নিরাপদ। এই উপলব্ধি হতেই ভেঙে পড়তে চাইল শরীর। ইচ্ছে হলো গাড়ি থামিয়ে দু'হাত তুলে বেরিয়ে পড়ে। আত্মসমর্পণ করলে শত্রুরা নিশ্চয়ই আর খুন করতে চাইবে না ওকে? কিন্তু পরক্ষণে মাথা ঝাড়া দিয়ে তাড়াল ভাবনাটা। না, হাল ছেড়ে দেয়ার শিক্ষা পায়নি ও। পালাতে পারুক বা না-ই পারুক, প্রতিপক্ষকে ঘোল খাইয়ে ছাড়বে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন হারুকির কৌশলের কাছে হার না মেনে উপায় রইল না। আরও দুটো গাড়ি যে ওর পথ আটকে রেখেছে, সেটা জানা ছিল না। ফলে একটু পরেই যখন মিডশিপের র‍্যাম্প ধরে উপরে উঠতে শুরু করল, উপরের ল্যাণ্ডিঙে অটল দানবের মত দেখতে পেল একটা হামভিকে। ডানে-বাঁয়ে যাবার উপায় নেই, ব্রেক কষল ও। তবু স্কিড করে সোজা হামভির

বনেটে সজোরে আঘাত হানল বেণ্টলি।

প্রচণ্ড ঝাঁকিতে কেঁপে উঠল পুরো চেসিস, সিটবেল্টের কারণে ছিটকে গেল না রানা, এয়ারব্যাগের অভাবে স্টিয়ারিঙে ঠুকে গেল মাথা। চোখের সামনে জ্বলে উঠল লাল-নীল ফুলকি। নেতিয়ে পড়ল ও। আবছাভাবে শুনতে পেল গুলির আওয়াজ। ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে জাহাজের কৌতূহলী দর্শকদের তাড়িয়ে দিচ্ছে শত্রুরা। কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেলে পায়ের আওয়াজ হলো। রাইফেল কুড়িয়ে প্রতিরোধ গড়ার ইচ্ছে হলো, কিন্তু একবিন্দু শক্তি পেল না হাতে।

বেণ্টলির দরজা খুলে রানাকে বের করে আনল একজোড়া শক্তিশালী হাত। চেসিসে ঠেস দিয়ে দাঁড় করাল। টলমল পায়ে একটু সোজা হলো রানা। অটোমেটিক রাইফেলের কালো ব্যারেল দেখতে পেল নিজের মুখ বরাবর। অস্ত্র ধরে রাখা মানুষটির চেহারা রুক্ষ, নিষ্ঠুর। আরেকজন এগিয়ে এল এবার পাশ থেকে। জাপানি। হাবভাবে তাকেই নেতা বলে মনে হচ্ছে। শান্ত ভঙ্গিতে আপাদমস্তক জরিপ করল রানাকে।

একটু হাসল রানা। ঠাট্টার সুরে বলল, 'নাহ্, গাড়িটা বিশেষ সুবিধের নয়। তোমরা নিজেদের জন্য অন্য কোনও গাড়ি দেখো।'

ভাবান্তর হলো না ক্যাপ্টেন হারুকির চেহারায়। বেণ্টলির ভিতরে চোখ বোলাল। ওখানে আর কাউকে দেখতে না পেয়ে আবার ফিরল রানার দিকে। থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'বাকিরা কোথায়?'

'দুঃখিত। এই অধমকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে তোমাদের।'

'কোথায়?' গর্জে উঠল হারুকি।

'গো টু হেল!' একই সমান গর্জন ছাড়ল রানা।

চটাস করে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে রানার কানের পাশে

আঘাত করল হারুকি। মাথা ঝন ঝন করে উঠল ওর। পরমুহূর্তে তলপেটে হাঁটুর গুঁতো খেয়ে গুঙিয়ে উঠল। হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল ব্যথায়, হাঁসফাঁস করে উঠল বাতাসের অভাবে।

রানার খুলির পিছনে পিস্তল ঠেকাল ক্যাপ্টেন। 'এই শেষবার জিজ্ঞেস করছি, কোথায় তোমার সঙ্গীরা?'

ট্রিগার চাপার জন্য লোকটার আঙুল নিশপিশ করছে, বুঝতে পারল রানা। অযথা তাকে সুযোগ দেবার মানে হয় না। তাই হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'নেই। আমি তোমাদের ব্যস্ত রেখেছি, সেই ফাঁকে ওরা লাইফবোট নিয়ে কেটে পড়েছে।'

'কোথায় গেছে?'

'ক্রুজ শিপটায়।' মাথা তুলল রানা। 'অন্তত তিন হাজার প্যাসেঞ্জার আছে ওটায়। যদি পারো তো তাদের মাঝ থেকে খুঁজে বের করো গে।'

দাঁত কিড়মিড় করল হারুকি। রানার কথা বিশ্বাস করেছে। বুঝতে পারছে, হাতছাড়া হয়ে গেছে শিকার। এমনিতেই ব্যাপারটা যথেষ্ট জট পাকিয়ে গেছে, এ-অবস্থায় আবার ক্রুজ শিপে গিয়ে হানা দেবার প্রশ্নই আসে না। নাকামুরার কথা ভাবতেই আতঙ্ক অনুভব করল, ব্যর্থতা ক্ষমা করে না লোকটা। শাস্তি পেতেই হবে তাকে। একবার ভাবল পালিয়ে যাবে কি না, কিন্তু সৈনিকসুলভ মন সায় দিল না তাতে। ভীরুতা কাকে বলে জানে না সে, শাস্তি যদি পেতেই হয় তা মাথা পেতে নেবে। আর কিছু না হোক, একজনকে তো আটক করতে পেরেছে। দেখা যাক এই বন্দি লোকটা নাকামুরার ক্রোধ কতটা প্রশমিত করতে পারে।

রানা এখনও তাকিয়ে আছে তার দিকে, আচমকা পিস্তলের বাট দিয়ে ওর ঘাড়ের পিছনে সর্বশক্তিতে আঘাত করল হারুকি। টুঁ শব্দ না করে মাটিতে হাত-পা ছড়িয়ে লুটিয়ে পড়ল রানা। জ্ঞান হারিয়েছে। সঙ্গে হ্যাণ্ডকাফ নেই হারুকির, এ-অবস্থায় একজন

বন্দিকে সঙ্গে নেয়ার আগে অচেতন করে নেয়াই ভাল।

'গাড়িতে তোলো ওকে,' সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল ক্যাপ্টেন। 'লাইফবোট স্টেশনটা দেখে আসি, ও সত্যি বলছে কি না নিশ্চিত হতে হবে। তারপর ফিরে যাব চপারে।'

দশ মিনিট পর ওদেরকে নিয়ে টেকঅফ করল গ্যাযেল। আহত-নিহত দুই সৈনিককেও নিয়ে আসা হয়েছে। আর নেয়া হয়েছে বন্দি রানাকে। পশ্চিমদিকে উড়ে চলল হেলিকপ্টার, ওদিকে নাকামুরার আরেকটি গোপন প্রজেক্টের কাজ চলছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে উদাস হয়ে গেল হারুকি। ভাবছে আজকের এই ব্যর্থতার পরিণাম কী হতে পারে—শুধু নিজের বেলায় নয়, তার নিয়োগকর্তার গোটা অপারেশনের ক্ষেত্রে। অটো-ক্যারিয়ারের ভিতরে অন্তত কয়েক মিলিয়ন ডলারের ক্ষয়ক্ষতি করে এসেছে, ডেকের উপরে ফেলে এসেছে একটা ক্র্যাশ করা হেলিকপ্টার। গুলির খোসাও কুড়িয়ে আনার সময় ছিল না।

আশার কথা একটাই, সিলছাপ্পড়বিহীন গোলাবারুদ ব্যবহার করে ওরা, কাজেই গুলির খোসার সূত্র ধরে ওদের পরিচিতি ফাঁস হবার সম্ভাবনা নেই। জাহাজের যে-অফিসার মোবাইলে ভিডিও করছিল, তার কাছ থেকে ফোনটা ছিনিয়ে আনা হয়েছে, ফলে ছবি-টবিও থাকছে না ওদের। ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িগুলোর দাম ইনশিয়োরেন্স কোম্পানি মিটিয়ে দেবে, কাজেই মালিকরা খুব একটা হৈচৈ করবে বলে মনে হয় না। পানামায় নাকামুরার অনুগত সরকারি লোকজনের অভাব নেই, যে-কোনও তদন্তের মোড়ই ড্রাগ-স্মাগলার বা স্থানীয় জলদস্যুদের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া সম্ভব। কাজেই জাহাজের ঘটনা নিয়ে দুশ্চিন্তা না করলেও চলে।

মূল সমস্যা হিসেবে রয়ে যাচ্ছে পালিয়ে যাওয়া তিন সাক্ষী। ভলকানিক লেকের পারে চলতে থাকা খোঁড়াখুঁড়ি দেখে ফেলেছে

ওরা। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে ধামাচাপা দেয়া কঠিন। কাজেই এদের পরিচয় এবং কার হয়ে কাজ করছে সেটা জানা জরুরি। এখনও দেরি হয়ে যায়নি, এদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানা গেলে ঠেকাবার যথেষ্ট উপায় রয়েছে নাকামুরার হাতে। অজ্ঞান বন্দির দিকে তাকাল হারুকি—এ-ক্ষেত্রে এই লোকটিই হতে পারে সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি। ওর মুখ খোলাতে হবে। তবে সেটা হারুকির পক্ষে সম্ভব নয়। সেজন্যে চাই ভিন্ন যোগ্যতার মানুষ... একজন ইন্টারোগেটর।

ইন্টারোগেশনের গুরুত্ব অজানা নয় হারুকির, কিন্তু কাজটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অমানবিক অত্যাচারের পর্যায়ে পড়ে বলে মনের সায় পায় না। সৈনিক সে, যুদ্ধের ময়দানে সামনাসামনি লড়ে প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে পারে অনায়াসে। নিরস্ত্র... বন্দি... লড়তে অক্ষম কারও উপরে বলপ্রয়োগ করাটা তার চোখে চরম অসম্মানজনক। ওটা তারাই পারে, যাদের মাঝে বিবেক নেই... যারা লড়াই বা আত্মত্যাগের মর্যাদা বোঝে না। এরা তার চোখে শকুনিতুল্য—লড়াইশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে হানা দেবে, বিনা বাধায় ঠোকর দেবে পরাজিত যোদ্ধাদের গায়ে। হারুকি কখনও অমন হতে পারবে না।

সুসংবাদ হলো, নাকামুরার পোষা বাহিনীতে রয়েছে এমন এক শকুন। চেহারা-সুরতেও লোকটা দেখতে সেই শকুনেরই মত—হাড্ডিসার, মাথায় চুল নেই বললেই চলে, রুগ্ন শরীরে কোনোমতে লেগে রয়েছে ভাঁজপরা চামড়া। তার বয়স আন্দাজ করা কঠিন, ষাট-পঁয়ষট্টির কম নয়। পুরো নাম কেউই জানে না, নাকামুরার মার্সেনারি বাহিনীতে সে ড্রাগো নামে পরিচিত। শোনা যায় সে সার্বিয়ান যুদ্ধাপরাধী, নব্বুইয়ের দশকে পেশাদার ইন্টারোগেটর হিসেবে অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে কয়েক হাজার নিরীহ বসনিয়ানের উপর। মিলোসোভিচের পতনের পর পালিয়ে

এসেছে দেশ ছেড়ে। বলা বাহুল্য, এ-ধরনের মানুষের আলাদা কদর রয়েছে কেনজি নাকামুরার কাছে; সাদরে তাকে নিজের দলে টেনে নিয়েছে সে। বিবেকহীন, ভয়ঙ্কর লোকটির কথা মনে পড়তেই একরাশ বিতৃষ্ণা অনুভব করল হারুকি। আনমনে মাথা নাড়ল সে।

বন্দির জ্ঞান ফিরেছে, পিটপিট করে তাকাচ্ছে হারুকির দিকে। ধীরে ধীরে উঠে বসল। জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে। চেহারায় বা আচার-আচরণে ভয়-ডরের বিন্দুমাত্র ছাপ নেই। বিস্ময় অনুভব করল জাপানি ক্যাপ্টেন। কে এই লোক? ত্বকের রঙ দেখে বোঝা যাচ্ছে, পশ্চিমা নয়। দক্ষিণ এশিয়ান হতে পারে। এখানে কী করছে? রানার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানানো হয়নি তাকে, ছবিও দেখানো হয়নি... ফলে চিনতে পারছে না ওকে। তবে এটুকু বুঝতে পারছে, এই যুবক সাধারণ কেউ নয়। ভবিতব্য বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়, তারপরেও এত নিস্পৃহ রয়েছে কী করে?

দুঃসাহসী, নাকি লোকটা নিতান্তই বোকা?

খুব শীঘ্রি সেটা জানা যাবে... ড্রাগোর সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা কাটাবার পর।

সতেরো

এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে নেফারতিতি ও তার সঙ্গীরা রানার কাছ

থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর। কাজে লেগেছে রানার ডিসট্র্যাকশন, বিনা বাধায় পড আকৃতির একটা লাইফবোট নিয়ে ক্যানালে নেমে যেতে পেরেছে ওরা। বেগতিক পরিস্থিতি দেখে গানশিপটা এর আগেই কেটে পড়েছিল, ফলে কিছুক্ষণ বোট নিয়ে ঘুর ঘুর করেছে ওরা অটো-ক্যারিয়ারের আশপাশে, আশা করেছে লোডিং র‍্যাম্প খুলে বেরিয়ে আসবে রানা। কিন্তু দশ মিনিট পেরুবার পর আর অপেক্ষা করতে রাজি হয়নি অঁবিন, তার মতে রানাকে যথেষ্ট সময় দেয়া হয়েছে। বেরুতে পারলে এরমধ্যেই বেরিয়ে আসত। দেরি করা মানে অনর্থক ঝুঁকি নেয়া, রানার আত্মত্যাগ বৃথা করে দেয়া।

যুক্তির কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছে বাকিদের আবেগ, বোটের মুখ ঘুরিয়ে চলে এসেছে গ্যামবোয়ার রিপেয়ার ডকে। ওখানে ভেসে থাকা নানা ধরনের জলযানের মাঝে বিসদৃশ ঠেকেনি লাইফবোট, ডক ওয়ার্কাররা ভেবেছে বুঝি মেরামতের জন্য এসেছে ওটা... দ্বিতীয়বার ফিরে তাকায়নি। ফলে সবার অলক্ষে ডাঙায় উঠে যেতে সমস্যা হয়নি। বন্দরের একটা পুরনো জিপ চুরি করে এখন ওরা ফিরে চলেছে পানামা সিটির উদ্দেশে... লিজনের সেফ হাউসে।

ব্রিজ ধরে ক্যানাল অতিক্রম করবার সময় দূর থেকে দেখা গেল অটো-ক্যারিয়ারটাকে... ডেকের উপরে পড়ে রয়েছে বিধ্বস্ত জেটরেঞ্জার। পাশে ল্যাণ্ড করা গ্যাযেলে ধরাধরি করে একজন মানুষকে তুলতে দেখল ওরা। এত দূর থেকে চেহারা চেনা গেল না, কিন্তু আঁচ করতে অসুবিধে হলো ওটা কে হতে পারে। রানা! ও ধরা পড়ে গেছে... কিংবা মারা গেছে! বুকের ভিতর আলোড়ন অনুভব করল নেফারতিতি, কিছুতেই দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা বিশ্বাস করতে পারছে না। এত সহজে মরবার পাত্র নয় রানা। ওর বিস্ফারিত চোখের সামনে টেকঅফ করল গ্যাযেল, উড়ে চলে গেল পশ্চিম দিকে।

পথে বেশ কিছু পানামানিয়ান আর্মির জিপ ও ট্রাককে পেড্রো মিগুয়েল লকের দিকে ছুটে যেতে দেখল ওরা—শিপ থেকে ডিসট্রেস কল পেয়ে সাড়া দিয়েছে। লকে ঢোকার সময় থামতে হবে অটো-ক্যারিয়ারকে, তখনই ওটায় উঠবে সেনাসদস্যরা। খানিক পরে আর্মির জলপাই রঙের একটা হেলিকপ্টারও উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে। তবে অনেক দেরি করে ফেলেছে ওটা, গ্যাযেলের পিছু নেয়া আর সম্ভব নয়।

সেফহাউসে পৌঁছুতেই কনরাডের দায়িত্ব নিল লিজনের ডাক্তার। ওকে নিয়ে গেল ভিতরের কামরায়। তাকে সাহায্য করতে গেল বাকিরা। দুজন লিজনেয়ারকে পাঠানো হলো চুরি করা জিপটা দূরে ফেলে আসার জন্য। সামনের কামরায় একা রয়ে গেল নেফারতিতি। পুরো রাস্তা আহত পাইলটের পরিচর্যা করে কাটিয়েছে ও, অন্য কিছু নিয়ে ভাববার সময় পায়নি। ফুরসত মিলতেই রাগ আর ক্ষোভ ভর করল হৃদয়ে। বাথরুমে ঢুকে চোখেমুখে পানির ছিটে দিল, কিন্তু এক বিন্দু প্রশমিত হলো না আবেগ।

রানার জন্য ছটফট করছে। অল্প সময়েই অদ্ভুত যুবকটির প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে ও। ওকে হারাবার আশঙ্কায় কেঁপে উঠছে বুক। অঁবিন বা তার সঙ্গীরা রানার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয় বলে মনে হচ্ছে। কাজেই যা করার করতে হবে ওকেই। পকেট থেকে বের করে আনল সেলফোন, ডায়াল করল মার্কোসের নাম্বারে। একবার রিং হতেই সাড়া দিল সে।

'হ্যালো?'

'মার্কোস, নেফারতিতি বলছি।'

'গুড মর্নিং, ক্যাপ্টেন। আপনাদের ফোনেরই অপেক্ষায় ছিলাম। খবর সব ভাল তো? মিশন সাকসেসফুল?'

'উঁহুঁ। ফোনে বিস্তারিত বলতে পারব না। মি. সোহেলের সঙ্গে

যোগাযোগ আছে আপনার?'

'হ্যাঁ। কী করতে হবে?'

'ওঁকে নিয়ে চলে আসুন যত দ্রুত সম্ভব। আমি ঠিকানা দিচ্ছি।'

সেফহাউসের ঠিকানা তাকে বুঝিয়ে দিল নেফারতিতি।

মার্কোস বলল, 'ঠিক আছে, ধরে নিন রওনা হয়ে গেছি।'

সংযোগ কেটে দিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল নেফারতিতি। ড্রয়িংরুমের সোফায় বসে খতিয়ে দেখল পুরো ব্যাপারটা। ভলকানিক লেকে অঁবিনের কর্মকাণ্ডই প্রমাণ করছে, ফরাসিদের পানামা মিশন স্রেফ রেডিও ইন্টারসেপশন অ্যান্টেনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আরও বড় কিছু রয়েছে এর পিছনে, নইলে ফরাসি এজেন্ট ওভাবে ঝুঁকি নিয়ে ক্যাম্পে অনুপ্রবেশ করত না। ইউ.এস. এম্বাসিকে ঘটনাটা জানাবে কি না ভাবল, পরক্ষণে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। সবকিছু না জেনে রিপোর্ট করাটা বোকামি হবে। অ্যাম্বাসেডরকে ব্যক্তিগতভাবে চেনে, স্রেফ মুখের কথায় নেচে ওঠার মানুষ নন তিনি... প্রমাণ চাইবেন। সিআইএ-র স্টেশন চিফের কাছে গিয়েও লাভ নেই; লোকটা অকর্মার ধাড়ি, পাঁড় মাতাল... রিটায়ার করবে ক'দিন পরেই। পানামায় তাকে পোস্টিং দেয়া হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ আর কোথাও রাখা সম্ভব নয় বলে। এরপরে রয়েছেন কর্নেল ডিলবার্ট... নেফির মিলিটারি সুপারভাইজর। আরেক সুযোগসন্ধানী লোক, ব্রিগেডিয়ার হবার স্বপ্ন দেখছে। অকাট্য প্রমাণ ছাড়া নেফির মুখের কথায় অ্যাকশন নিতে গিয়ে ক্যারিয়ারকে ঝুঁকিতে ফেলতে চাইবে না। সব মিলিয়ে হতাশাজনক একটা পরিস্থিতি। সাহায্যের আশা করা যেতে পারে শুধু সোহেল আহমেদ আর মার্কোস পেরেইরার কাছ থেকে।

ওর ধারণাকে সত্যি প্রমাণ করবার জন্যই বুঝি আধঘণ্টা পর একটা ঝরঝরে হোণ্ডা অ্যাকর্ড এসে থামল বাড়ির সামনে।

জানালায় ছুটে গেল নেফি—ড্রাইভারের সিটে মার্কোস, আর তার পাশে সোহেলকে বসে থাকতে দেখে ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল। সদর দরজা খুলে দিতেই কয়েক মুহূর্ত পর বাড়িতে ঢুকল দুজনে। আর তখুনি ভিতরের কামরা থেকে বেরিয়ে এল অঁবিন। থমকে দাঁড়াল অচেনা দুজন মানুষকে দেখে।

'এসবের মানে কী?' হতভম্ব গলায় বলল সে। 'এরা কারা?'

তাকে পাত্তা না দিয়ে নেফারতিতির দিকে এগোল সোহেল। 'রানা কোথায়?' কণ্ঠে ফুটে উঠল খাঁটি উদ্বেগ।

'ক্যাপ্টেন শেফার্ড!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল অঁবিন। 'একটা প্রশ্ন করেছি আমি! এদের পরিচয় কী?'

ঝট করে তার দিকে ফিরল সোহেল। 'একই প্রশ্ন আমি তোমার ব্যাপারেও করব, কিন্তু সেটা রানার খবর পাবার পরে। ভাল চাও তো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো, বাগড়া দিতে এসো না।'

ওর গলায় এমন কিছু ছিল, যা অঁবিনকে স্থবির করে দিল। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল সে, মুখের ভাষা হারিয়েছে।

আবার নেফির দিকে ফিরল সোহেল। 'রানা কোথায়, ক্যাপ্টেন?'

'ও... ও সম্ভবত নাকামুরার লোকদের হাতে ধরা পড়েছে।'

'কোথায়?'

'ক্যানালের একটা জাহাজে। ওকে নিয়ে লোকগুলো হেলিকপ্টারে চড়ে পালিয়েছে।'

'ক্যানাল?' ওকে থামিয়ে দিল সোহেল। 'আপনারা তো দারিয়েন প্রভিন্সের ভলকানিক লেকে গিয়েছিলেন!'

'লম্বা কাহিনি...' বলতে শুরু করল নেফারতিতি।

'থামুন!' আবার চেঁচিয়ে উঠল অঁবিন। 'ক্যাপ্টেন শেফার্ড, যথেষ্ট হয়েছে! এদেরকে এখানে ডেকে এনে এমনিতেই আমাদের সেফহাউসের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছেন আপনি। তার

ওপর ক্লাসিফায়েড মিশনের বিবরণ ফাঁস করতে চাইছেন? ইম্পসিবল! সেটা হতে আমি কিছুতেই দেব না।'

'নিকুচি করি আপনার মিশনের!' সমান তেজে বলল নেফারতিতি। সোহেলকে পাশে পেয়ে মনের জোর বেড়েছে। 'রানাকে ফিরিয়ে আনাই এখন আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ... আর কিছু না। আপনার তাতে কী অসুবিধে হচ্ছে না হচ্ছে, তার থোড়াই পরোয়া করি।'

'চমৎকার বলেছেন,' প্রশংসা করল সোহেল ক্যাপ্টেনের। তারপর তাকাল ফরাসি এজেন্টের দিকে। 'তুমি যে-ই হও, বাপু, ঝামেলা করতে এসো না।' মার্কোস আর নেফিকে নিয়ে একটা সোফা দখল করে বসল। 'সব খুলে বলুন আমাকে, ক্যাপ্টেন। লম্বা কাহিনি শুনতে অসুবিধে নেই, আমার হাতে অফুরন্ত সময়।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল অঁবিন। 'আপনার আন-প্রফেশনালিজম দেখে আমি তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি, ক্যাপ্টেন শেফার্ড! এরা সিভিলিয়ান!'

'লেকচার মারবেন না!' এবার রেগে গেল নেফি। 'আন-প্রফেশনালিজম? আর আপনারা লেকের পারে যা করেছেন, সেটা কী? নাকামুরার ক্যাম্পে অনুপ্রবেশ করতে গিয়েই তো বিপদে ফেলেছিলেন আমাদের। কী খুঁজছিলেন ওখানে? খবরদার, আবার ওই অ্যান্টেনা অ্যারের গপ্পো শোনাতে আসবেন না। ওটা যে ভুয়া, তা বুঝতে বাকি নেই আমাদের।'

'আপনার প্রশ্নের কোনও জবাব দেব না আমি,' বলল অঁবিন।

'কিন্তু আমি দেব।' কথাটা ভেসে এল হলওয়ে থেকে। মেজর পিনোঁ বেরিয়ে এসেছে ওখানে।

'মেজর!' অস্ফুট প্রতিবাদ করল অঁবিন।

'দুঃখিত, মসিয়ো। কিন্তু সত্যটা জানার অধিকার রয়েছে ওঁদের।'

ফরাসি ভাষায় তর্ক শুরু হলো দুজনের মাঝে। পিনোঁকে নিরস্ত করতে চাইছে অঁবিন, কিন্তু সে অটল নিজের সিদ্ধান্তে। রাগ দেখিয়ে কোনও কাজ হলো না, শেষ পর্যন্ত হার মেনে পিছিয়ে গেল ফরাসি এজেন্ট। চেহারায় ফুটে উঠল ক্ষোভ।

নেফারতিতি, সোহেল আর মার্কোসের মুখোমুখি আরেকটা সোফায় এসে বসল পিনোঁ। বলল, 'ঘটনার শুরু এগারো সপ্তাহ আগে। জাপানের রোক্কাশো থেকে স্পেণ্ট ইউরেনিয়াম ফিউয়েলের একটা শিপমেণ্ট পাঠানো হয়েছিল ফ্রান্সের একটা রি-প্রসেসিং প্ল্যাণ্টে। ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়, এর আগে এ-ধরনের আরও অন্তত দেড়শো শিপমেণ্ট নেয়া হয়েছে বিশেষভাবে ডিজাইন করা ডাবল-হালের জাহাজে করে। ফিউয়েলগুলো স্টোর করা হয় টাইপ-বি কাস্ক নামের এক ধরনের আধারে—দেখতে বিশাল ড্রামের মত... বিশ ফুট উঁচু, একেকটা কাস্কে ছয় টন ইউরেনিয়াম রাখা হয়। তেজস্ক্রিয় জ্বালানি পরিবহনের এই পদ্ধতি ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সির স্বীকৃত। যা হোক, এই দফা যখন শিপমেণ্টটা ফ্রান্সে পৌঁছুল, ওজন করে পাঁচশো পাউণ্ড ইউরেনিয়াম কম পাওয়া গেছে।'

'কম পাওয়া গেছে বলতে কী বোঝাচ্ছেন?' ভ্রূ কোঁচকাল সোহেল। 'আপনাদের পাঁচশো পাউণ্ড রেডিও-অ্যাকটিভ ফিউয়েল খোয়া গেছে?'

মাথা ঝাঁকাল পিনোঁ। 'দু'ভাবে ব্যাপারটা ঘটতে পারে। হয় রোক্কাশো থেকেই কম লোড করা হয়েছে, কিংবা জাহাজটা ফ্রান্সে যাবার পথে চুরি হয়েছে ইউরেনিয়াম। ফ্রেঞ্চ রেগুলেটররা জাপানে গেছেন রোক্কাশোর প্ল্যাণ্টে তদন্ত চালাতে। আর আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে এখানে খোঁজখবর নিতে।'

'এখানে কেন?'

'কারণ পানামা ক্যানালের ভিতর দিয়ে গেছে জাহাজটা। পুরো রাস্তায় এখানেই ওটা চুরি হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। এখানে ছাড়া আর কোথাও ইউরেনিয়াম আনলোড করবার উপায় ছিল না।'

'কিন্তু সম্ভাবনাটা ক্ষীণ,' বলে উঠল অঁবিন। মুখ বন্ধ রাখার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। 'ক্যানাল পেরুবার সময় জাহাজটা একবারও থামেনি। বাইরের লোক বলতে মাত্র তিনজন পাইলট উঠেছিল জাহাজকে গাইড করবার জন্য। কাস্ক খুলে প্রায় দুইশ' কিলো ইউরেনিয়াম চুরি করবার জন্য সংখ্যাটা যথেষ্ট নয়।'

'তা হলে তারপরেও কেন এসেছেন আপনারা?' জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি।

'হ্যাঁ, এসেছি,' বলল পিনোঁ। 'ইউরেনিয়ামের ব্যাপারে ঝুঁকি নেয়া যায় না। সব সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমাদের সরকার।'

মার্কোস জিজ্ঞেস করল, 'যে-জাহাজে ওগুলো নেয়া হচ্ছিল, সেটা কত বড়?'

'একশো চার মিটার লম্বা,' জানাল পিনোঁ। 'কেন জানতে চাইছেন?'

'ওই আকারের জাহাজ গাইড করতে একজনের বেশি পাইলট লাগে না।'

'কিন্তু এটায় স্পেশাল কার্গো ছিল। হয়তো সতর্কতার জন্য বাড়তি লোক নেয়া হয়েছিল।'

'সেক্ষেত্রে বড়জোর আরেকজন। তিনজন পাইলট কেন উঠল জাহাজে, বোঝা যাচ্ছে না।'

'দুজন হোক, বা তিনজন... কিছু যায়-আসে না। বললাম তো, কাজটায় আরও লোক দরকার। এখানে ইউরেনিয়াম আনলোড করবার কোনও সুযোগ পায়নি ওরা। কাস্কের মুখ খোলা

হলে রেডিয়েশন বেড়ে যেত, কিন্তু জাহাজের সেফটি সেন্সরে সে-ধরনের কোনও স্পাইক রেকর্ড হয়নি। তা ছাড়া জাহাজের লোকেরা জানিয়েছে, পাইলটরা পুরো সময় ব্রিজেই ছিল; যায়নি কোথাও। কাস্কগুলোর গায়ে সিকিউরিটি ট্যাগ ছিল, সেগুলো অক্ষত পাওয়া গেছে। আমার তো মনে হয় ওই পাঁচশো পাউণ্ড ইউরেনিয়াম ওঠানোই হয়নি জাহাজে, ঘাপলা করেছে রোক্কাশোর লোডিং ফ্যাসিলিটি। কে জানে, ব্যাপারটা স্রেফ ক্লারিক্যাল এররও হতে পারে।'

'যদি তা-ই হয়,' বাঁকা সুরে প্রশ্ন করল নেফারতিতি, 'তা হলে আপনারা কোবায়াশির পিছনে লেগেছেন কেন?'

'কারণ অবিশ্বাস্য কোনও উপায়ে চুরিটা যদি এখানে হয়েই থাকে, সেটা করবার মত লোকবল ও সেটআপ শুধুমাত্র এই জাপানি কোম্পানিটারই আছে। তা ছাড়া ওরা যে তলে তলে কিছু একটা ঘটাচ্ছে, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। দুয়ের মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে কি না, সেটাই জানতে চেয়েছি আমরা। চোরাই ইউরেনিয়াম যদি কোথাও ওরা লুকিয়ে থাকে, সে-জায়গার খোঁজ পেতে চেয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন পর্যন্ত তেমন কোনও আলামত দেখতে পাইনি। ওদের পুরো ফ্যাসিলিটিতে গোপনে গাইগার কাউন্টার নিয়ে তল্লাশি চালানো হয়েছে, রেডিয়েশনের চিহ্নমাত্র পাইনি। আজ ভলকানিক লেকের ওই ক্যাম্পেও ঢুকেছিলাম ওই গাইগার কাউন্টার নিয়েই। ওখানেও একই ফলাফল। হারানো ইউরেনিয়ামের সঙ্গে ওদের কোনও সম্পর্ক নেই বলেই ধারণা করছি এখন।'

'এক্সকিউজ মি,' বলে উঠল মার্কোস, 'একটা সম্ভাবনা বোধহয় এড়িয়ে গেছেন। ট্রানজিটের সময় ক্যানালে অনেক জাহাজই টাগবোটের সাহায্য নেয় লকে ঢোকার জন্য। সে-সময়ে টাগবোট থেকে যথেষ্ট লোক উঠতে পারে আপনাদের জাহাজে,

ইউরেনিয়াম চুরি করে ওই বোটে তুলে আবার কেটেও পড়তে পারে।'

'কিছুই এড়িয়ে যাইনি আমরা,' বিরক্ত গলায় বলল অঁবিন। 'এখানে এসেই সবক'টা টাগবোটে গাইগার কাউন্টার দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষায় উৎরে গেছে ওগুলো। বললাম তো, হারানো ইউরেনিয়াম এখনও জাপানেই রয়ে গেছে। খুব শীঘ্রি ওগুলোর খোঁজ পাওয়া যাবে। এখানে আর সময় নষ্ট করবার কোনও মানে হয় না। পানামায় আমাদের মিশন শেষ।'

'আপনার আন্দাজ ভুলও হতে পারে,' মনে করিয়ে দিল সোহেল। 'এত বড় ঝুঁকি নেবেন?'

'ঝুঁকি থাকলেই না নেয়ার প্রশ্ন আসে। আমি বলছি... নেই।'

'রানার কী হবে?' রাগী গলায় জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি। 'প্রয়োজনের সময় ইচ্ছেমত ব্যবহার করেছেন, এখন ওকে বিপদে ফেলে চলে যাবেন? এটাই কি ফ্রেঞ্চ লিজনের নীতি?'

'আমি লিজনের সদস্য নই,' কাঠখোট্টা গলায় বলল অঁবিন। 'মসিয়ো রানাও নন। ওঁকে আমরা জোর করে শিপে রেখে আসিনি। স্বেচ্ছায় থেকে গেছেন। কী ধরনের বিপদ হতে পারে, সেটা জানার পরেও। তাঁর জন্য আমরা দায়ী নই।'

'মেজর?' পিনোঁর দিকে আশা নিয়ে তাকাল নেফি।

'আ... আমি দুঃখিত,' লজ্জিত গলায় বলল পিনোঁ। 'মসিয়ো অঁবিন ভুল বলেননি। এমনিতেই আজকের অপারেশনে দুজনকে হারিয়েছি আমি। এখন ফের কিছু করতে গিয়ে বাকিদের বিপদে ফেলতে পারি না।'

'ভয় পাচ্ছেন সেটা সরাসরি বলে দিলেই হয়,' মুখ ঝামটা দিল নেফি। 'সৈনিকের পোশাকে আপনারা আসলে কাপুরুষ!'

'অযথাই গালমন্দ করছেন আমাদের,' আহত গলায় বলল পিনোঁ। 'সাহায্য যদি করতেও চাই, মসিয়ো রানাকে ওরা কোথায়

নিয়ে গেছে সেটাই তো জানি না।'

'আমি জানি,' বলল সোহেল। 'মানে... আন্দাজ করতে পারি।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল মার্কোস। 'জানি আমরা।'

আশার আলো জ্বলে উঠল নেফারতিতির মনে। সাগ্রহে জানতে চাইল, 'কোথায়?'

'কন্টেইনার ফ্যাসিলিটি আর ভলকানিক লেক ছাড়া কোবায়াশির আরেকটা ঘাঁটির সন্ধান পেয়েছি আমরা,' সোহেল বলল। তাকাল নেফির দিকে। 'মনে আছে, কন্টেইনার ফ্যাসিলিটির ওই ডাম্প ট্রাকগুলোর ব্যাপারে আমাকে খোঁজ নিতে বলেছিল রানা? গতকাল ভোর থেকে ফ্যাসিলিটির বাইরে বসে ছিলাম আমি আর মার্কোস। সন্ধ্যায় ওখান থেকে একটা ডাম্প ট্রাক বেরুতেই পিছু নিয়েছিলাম ওটার। শহর থেকে বেরিয়ে পশ্চিমে গেছে ট্রাকটা—ক্যানাল পেরিয়ে *পেনোনোম* শহরের দিকে। শহরের বিশ মাইল দূরে রয়েছে একটা প্রাইভেট রোড, সেটা ধরে শেষ পর্যন্ত গিয়ে ঢুকেছে লাস মাইনাস দেল ভিয়েন্তে ডিয়াব্‌লোস-এ।'

'কী ওটা?'

'খনি। দ্য টোয়েণ্টি ডেভিলস্ মাইন।'

'কীসের খনি?'

'সোনার। রাস্তায় ওদিককার এক গ্রামবাসীকে পেয়েছিলাম। সে-ই বলল।'

একটু বিভ্রান্ত দেখাল নেফিকে। 'আমি জানতাম পানামার এদিকটায় রূপার খনি ছাড়া আর কিছু নেই। সোনার খনি সব দারিয়েন প্রভিন্সে। সেগুলোও অন্তত একশো বছর আগে নিঃশেষ হয়ে গেছে।'

'এটাও বহুকাল ধরে বন্ধ, তাই লোকে ভুলে গেছে,' ব্যাখ্যা

দিল মার্কোস।

'হুম, তারপর?'

'ট্রাকটাকে ওখানে ঢুকতে দেখে আজ সকালে আমরা যোগাযোগ করেছিলাম পানামার খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে। অফিশিয়ালি কেউ কিছু বলতে রাজি হয়নি, শেষ পর্যন্ত জুনিয়র এক ক্লার্ককে ঘুষ দিয়ে জেনেছি, ছ'মাস আগে আবার খোলা হয়েছে খনিটা। বিদেশি এক কোম্পানি নাকি লিজ নিয়েছে ওটা। তবে কোম্পানির নাম বা ওখান থেকে নতুন করে সোনা উত্তোলন করা গেছে কি না—সে-সব বলতে পারেনি সে। অবশ্য কোম্পানিটা যে কোবায়াশি, তা আন্দাজ করতে অসুবিধে হয় না।'

'ইণ্টারেস্টিং!' মন্তব্য করল নেফারতিতি। 'লেকে এখনও ইনকাদের ট্রেজার পাওয়া যায়নি, দেখে এসেছি আমরা। তা হলে কি ধরে নেব, ওয়্যারহাউসে দেখা ওই সোনা টোয়েণ্টি ডেভিলস্ মাইন থেকে এসেছে?'

'এখুনি সেটা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না,' বলল সোহেল। 'তবে লেকের মত ওখানেও গোপনে অপারেশন চালাচ্ছে কোবায়াশি—এটা পরিষ্কার। রানাকে নিয়ে ওদের হেলিকপ্টার যদি ভলকানিক লেক বা কণ্টেইনার টার্মিনালে না গিয়ে থাকে, ওখানে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।'

'স্রেফ ধারণার উপর কথা বলছেন আপনারা,' বিরক্তি ফুটল আঁবিনের কণ্ঠে। 'আর ওই খনিও যে কোবায়াশির, সেটা ভাবছেন কেন? ওরা একটা মেরিটাইম কোম্পানি... এমন হতে পারে না, মাইনিং কোম্পানির কাছ থেকে ট্রাকের মাধ্যমে আকরিক সংগ্রহ করছে ওরা, কণ্টেইনার পোর্ট থেকে জাহাজে তুলে অন্য কোথাও পাঠাবার জন্য?'

সরু চোখে ওর দিকে তাকাল সোহেল। 'আপনি যা বলছেন, তা-ও কি স্রেফ ধারণা থেকে নয়? শুনুন, তা হলে আরেকটা

সম্ভাবনার কথা বলি। চোরাই ইউরেনিয়াম লুকানোর জন্য পরিত্যক্ত খনি একটা চমৎকার জায়গা। হেলিকপ্টারটা যদি ওখানে পাওয়া যায়... তা হলে কি বিশ্বাস করবেন, ওটা কোবায়াশির ঘাঁটি?'

ইতস্তত করল ফরাসি এজেন্ট, পাল্টা কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

'দেখুন, খনিটাকে সন্দেহ করবার কিন্তু আরও কারণ আছে,' যোগ করল সোহেল। 'কোবায়াশি ওখান থেকে আকরিক সংগ্রহ করছে না। করছে ঠিক উল্টোটা। যে-ট্রাকটাকে আমরা ফলো করেছি, সেটায় নুড়ি ভরা ছিল। ঝাঁকি খেলেই ছিটকে পড়ছিল ছোটবড় পাথর। পোর্ট থেকে নুড়ি নেয়া হবে কেন ওখানে? বরং খালি ট্রাক গিয়ে আকরিকের নুড়ি ভরে ফিরে আসার কথা। আমার তো মনে হচ্ছে জাহাজে ভরে ওই নুড়ি নিয়ে আসা হচ্ছে বন্দরে, তারপর ট্রাকে তুলে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে খনিতে।'

'কী বলছেন! কেন?'

সোফায় হেলান দিল সোহেল। 'সেটা জানার উপায় হচ্ছে ওখানে গিয়ে উঁকি মেরে দেখা। কী বলেন? আর সে-কাজ করতে গিয়ে যদি রানাকে পেয়েই যাই, আপত্তি আছে কোনও?'

চোখাচোখি করল অঁবিন আর পিনোঁ। তারপর বলল, 'না, নেই।'

আঠারো

হিমশীতল পানির প্রচণ্ড এক ঝাপটায় জ্ঞান ফিরে পেল রানা। চেতনানাশক ইঞ্জেকশন দিয়ে গত ছ'ঘণ্টা ধরে স্যাঁতসেঁতে এক প্রকোষ্ঠে ফেলে রাখা হয়েছিল ওকে। পানির শক্তিশালী ধারা যেন মুগুরের মত আঘাত করল ওর গায়ে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গড়ান দিল... সরে যেতে চাইল, কিন্তু ফায়ার হোস ধরা হাতদুটো অনুসরণ করল রানাকে। দেয়ালে ঠেকে গেল ওর দেহ, তার উপরে এমনভাবে পানি ছুঁড়তে থাকল লোকটা, যেন ওয়াটারজেট দিয়ে মেঝেতে জমে থাকা কোনও ময়লা পরিষ্কার করছে। অসহায়ের মত এই অত্যাচার সহ্য করা ছাড়া উপায় রইল না।

কয়েক মুহূর্ত পর শোনা গেল একটা ভারী গলা। আদেশ পেয়ে হোস বন্ধ করল লোকটা। হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে বসল রানা। কণ্ঠের উৎসের দিকে তাকাবার চেষ্টা করতেই চোখ ঝলসে গেল হ্যাণ্ডহেল্ড হ্যালাইড লাইটের শক্তিশালী আলোয়। তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিল ও।

আবার শোনা গেল আদেশমাখা কণ্ঠ, তারপর বুটপরা পদশব্দ। চলে যাচ্ছে হোস অপারেটর।

ধীরে ধীরে এবার চোখ খুলল রানা। ধাঁধানো দৃষ্টি দিয়ে তাকাল সামনে। মাথার উপরে একটা নিঃসঙ্গ বালব জ্বলছে—ছোট্ট প্রকোষ্ঠ আলোকিত করবার জন্য ওটাই যথেষ্ট।

হ্যালাইড লাইটটা ব্যবহার করা হচ্ছে দৃষ্টিশক্তিকে পীড়া দেবার জন্য। ধরা পড়বার পর থেকে এখন পর্যন্ত কিছুই খেতে দেয়া হয়নি ওকে, পানিও মেলেনি তৃষ্ণা নিবারণের জন্য। হেলিকপ্টার থেকে নামাবার আগে মাথা ঢেকে দেয়া হয়েছিল কালো কাপড় দিয়ে, এরপর পুশ করা হয়েছে ইঞ্জেকশন। এখন আবার কড়া আলোয় চোখ ঝলসে দেয়া হচ্ছে দেহকে সহ্যশক্তির শেষ সীমায় নিয়ে যাবার জন্য। এ-সবই টর্চারের বেসিক টেকনিক।

গা থেকে সমস্ত কাপড় খুলে নেয়া হয়েছে রানার, রয়েছে স্রেফ একটা বক্সার শর্টস্। ভেজা শরীর কাঁপছে ঠাণ্ডায়। কামরায় কোনও আসবাবপত্র নেই, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়ল ও, দু'হাঁটু মুড়ে নিয়ে এল বুকের কাছে, হাতদুটো দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল। ওই অবস্থাতেই দ্রুত জরিপ করে নিল চারপাশ। দেখার মত তেমন কিছু নেই অবশ্য। চারদিক বন্ধ প্রকোষ্ঠ। কংক্রিটের দেয়াল। জানালা নেই। ভূগর্ভে কি? একটামাত্র দরজা, সেটার দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে দুজন ইউনিফর্ম পরা প্রহরী—নাকামুরার মার্সেনারি বাহিনীর সদস্য। একজন হাতের অত্যাধুনিক রাইফেল তাক করে রেখেছে ওর দিকে, অন্যজন হ্যালাইড লাইট ধরে রেখেছে ওর মুখ বরাবর।

চোখ বন্ধ করল না রানা, চেষ্টা করল দৃষ্টিকে প্রখর আলোর সঙ্গে মানিয়ে নিতে। একই সঙ্গে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবল পরিস্থিতি নিয়ে। এখনও বেঁচে আছে ও, তারমানে শত্রুদের কাছে ওর প্রয়োজন ফুরোয়নি। কিন্তু সেটা খুব আশাব্যঞ্জক কিছু নয়। নিশ্চয়ই ওর সঙ্গীদের সম্পর্কে জানতে চাইছে এরা। নেফারতিতি আর লিজনেয়াররা পালিয়ে গেছে। শত্রুদের পক্ষে জানা সম্ভব নয় ওর সঙ্গে ওরা ঠিক ক'জন ছিল, বা ওদের পরিচয় কী। সে-ব্যাপারেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। প্রায়-নগ্ন করে গায়ে পানি ঢালা, আর প্রখর আলোয় ঝলসে দেয়া... এ-সবই সেই

জিজ্ঞাসাবাদের উপক্রমণিকা মাত্র।

ইন্টারোগেশনটা কী ধরনের হতে চলেছে, তা পরিষ্কার। নির্যাতন করা হবে ওকে। ব্যাপারটা নতুন নয়, মনে মনে প্রস্তুতি নিতে শুরু করল রানা। চোখ মুদে অটো-সাজেশন দিতে থাকল নিজেকে—ব্যথা-বেদনার অনুভূতি যেন মস্তিষ্কে না পৌঁছায়। প্রয়োজনীয় তথ্যগুলোও যেন তলিয়ে যায় স্মৃতির সমুদ্রে, কিছুতেই যেন মুখ দিয়ে বেরিয়ে না আসে। ভয়ঙ্কর নির্যাতনের মুখে টিকে থাকার এটাই একমাত্র উপায়। তবে দক্ষ ইন্টারোগেটর এ-ধরনের প্রতিরোধ ভেঙে দিতে পারে। খুব শীঘ্রি জানা যাবে, এখানকার ইন্টারোগেটর সে-রকম যোগ্যতা রাখে কি না। শেষ পর্যন্ত যা-ই ঘটুক, ব্যাটার কাজটা যতটা পারে কঠিন করে তুলবে ও।

দশ মিনিট কেটে গেল নীরবে। তারপর শোনা গেল নতুন পদশব্দ। গম্ভীর একটা কণ্ঠ জাপানি ভাষায় নির্দেশ দিতেই নিভিয়ে দেয়া হলো হ্যালাইড লাইট। ধীরে ধীরে চোখ খুলল রানা, তাকাল সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির দিকে। জাপানি। খুব লম্বা নয়, মুখের একটা পাশ বিকৃত। পরনে দামি বিজনেস সুট। চোখে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। ছবি দেখেছে আগেই, তাই একে চিনতে অসুবিধে হলো না রানার। এক ও অদ্বিতীয় কেনজি নাকামুরা।

'হাই!' হাবভাব যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে সম্ভাষণ জানাল রানা। মনের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা যা-ই থাকুক, তা প্রকাশ করছে না।

'উঠে দাঁড়াও,' থমথমে গলায় ইংরেজিতে হুকুম করল নাকামুরা।

'দেখতেই পাচ্ছ গায়ে জামাকাপড় নেই,' হালকা গলায় বলল রানা, 'এ-অবস্থায় কাউকে বিরক্ত করা কি ঠিক? একটু ভদ্রস্থ হয়ে নিই, তারপর নাহয় এসো।'

'ফাজলামি কোরো না,' ক্রোধ ফুটল নাকামুরার কণ্ঠে। 'আমি

কে, বা তুমি কোথায় আছ... সে-ব্যাপারে কোনও ধারণা আছে?'

চারপাশে চোখ বোলানোর অভিনয় করল রানা। বলল, 'জায়গাটা চেনা মনে হচ্ছে না। তবে তোমাকে সম্ভবত টিভিতে দেখছি'। চর্মরোগের বিজ্ঞাপনে মডেল হিসেবে। মুখের ওটা দেখছি মেকাপ নয়!'

ঠোঁটের কোনা বেঁকে গেল নাকামুরার। 'আমাকে খেপানোর বৃথা চেষ্টা করছ তুমি, মি. রানা। ওটাই তোমার নাম তো? মাসুদ রানা?'

'উঁহুঁ। আমার নাম সতীনাথ ভাদুড়ি। একটা অটো-ক্যারিয়ারে চড়ে প্রমোদভ্রমণে বেরিয়েছিলাম... খামোকা তোমার লোকেরা আমাকে ধরে এনেছে। বিশ্বাস না হলে জাহাজের প্যাসেঞ্জার ম্যানিফেস্ট চেক করে দেখো।'

মাথা নাড়ল নাকামুরা, যেন হতাশ হয়েছে বন্দির আচরণে। 'প্যারিসে সামান্য ঝামেলা সৃষ্টি করেছিলে তুমি, কিন্তু এখন পরিণত হয়েছ পুরোদস্তুর একটা মাথাব্যথায়। জানতে পারি, কেন পদে পদে আমার কাজে বাধা সৃষ্টি করে চলেছ?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কী বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ওর কথা কানে না তুলে নাকামুরা বলল, 'তোমার ব্যাপারে মোটামুটি সবই জানা আছে আমার। একটা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন ফার্ম চালাও তুমি। আমার পিছনে কেন লেগেছ? কে ভাড়া করেছে তোমাকে? সিআইএ?'

আর অভিনয় করবার প্রয়োজন দেখল না রানা। উঠে দাঁড়িয়ে শান্ত গলায় বলল, 'কেউ না। আমি শুধু আমার বন্ধু ড. আলী হায়দারের খুনিকে খুঁজছিলাম। তবে এখন বুঝতে পারছি, ওটার জন্য তুমি দায়ী নও। ওর মৃত্যুটা ছিল দুর্ঘটনা। কাজেই অযথা আমাদের মধ্যে শত্রুতা তৈরি করে লাভ নেই কোনও। আমাকে যদি ছেড়ে দাও, তা হলে পরের ফ্লাইটেই আমি দেশে ফিরে যাব।

এখানে তুমি যা খুশি তাই করে বেড়াতে পারো, আমি তাতে নাক গলাব না। কারণ সিআইএ, এফবিআই, এসএসএ... কারও সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই আমার।'

'কথাটা সত্যি হলে খুশিই হতাম,' একটু হাসল নাকামুরা। 'কিন্তু সমস্যা হলো, তোমার কোনও কথা আমি বিশ্বাস করছি না। আমার ইনফরমেশন বলছে, তুমি আমেরিকান একটা সরকারি সংস্থার সঙ্গেও জড়িত... নুমার স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর। ওদের হয়ে বহুবার তুমি মার্কিনীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কাজ করেছ।'

'তা হলে বলব, ভুল ইনফরমেশন দেয়া হয়েছে তোমাকে। আমি কারও স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার নই। বরং আমার কারণে বহুবার আমেরিকার বহু অশুভ পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেছে।'

'আই ডোন্ট কেয়ার। তোমার কারণে যথেষ্ট সমস্যা পোহাতে হয়েছে আমাকে। এমন সব পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছি, যা নেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না। আমি ব্যবসায়ী মানুষ, কাজ আদায়ের জন্য টাকা ব্যবহার করি; কিন্তু তোমার কারণে বুলেটের আশ্রয় নিতে হয়েছে আমাকে... রক্ত ঝরাতে হয়েছে। পুরো অপারেশনটাই লেজেগোবরে হতে চলেছে তোমার অযাচিত নাক গলানোয়। কী করছি আমি তার কিছুই জানো না, খামোকা তাতে বাগড়া দিয়ে নিত্যনতুন গোলমাল তৈরি করছ। এর শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে।'

'কী করছ সেটা তা হলে খুলেই বলো। দেখি তোমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসা যায় কি না।'

'অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন আর বোঝাপড়ার সুযোগ নেই।'

'তা হলে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছ কেন? কপালে একটা গুলি করো... ঝামেলা চুকে যাক।'

ক্রূর হাসি হাসল নাকামুরা। 'তা-ই করা হবে। কিন্তু তার

আগে বেশ কিছু প্রশ্ন আছে আমার। সেগুলোর জবাব চাই।'

'কিচ্ছু বলব না আমি,' ক্রুদ্ধ গলায় বলল রানা। 'মরবই যখন, খামোকা মুখ খুলে লাভ কী?'

'লাভ এটুকুই যে, মৃত্যুটা শান্তিময় হবে। নইলে মরার আগে এমন কষ্ট দেয়া হবে, যাতে তোমার মনে হয় যে দুনিয়ায় জন্ম নিয়েই মস্ত ভুল করেছ।'

'ভয় দেখাচ্ছ?'

'না। সতর্ক করছি।'

গলা চড়িয়ে দুই প্রহরীকে ডাকল নাকামুরা। দু'পাশ থেকে রানাকে চেপে ধরল তারা, টেনে-হিঁচড়ে বের করে আনল প্রকোষ্ঠ থেকে। বাধা দিল না ও। ইন্টারোগেশন সইবার জন্য শক্তি সঞ্চয় করছে। অযথা ধস্তাধস্তি করে দুর্বল হয়ে পড়ার কোনও মানে হয় না।

সংকীর্ণ করিডর দিয়ে হাঁটিয়ে আরেকটা ঘরে নিয়ে আসা হলো ওকে। এটা আগেরটার চেয়ে বড়, একটু ঠাণ্ডাও। কামরার মাঝখানে রয়েছে একটা ধাতব টেবিল, সেটার উপর চিৎ করে শুইয়ে দেয়া হলো ওকে। হ্যাণ্ডকাফ আর লেদার স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে ফেলা হলো হাত-পা আর শরীর। নড়বার উপায় রইল না আর।

রানার মাথার কাছে এসে দাঁড়াল নাকামুরা। 'বিদায়, রানা। তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না আমার। আশা করি মরার আগে খুব বেশি ভোগাবে না নিজেকে।'

কিছু বলল না রানা। চোখের কোণে ধরা পড়ল নড়াচড়া। নতুন একজন মানুষ এসে ঢুকেছে ঘরে। নাকামুরার পাশে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখামাত্র অশুভ একটা অনুভূতি হলো ওর। পাক দিয়ে উঠল পেটের ভিতরটা। মানুষ তো নয় যেন ব্যাণ্ডেজখোলা একটা মমি। কঙ্কালসার দেহ, হাড়ের উপর কোনোমতে লেগে

রয়েছে চামড়া। চোখের দৃষ্টি শীতল, দ্যুতিহীন। চেহারা নিষ্প্রাণ। সব মিলিয়ে লোকটা যেন এ দুনিয়ার কেউ নয়, সাক্ষাৎ নরকের দূত। রানার দিকে চেয়ে হলুদ দাঁত বের করে হাসল—যেন হরিণশাবককে বাগে পেয়ে হাসছে হিংস্র হায়েনা।

'তুমি জানো, ড্রাগো, এই ভদ্রলোকের কাছ থেকে কী তথ্য আদায় করতে চাই আমি,' বলে উঠল নাকামুরা। 'সেগুলো যত দ্রুত সম্ভব বের করা চাই।'

জবাব না দিয়ে শুধু মাথা ঝাঁকাল সার্বিয়ান ইন্টারোগেটর। গটমট করে প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে গেল নাকামুরা।

এবার রানার উপর ঝুঁকে এল ড্রাগো। ফ্যাসফেঁসে গলায় বলল, 'বাংলাদেশি, না?' খোলা মুখ দিয়ে ভেসে এল পূতিময় দুর্গন্ধ। 'ভাল, আমার বন্ধুদের তালিকায় নতুন একটা দেশ যোগ হলো। দক্ষিণ এশিয়ান বন্ধু খুব একটা পাইনি আমি। বহুদিন আগে ভারতীয় একজনকে পেয়েছিলাম, সার্বিয়ান সীমান্তে চোরাচালান করত... তবে ওর সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে পারিনি। তাই ওকে গোনায় ধরি না। তবে হ্যাঁ, শ্রীলঙ্কায় কাজ করতে গিয়ে ওখানকার একজনকে পেয়েছিলাম... আমার বন্ধুদের তালিকায় ও-ই ছিল সেরা।'

হাসি হাসি মুখে কথা বলছে লোকটা। তলপেটে শিরশিরে অনুভূতি হলো রানার। ভিকটিমদেরকে বন্ধু বলে ডাকছে... কথাবার্তার ঢঙেই বোঝা যাচ্ছে, লোকটা স্রেফ পেশাদার কোনও ইন্টারোগেটর নয়, সাইকোলজিক্যাল সমস্যা আছে তার। একজন সাইকোপ্যাথ! বন্দিদের উপর নির্যাতন চালানো শুধু তার দায়িত্ব পালনের অংশ নয়, ওটা তার অন্যতম বিনোদনও বটে। জীবন উপভোগের একটা মাধ্যম! এ-ধরনের সাইকোপ্যাথ সম্পর্কে খুব ভালই জানা আছে রানার, তাই উপলব্ধিটা ভয় জাগিয়ে তুলল। ঠাণ্ডা প্রকোষ্ঠের মাঝেও ঘাম জমল কপালে।

'আমার ওই শ্রীলঙ্কান বন্ধু মস্ত এক অন্যায় করেছিল,' বলে চলেছে ড্রাগো, 'আমাদের সবার অজান্তে আঙুলের একটা নখ বড় করে ফেলেছিল ও। এক রাতে কী করল, জানো? বন্দিশালার দেয়ালে ঘষে নখটা ধারালো করে তুলল, তারপর ওটা দিয়ে নিজের জিভের তলার পাতলা চামড়াটা কেটে ফেলল। সকালে গিয়ে দেখি, গলায় জিভ আটকে দমবন্ধ হয়ে মারা গেছে সে। খুব দুঃখ পেয়েছিলাম।' চুক চুক শব্দ করল টাকরা দিয়ে। 'শেষদিকে আমাদের আলাপ অতটা ভাল হতো না, তারপরেও... শুরুর দিকে চমৎকার সময় কেটেছে আমাদের। এখনও বুঝে উঠতে পারি না অতদিন কী করে কথা বলেছে ও। মাসের পর মাস টিকে ছিল... সত্যিই রিমার্কেবল!'

বুঝতে অসুবিধে হলো না, কথা বলা মানে চিৎকার করা। আলাপ মানে ড্রাগোর ইন্টারোগেশনের একেকটা পর্ব।

'যাক গে,' বলল ড্রাগো। 'এবার তোমার পালা। দুঃখের বিষয়, চাইলেও আমাদের বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হবে না। মি. নাকামুরা একটা টাইমটেবল বেঁধে দিয়েছেন। তবে এই স্বল্প সময়টা উপভোগ্য করে তুলতে তো দোষ নেই। কী বলো?'

রানার মাথার পাশে একটা কালো কাপড়ের পাউচ রাখল সে। বাঁধন খুলে বিছাল ওটাকে। ভিতরে আকুপাংচারের সুঁই দেখতে পেল রানা। শত শত।

অটো-ক্যারিয়ারে ধরা পড়ার সময় রানা আন্দাজ করেছিল, এ-ধরনের কিছু একটা অপেক্ষা করছে ওর জন্য। তারপরেও যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, এই ভেবে লড়তে যায়নি। কিন্তু এখন... ড্রাগো ও তার সুঁইগুলোকে দেখে... মনে হচ্ছে ভুল করেছে। তখন লড়াই করে মরে যাওয়াই বোধহয় ভাল ছিল।

'মানুষের মুখ খোলানোর অনেক তরিকা আছে,' আলাপ চালাবার ভঙ্গিতে বলল ড্রাগো। 'মৃত্যুভয়টাই বেশিরভাগ লোকের

ক্ষেত্রে কাজ করে। কিন্তু তুমি বোধহয় জেনে গেছ যে, সবকিছুর পরেও বাঁচার কোনও আশা নেই তোমার... কাজেই মৃত্যুভয় দেখিয়ে বিশেষ লাভ হবে বলে মনে হয় না। তাই অন্য কোনও পন্থা অবলম্বন করতে হবে। মিউটিলেশন, বা অঙ্গব্যবচ্ছেদ আরেকটা কার্যকর পদ্ধতি... হাত-পা, চোখ-কান বা আঙুল হারাবার আশঙ্কাকে মৃত্যুর চেয়েও বেশি ভয় পায় লোকে। আফটার অল, চিরতরে কে-ই বা পঙ্গু হতে চায়, তাই না? কিন্তু তুমি যেহেতু এমনিতেই মরতে বসেছ, চিরতরে পঙ্গু হওয়া নিয়ে মাথা ঘামাবে বলে বিশ্বাস করি না। নট মাচ অভ আ থ্রেট, রাইট?'

'কাজ তো হচ্ছে মনে হয়,' শুকনো গলায় বলল রানা। গলা শুকিয়ে শিরিষ কাগজের মত খসখসে ঠেকছে। 'কী জানতে চাও, সেটা জিজ্ঞেস করে ফেলো।'

দাঁত দেখাল ড্রাগো। ঠোঁটের কোণ থেকে ঝরে পড়ল মরা, শুকনো চামড়া। 'ঠাট্টা করছ তুমি, মি. রানা। আমাদের আলাপ তো এখনও শুরুই হয়নি। প্রথমে আমি তোমাকে বিশ্বাস করাব, আমি যা করতে চলেছি, তার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল। এরপরেই তুমি ঠিক ঠিক জবাব দিতে শুরু করবে। আর ওই জবাবগুলোর প্রতিদান হিসেবে আমি তোমাকে গ্রহণযোগ্য একটা মৃত্যু উপহার দেব। ক্লিয়ার?'

প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা করল না সে, পাউচ থেকে সুঁই বের করে গাঁথতে শুরু করল রানার শরীরে। ব্যথা সহ্য করবার জন্য শরীর শক্ত করে ফেলল রানা, তবে তার প্রয়োজন ছিল না। পিঁপড়ের কামড়ের মত মৃদু খোঁচা লাগছে... সামান্য অস্বস্তি ছাড়া ওটা আর কিছু না। দেখতে দেখতে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় চল্লিশটা সুঁই গেঁথে দিল ড্রাগো। বেশিরভাগই গলা, বুক আর পেটে। অল্প কয়েকটা গাঁথা হয়েছে হাতের আঙুলগুলোর ফাঁকে, আর দুই গোড়ালিতে।

'হয়ে গেছে,' পিছিয়ে গিয়ে দক্ষ পেইন্টারের মত নিজের কীর্তি পরখ করল সার্বিয়ান ইন্টারোগেটর। 'তোমার নার্ভাস সিস্টেমের মেরিডিয়ান পাথগুলো খুলে দিয়েছি। তারমানে যেসব স্নায়ু সাধারণত ঘুমিয়ে থাকে, তাদেরকে জাগিয়ে তোলা হয়েছে। শরীরকে করে তোলা হয়েছে তানপুরার মত সংবেদনশীল। তোমার ব্রেনের উপর চাপ বেড়েছে, বাড়তি স্নায়ুগুলোর পাঠানো তথ্য প্রসেস করবার জন্য খাটতে হচ্ছে ওটাকে। একটু কি ক্লান্তি বোধ করছ?'

'জাহান্নামে যাও!' দুর্বল গলায় গাল দিল রানা। কিন্তু টের পেল, একবিন্দু মিথ্যে বলেনি লোকটা। সত্যিই অনুভূতির প্রখরতা বেড়ে গেছে ওর। এমন অনুভূতি আর কখনও হয়নি। চুলের গোড়ায় সরসরানি, হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি স্পন্দন, শিরা-উপশিরায় রক্তের স্রোত... সবই অনুভব করতে পারছে ও। এমনকী ভেজা গায়ে বাতাসের আলতো ছোঁয়াও লাগছে ঝাপটার মত। ঢোক গিলল ও। আর সব অনুভূতির মত ভয়ের অনুভূতিটাও যেন বেড়ে গেছে অনেক।

রানার উপরে আবারও ঝুঁকল ড্রাগো। দুর্গন্ধময় শ্বাস ছেড়ে বলল, 'এটা চায়নিজ টেকনিক। চিনের বিশেষ ধরনের বেশ্যালয়ে পুরুষদেরকে এই টেকনিকের মাধ্যমে চরম আনন্দ দেয়া হয়... সেক্সকে করে তোলা হয় স্বর্গীয় এক অভিজ্ঞতা। এমন গল্পও আছে, এক প্রতিশোধপরায়ণ চিনা রক্ষিতা তার রাজাকে এভাবে চরম আনন্দ দিয়ে হত্যা করেছিল। টানা আটদিন অর্গাজমের পর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গিয়েছিল তার। ইন্টারেস্টিং, তাই না?'

কিছু বলতে পারল না রানা। ওর শরীর কাঁপছে।

সোজা হলো ড্রাগো। 'কিন্তু তোমার কপালে সেটা জুটছে না। চরম আনন্দ নয়, তোমার জন্যে রয়েছে চরম কষ্ট। প্রমাণ চাও?' একটা সুঁই তুলে রানার কাঁধে ঘ্যাচ করে গেঁথে দিল সে।

সমস্ত প্রতিরোধ কর্পূরের মত উবে গেল, ইচ্ছের বিরুদ্ধে চিৎকার করে উঠল রানা। সুঁই নয়, যেন আগুনে ঝলসানো একটা ছুরি ঢোকানো হয়েছে ওর কাঁধে। এই ব্যথার কোনও নাম নেই, আছে শুধু অসহনীয় এক অনুভূতি। কুঁচকে যেতে চাইল ও টেবিলের উপর, কিন্তু হাত-পা বাঁধা থাকায় সেটা সম্ভব হলো না। শুধু ঝটকা দিল শরীর। ফুঁপিয়ে উঠল পরক্ষণে।

'প্লিজ! না!'

সুঁইটা বের করে নিল ড্রাগো। 'এটুকুতেই হার মানলে? ভেবে দেখো, সুঁইটা যদি তোমার হৃৎপিণ্ডে ঢোকাই, তা হলে কেমন লাগবে?' বিজয়ীর ভঙ্গিতে হাসল সে। 'বেশ, আরেকটা পরীক্ষা হয়ে যাক।' সুঁইটা এবার রানার ডান কানের পিছনে নিয়ে গেল সে, কানের গোড়ার নরম মাংসে ধীরে ধীরে গাঁথতে শুরু করল।

এবার আর চিৎকার করল না রানা, সে-উপায় আর নেই। তীব্র, অকল্পনীয় ব্যথায় কণ্ঠস্বর হারিয়েছে ও। দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল, হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত কাঁপতে থাকল দেহ। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল ফেনা।

ত্রিশ সেকেণ্ড রানাকে এ-অবস্থায় রাখল ড্রাগো, তারপর সরিয়ে নিল সুঁইটা। এবার আর্তনাদ করে উঠল রানা।

ওকে থামবার সময় দিল সার্বিয়ান ইণ্টারোগেটর। তারপর বলল, 'আশা করি এবার বুঝতে পারছ তোমার কী হাল করতে পারি আমি।' সিরিয়াস ভঙ্গিতে এখন কথা বলছে সে। 'কষ্টটা এড়ানোর একটাই সুযোগ দিচ্ছি... ভালয় ভালয় মি. নাকামুরার প্রশ্নগুলোর জবাব দেবে কি না বলো।'

'জিজ্ঞেস করো,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রানা। গলায় পরাজয়ের ছাপ।

'গুড।' রানার মাথার পাশে একটা মাইক্রো-রেকর্ডার রাখল ড্রাগো। বাটন টিপে জিজ্ঞেস করল, 'কোবায়াশির ওয়্যারহাউসে

কি তুমিই হানা দিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'কী দেখেছ ওখানে?'

'সোনা।'

'কে ছিল তোমার সঙ্গে?'

'ফেলিক্স লেইটার,' কাল্পনিক স্পাই জেমস বণ্ডের আমেরিকান বন্ধুর নাম আওড়াল রানা। ধাতস্থ হয়ে উঠেছে, কাজে লাগাচ্ছে বিসিআইয়ের ট্রেইনিঙে শেখা কাউন্টার-ইন্টারোগেশন টেকনিক।

জেমস বণ্ডের চলচ্চিত্র বা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত নয় ড্রাগো, নামটা শুনে কিছু সন্দেহ করল না। শুধু জিজ্ঞেস করল, 'কে সে?'

'সিআইএ এজেন্ট। তার বেশি কিছু জানি না।'

'পোর্ট ফ্যাসিলিটি থেকে সিআইএ-র টিমই কি তোমাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছিল?'

'না। ওরা মার্সেনারি। বোগোটা থেকে উড়িয়ে আনা হয়েছে আমাদেরকে সাহায্য করবার জন্য।'

পরের পনেরো মিনিট নিখুঁত অভিনয় চালিয়ে গেল রানা। বানোয়াট এক গল্প ফেঁদে বসল সিআইএ-র নামে। সেটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলল একের পর এক কোডনেম, আর ভুয়া সেফহাউসের বর্ণনা দিয়ে। নাকামুরা যা সন্দেহ করছে, তা-ই শুনিয়ে চলেছে। বোঝাতে চাইছে যে, আমেরিকা সন্দিহান হয়ে উঠেছে নাকামুরার পানামা অপারেশন নিয়ে, কিন্তু এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কিছু আবিষ্কার করতে পারেনি। এমন একটা ভাব করল, হাল ছেড়ে দেবার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তারা। রানা ধরা পড়ায় পিছু হটবে নিঃসন্দেহে, কোনও ধরনের কেলেঙ্কারিতে জড়াবার ঝুঁকি নেবে না।

ড্রাগো দক্ষ ইন্টারোগেটর। যে-কোনও সাক্ষ্যের সত্যমিথ্যা যাচাই করবার সমস্ত পদ্ধতি জানে। ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে একের পর

এক প্রশ্ন করে চলল, চেষ্টা করছে বন্দির বক্তব্যে ছোটখাট হলেও কোনও ফাঁক খুঁজে বের করতে... যাতে বুঝতে পারে সে মিথ্যে বলছে কি না। কিন্তু বেচারার জানা নেই, দুনিয়ার সেরা এক্সপার্টদের কাছে কাউন্টার ইন্টারোগেশনের প্রশিক্ষণ পেয়েছে রানা। বুলেটের গতিতে আসা প্রশ্নবাণের মুখে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না, ঠিক ঠিক জবাব দিয়ে চলল মিথ্যার পর মিথ্যা সাজিয়ে। কী বলছে না বলছে, সেটা খেয়াল রাখছে ভাল করে। পরে একই প্রশ্ন দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার করা হলেও জবাব দিচ্ছে সেই আগেরটাই।

একঘণ্টা কাটল। ড্রাগোর চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝে ফেলল রানা, মোটামুটি কনভিন্সড্ হয়ে গেছে সে। ধরে নিয়েছে রানা সত্যি কথাই বলছে। কিন্তু সেটা সুসংবাদ নয়। ইন্টারোগেশনের সমাপ্তি ঘটবে শীঘ্রি... তারমানে রানার বেঁচে থাকারও। বড় করে শ্বাস নিল ও। অভিনয়ের ইতি টানার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মনে মনে প্রার্থনা করল, একটু পর যা শুরু হবে, সেটা যেন সহ্য করতে পারে।

'মার্সেনারিরা কোত্থেকে যেন এসেছিল?' পুরনো প্রশ্ন আবারও শোনা গেল ড্রাগোর ঠোঁটে।

'কলাম্বিয়া,' বলল রানা। 'ম্যাডেলিন থেকে চার্টার করা একটা বিমানে উড়িয়ে আনা হয়েছিল ওদেরকে।' ভুলটা ইচ্ছাকৃত... ইন্টারোগেটরের মনে খটকা লাগিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট।

তা-ই ঘটল। মুহূর্তেই বদলে গেল ড্রাগোর চেহারা। ভ্রূকুটি করে রানার দিকে তাকাল সে। বলল, 'একটু আগেই তুমি বোগোটা বলেছিলে। এখন সেটা ম্যাডেলিন হয়ে গেল কীভাবে?'

'তা-ই নাকি?' থতমত খাওয়ার অভিনয় করল রানা। 'আ... আসলে ঠিক মনে নেই আমার।'

ড্রাগোর হাত নড়ে উঠতে দেখল ও। পরক্ষণে আর্তনাদ করে

উঠল তীব্র যন্ত্রণায়। মনে হলো পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে ওর মাথায়। যেন পুড়তে শুরু করেছে চুল, ছাই হয়ে যাচ্ছে। ব্যথাটা ছড়িয়ে পড়েছে পুরো খুলি জুড়ে। রানা জানে, আগুন আসলে ধরানো হয়নি; সুঁই ঢুকিয়ে ইলেকট্রিকাল ইমপালস তৈরি করেছে সার্বিয়ান ইন্টারোগেটর, খেলছে ওর বডি কেমিস্ট্রি নিয়ে। কিন্তু উপলব্ধিটা কাজে এল না কোনও। ক্রমাগত চিৎকার করতে থাকল ও অসহ্য কষ্টে।

ড্রাগোর চেহারায় ফুটে উঠেছে উত্তেজনার ছাপ। শিকারের আর্তনাদ তার কানে মধু বর্ষণ করছে। একজন স্যাডিস্টের জন্য তা ভীষণ আনন্দের।

একটু পর সুঁইটা বের করে আনল সে। নিচু হয়ে বলল, 'কী, শিক্ষা হয়েছে? এবার সত্যি কথা বলবে তো?'

কোনোমতে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'বোগোটা, না ম্যাডেলিন?'

রানা কিছু বলছে না দেখে দুটো সুঁই নিল ড্রাগো। একটা ঢোকাল ওর বুকের বামপাশে, অন্যটা ডান নিপলের তলায়।

আবারও কেঁপে উঠল রানা। এবার আগুন নয়, ইলেকট্রিক শকের স্বাদ পাচ্ছে ও। শরীরের মাঝ দিয়ে যেন বয়ে যাচ্ছে কয়েক হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ। দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি শুরু হয়ে গেল, চিৎকার করতে পারছে না।

'কথা বলো!' চেঁচাল ড্রাগো। 'বোগোটা, নাকি ম্যাডেলিন?'

'বোগোটা!' কোনোমতে শব্দটা বেরুল রানার মুখ দিয়ে।

সেটাই হলো ভুল। প্রথমটা ইচ্ছাকৃত ছিল, এবারেরটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। ওর উচিত ছিল প্রথম ভুলটা আঁকড়ে ধরে থাকা, তা হলে ওর পুরো গল্পের খুঁটিনাটি ব্যবচ্ছেদ করতে বাধ্য হতো ড্রাগো, অনেক সময় লেগে যেত তাতে। কিন্তু বোগোটার নাম শুনে থমকে গেল সে। কয়েক মুহূর্ত পলকহীন চোখে তাকিয়ে

থাকল রানার দিকে। শেষে বুঝে ফেলল, গত একটি ঘণ্টা বোকা বানানো হয়েছে তাকে। সম্পূর্ণ মনগড়া এক কাহিনি শুনিয়েছে তাকে এই ধুরন্ধর বাঙালি যুবক, আর সে-ও তা বিশ্বাস করেছে। তার এত বছরের অভিজ্ঞতায় এই প্রথম কেউ তাকে ধোঁকা দিল।

রেগে ওঠা উচিত ড্রাগোর, কিন্তু রাগল না। তার বদলে দৃষ্টিতে ফুটে উঠল প্রশংসা। সুঁইদুটো বের করে নিল সে। হাসিমুখে বলল, 'চমৎকার, মি. রানা! রিয়েলি ইম্প্রেসিভ! এই পরিস্থিতিতে আমাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা... নাহ্, বুকের পাটা আছে বটে। আমি আরেকটু হলে ফাঁদটায় পা দিয়েই ফেলেছিলাম প্রায়।'

ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল রানা।

'আবার আমরা প্রথম থেকে শুরু করব,' বলল ড্রাগো। 'তবে এবার আর কোনও দয়ামায়া দেখানো হবে না। একটা সুযোগ দিয়েছিলাম, সেটা তুমি হেলায় হারিয়েছ।'

আবারও শুরু হলো নির্যাতন। এবার আগের চেয়ে অনেকগুণ তীব্র আকারে। দক্ষ শিল্পীর মত রানার দেহে নিজের সেরা কলাকৌশল প্রয়োগ করতে থাকল ড্রাগো। অবিশ্বাস্য, অপার্থিব যন্ত্রণার সাগরে ভেসে গেল রানা—সাগরের মতই জোয়ার এল, ভাটা এল... সবই যন্ত্রণার। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ আর রইল না... কখনও চেঁচাল, কখনও কাঁদল, কখনও বা অকথ্য ভাষায় গালাগালের তুবড়ি ছুটল ওর মুখ দিয়ে। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গেল ও; টের পেল না কত সময় পেরুচ্ছে। পড়ে পড়ে শুধু সহ্য করে গেল অবর্ণনীয় কষ্ট। শুধু সুঁইয়ের খোঁচায় যে মানুষকে এতটা ব্যথা দেয়া সম্ভব, তা আগে জানা ছিল না ওর। প্রশ্ন খুব কম করছে ড্রাগো, নির্যাতনের দিকেই তার নজর। বিকৃত আনন্দে জ্বলজ্বল করছে তার চেহারা। এমন শিকারই চাইছিল সে এতদিন থেকে।

একসময় টের পেল রানা, পরাস্ত হতে চলেছে ও। ওর ট্রেইনিং, বা শারীরিক সহ্যশক্তি আর কাজে আসছে না। মানবদেহ এই ধরনের নির্যাতন সইবার মত করে তৈরি হয়নি। চরম কষ্টের ভিতরেও আতঙ্কিত হয়ে উঠল—মুখ খোলা মানে শুধু ওর সঙ্গীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা নয়; নিজের আত্মবিশ্বাস... নিজের সত্তার কাছে পরাজয়। এ হতে দেয়া যায় না।

কাউন্টার ইন্টারোগেশনের ইন্সট্রাকটরের কথা মনে পড়ল ওর—সহ্যশক্তি যখন ফুরিয়ে আসবে, তখন মগজকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে দেহ থেকে। খুঁজে নিতে হবে একটা নোঙর... এমন কিছু, বা এমন কেউ... যাকে আঁকড়ে ধরে ভুলে যাওয়া যায় সবকিছু; নিজেকে আলাদা করে ফেলা যায় বাস্তবতা থেকে। তা-ই চেষ্টা করল ও, খুঁজে নিতে চাইল নিজের নোঙর। প্রিয় বন্ধুদের মুখ ভিড় করল চোখের সামনে, একে একে হারিয়ে গেল ওরা... কাউকেই অবলম্বন হিসেবে পেল না। উদয় হলো রেবেকা, সোহানা আর তিশার মত ভালবাসার মানুষগুলো... কিন্তু ওরাও মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে। রাঙার মা'র কথা ভাবল, ভাবল মোখলেসের কথা কেউ কাজে এল না। ছেলেবেলায় শেষ দেখা মা-বাবার চেহারাদুটোও উঁকি দিয়ে ক্ষণিকেই হারিয়ে গেল।

আর সম্ভব নয়। পরাজয় মেনে নিতে তৈরি হয়ে গেল রানা। কোনও মানে হয় না এভাবে কষ্ট পাবার। সব বলে দিলেই হয়। এরপর কী ঘটবে না ঘটবে তাতে ওর কী? ও তো মরেই যাবে। এরচেয়ে মৃত্যু আর কতই বা খারাপ হতে পারে? ঘুমিয়ে পড়বে ও, চলে যাবে চিরস্বস্তিকর প্রশান্তির মধ্যে, জাগবে না আর কোনোদিন। সেটা ভাল নয়?

মুখ খুলতে গেল রানা... আর তখুনি... হঠাৎ... মনের কোন্ গহীন কোণ থেকে যেন উদয় হলো একজোড়া চোখ। কাঁচাপাকা ভুরুর তলায় কঠিন এক দৃষ্টি, কটমট করে তাকিয়ে আছে ওর

দিকে। আস্তে আস্তে ভেসে উঠল বলিরেখায় ঢাকা গোটা চেহারা। ঠোঁটের কোণে ঝুলছে একটা জ্বলন্ত চুরুট। মুখ নড়ল না, কিন্তু কানের পর্দায় পরিষ্কার বেজে উঠল গুরুগম্ভীর গলা।

'মনে রেখো, রানা... তুমি ভাঙবে, কিন্তু মচকাবে না; মরবে, কিন্তু হার মানবে না!'

প্রথম মিশনে যাবার আগে ওকে কথাটা বলেছিলেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। রানাও নিজের অজান্তে ওটাকে জীবনের ব্রত করে নিয়েছিল সেদিন। আজ আবার যেন তা মনে করিয়ে দিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে যেন বদলে গেল সব... হারিয়ে গেল ব্যথা-বেদনা। সম্পূর্ণ সচেতন ও, টের পাচ্ছে পারিপার্শ্বিক সবকিছু, কিন্তু অনুভব করছে না। রানার পেটের কাছে আরেকটা সুঁই ঢোকাল ড্রাগো। তীব্র ব্যথার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল রানার দুই পায়ে, যেন স্লেজহ্যামার দিয়ে হাঁটুদুটো গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু চিৎকার করল না ও। তাকিয়ে রইল মানসপটে ভেসে থাকা মানুষটির চোখের দিকে। নিজের কাছেই একটু অবিশ্বাস্য ঠেকছে... দুনিয়ায় এত মানুষ থাকতে ইনিই কি না ওর শেষ ভরসা হয়ে দাঁড়ালেন? মৃত্যুর দোরগোড়ায় অন্তরের অন্তস্তল থেকে যে-মানুষটি উঠে এলেন, তিনি ওই রসকষহীন কট্টর বুড়ো? মানুষটা ওর এতই আপন? কই, আগে তো কখনও এমন মনে হয়নি! খালি বকে, খালি বকে... মাঝে মাঝে একটু ভালবাসে!

বিড়বিড় করে ও বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যর। আপনার আদেশ শিরোধার্য। আর যা-ই ঘটুক, আমি মচকাচ্ছি না।'

'জবাব দাও!' চেঁচিয়ে উঠল ড্রাগো। 'কীভাবে ঢুকেছিলে তুমি পোর্ট ফ্যাসিলিটিতে?'

সাজানো জবাবটা পুরোপুরি মনে আছে রানার—ট্রাকে চড়ে ঢুকেছিল। খাবারের ট্রাক... মালবাহী ট্রাক নয়। চাইলে জবাবটা দিয়ে দিতে পারে ঠাণ্ডা মাথায়। কিন্তু দিল না। আর্তনাদও করল

না। পড়ে রইল চুপচাপ। রোখ চেপে গেছে, শয়তানটাকে আর কিচ্ছু বলবে না। ব্যথায় চিৎকার করে তার আনন্দও জোগাবে না। দেখা যাক ব্যাটা, কদ্দূর কী করতে পারে।

আরও কিছুক্ষণ চেষ্টা চালিয়ে গেল ড্রাগো। শেষে হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো। এভাবে আর কত? শিকার যদি মুখ না খোলে... যদি আর্তনাদ না করে, সবই অর্থহীন। পরাজয়ের গ্লানিতে ভরে গেল তার চেহারা। চোখে ফুটল অবিশ্বাস।

'আনবিলিভেবল!' বলল সে। 'সত্যি, দারুণ দেখালে তুমি, মাসুদ রানা। এই প্রথম কাউকে আমার সুঁইয়ের মুখে এভাবে টিকে যেতে দেখলাম। তাই বলে ভেবো না তুমি জিতে গেছ। দু'দিন সময় দিয়েছেন আমাকে মি. নাকামুরা। ভালই হলো, সময়টা বেশ উপভোগ্য হবে। আপাতত বিশ্রাম নাও, শক্তি সঞ্চয় করো। পরের আলাপটা অন্য কায়দায় হবে। কৃত্রিম পদ্ধতিতে দেয়া ব্যথা যেহেতু তোমাকে টলাতে পারছে না, এরপর সত্যিকার ব্যথার দিকে যাব। দেখব, সত্যি সত্যি যখন তোমার হাত-পা গুঁড়ো করা হবে, কেটে নেয়া হবে ঠোঁট-কান-আঙুল... কতটা সইতে পারো। এবারের সেশনের চেয়ে ওটা একেবারেই ভিন্ন হবে, গ্যারান্টি দিচ্ছি। গুড বাই।'

রানার শরীর থেকে সবগুলো সুঁই খুলে নিল ড্রাগো। পাউচে ভরে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। দুই প্রহরী ফিরে এল। বাঁধন খুলে রানাকে নামিয়ে আনল টেবিল থেকে। ধরাধরি করে নিয়ে গেল পুরনো প্রকোষ্ঠে। শুইয়ে দিল মেঝেতে। একটা থালায় শুকনো রুটি আর তরকারি দেয়া হলো খাওয়ার জন্য, সেই সঙ্গে এক গামলা পানি। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্য ঢাকনাঅলা একটা বালতিও দেয়া হয়েছে। এরপর বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

প্রায় এক ঘণ্টা মেঝেতে পড়ে রইল রানা, ধীরে ধীরে সুস্থ

হয়ে উঠছে। শক্তি ফিরে এলে উঠে বসল। খাবারের দিকে তাকাতেই মোচড় দিল পেট। কিন্তু হাত বাড়াল না। সন্দেহ করছে খাবার আর পানিতে ড্রাগ মেশানো হয়েছে। জোর করে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল। ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করল পরিস্থিতি। ইন্টারোগেশনের প্রথম পর্বটা ভালমতই সামাল দেয়া গেছে। কিন্তু এরপর? দ্বিতীয় দফায় আরও ভয়াবহ নির্যাতন করা হবে... জন্মের মত পঙ্গু করে দেয়া হবে ওকে। তার আগেই পালানো দরকার।

কীভাবে?

প্রকোষ্ঠের ভিতরে আবার নজর বোলাল রানা। কংক্রিটের রুম, বন্ধ স্টিলের দরজা। দরজার উপরে ভেন্টিলেশনের জন্য একটা ছোট ফোকর আছে—আট ইঞ্চি বাই বারো ইঞ্চি। মরচে পরা সরু গ্রিল দিয়ে ঢাকা ওটা। মাথার উপরে জ্বলতে থাকা লাইটের তার এসেছে ছাতের সঙ্গে লাগানো কণ্ডুইটের মাধ্যমে। হাত খালি। থাকার মধ্যে আছে স্রেফ খাবারের থালা, পানির গামলা আর ঢাকনাঅলা বালতিটা। এসব ব্যবহার করে পালানো কি আদৌ সম্ভব?

আনমনে মাথা নাড়ল রানা।

কামরাটা সম্ভবত স্টোররুম হিসেবে তৈরি করা। আসার পথে হলওয়েতে একই রকম আরও আট-দশটা দরজা দেখেছে ও। ধারণা করছে জায়গাটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড কোনও ওয়্যারহাউস। বন্দিশালা হিসেবে তৈরি করা না হলেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভাল মানিয়ে গেছে। হতাশা বোধ করল রানা, ড্রাগোর সঙ্গে দ্বিতীয় মোলাকাতটা বুঝি এড়ানো গেল না!

উনিশ

অফিসের জানালা দিয়ে পাহাড়ের ন্যাড়া ঢাল দেখতে পাচ্ছে নাকামুরা। পাহাড়ি লোকেরা এমন ঢালে চাষাবাদ করে... কিন্তু সামনের ওই পাহাড়ে যা করা হচ্ছে, সেটা চাষাবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। রোপণ করা হচ্ছে না কোনও কিছু, বরং অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে পাহাড়ের দেহ ক্ষতবিক্ষত করে খোঁজা হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু। গোল্ড মাইনিঙের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে স্ট্রিপ মাইনিং সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক। ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে পাহাড়ের পুরো কাঠামো—মাটি-পাথরের আবরণ সরিয়ে ফেলে উন্মুক্ত করা হচ্ছে তলায় লুকিয়ে থাকা স্বর্ণসমৃদ্ধ আকরিক। খুঁড়ে তোলা মাটির রঙ টকটকে লাল—আয়রন অক্সাইডে ভরা। মুমূর্ষু পাহাড়ের দেহ থেকে যেন রক্তের বিকল্প হিসেবে বেরুচ্ছে ওগুলো।

পানামা সরকারের সঙ্গে চুক্তিতে কড়া শর্ত দেয়া হয়েছিল, খননকাজের সময় পরিবেশের কোনও ক্ষতি করা চলবে না। তবে ওটা কাগজেই রয়ে গেছে। জায়গামত ঘুষ খাইয়ে প্রয়োজনীয় সরকারি লোকগুলোকে কিনে রেখেছে নাকামুরা, এখন তার কাজে তদারকির বা বাধা দেবার কেউ নেই। নিশ্চিতমনে চালিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসযজ্ঞ। প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছে না। বিপর্যয় কোথায়... চারপাশের ঘন জঙ্গল

একসময় ঠিকই ঢেকে দেবে ক্ষতটা। লাগুক না এক-দেড়শো বছর বা তারও বেশি!

আরও একটা শর্ত ছিল স্টেট-অভ-দ্য-আর্ট প্রসেসিং প্লান্ট স্থাপন করতে হবে—যাতে আকরিক থেকে স্বর্ণ আলাদা করবার কাজে ব্যবহৃত পারদ মাটিতে না পৌঁছায়। লোক দেখানো একটা প্লান্ট খাড়া করা হয়েছে সে-কারণে, তবে ভিতরে অত্যাধুনিক কোনও বন্দোবস্ত রাখা হয়নি। একই কথা খাটে চুক্তিতে উল্লিখিত রোলিং মিলের বেলায়। ওসবের কিছুই করেনি নাকামুরা। ঘুষ খাওয়াতে বরং অনেক কম টাকা খরচ হয়েছে তার।

টোয়েন্টি ডেভিলস্ মাইনে এ-মুহূর্তে কার্যকর যন্ত্রপাতি বলতে রয়েছে শুধু এক্সক্যাভেটর, ডাম্প ট্রাক আর বুলডোজারের বিশাল এক বাহিনী। জিয়োলজিকাল সার্ভে মোতাবেক সবচেয়ে সম্ভাবনাময় পাহাড়টাকে চারদিক থেকে গ্রাস করে চলেছে ওগুলো। সেই সার্ভে নিয়েও কম ঝামেলা পোহাতে হয়নি। ড্রিল ক্রু ভাড়া করে কয়েকশো কোর স্যাম্পল সংগ্রহ করতে হয়েছে। অসংখ্য শ্রমিক কাজে লাগাতে হয়েছে পাহাড়ের আশপাশে বয়ে চলা নদী আর ঝরনার তলা থেকে মাটি তুলে ছাঁকার জন্য। কনসাল্টিং জিয়োলজিস্ট আনতে হয়েছে ডেটা অ্যানালিসিসের জন্য। শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশিত রিপোর্টই দিয়েছে তারা—স্বর্ণের উল্লেখযোগ্য কোনও মজুত নেই এই এলাকায়। খবরটা ধামাচাপা দিয়ে ভুয়া আরেকটা রিপোর্ট তৈরি করতে হয়েছে, সেটা দেখিয়ে সরকারকে খুশি করা হয়েছে। ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য করবার জন্য চালু করতে হয়েছে মাইনিং অপারেশন, এখানকার অর্জনের প্রমাণস্বরূপ সরকারকে উপহার দেয়া হয়েছে সোনার এক বিশাল চালান। বলা হয়েছে সেই স্বর্ণ তোলা হয়েছে এখান থেকে। কিন্তু মূল উৎসটা যে কী, তা শুধু

নাকামুরাই জানে।

এতসব ঝামেলা এমনি এমনি পোহাচ্ছে না জাপানি টাইকুন। সবই তার মূল লক্ষ্যে পৌঁছুনোর পথে হিসেবি পদক্ষেপের অংশ। তা ছাড়া যথাসময়ে সমস্ত খরচাপাতি তুলে নেবার প্ল্যান রয়েছে তার, প্রথম সুযোগেই ভুয়া খনিটা বিক্রি করে দিয়ে সুদে-আসলে পুষিয়ে নেবে তার বিনিয়োগ।

অফিসটা এখানকার সুপারভাইজরের, খনি পরিদর্শনে এসে অস্থায়ীভাবে দখল করেছে নাকামুরা। চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে কাগজপত্র, রেফারেন্স বই আর রক স্যাম্পলের ক্রেট। খোলা জানালা দিয়ে বাইরে থেকে ভেসে আসছে ধুলোবালির গন্ধ। জানালার দিক থেকে মনোযোগ ফেরাল জাপানি টাইকুন। টেবিলের উল্টোপাশে, তার মুখোমুখি বসে আছে ড্রাগো। সুপারভাইজরের সেক্রেটারির দিয়ে যাওয়া কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে আয়েশ করে। সেক্রেটারি মেয়েটির মত এখানকার বেশিরভাগ লোকই নাকামুরার ডামি কর্পোরেশনে চাকরি করে। একদম নিচু লেভেলের শ্রমিক ছাড়া আর কোনও পানামানিয়ান নেই প্রজেক্টে।

'ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না,' ড্রাগোকে উদ্দেশ করে বলল নাকামুরা। 'সুঁই দিয়ে কাজ হয়নি... রেগুলার টর্চারে লোকটা মচকাবে, সে-গ্যারান্টি কোথায়?'

কফির কাপের উপর দিয়ে শীতল চোখে তাকাল ড্রাগো। 'গ্যারান্টিটা আমি দিচ্ছি।'

'বুঝে-শুনে দিচ্ছ তো? আমি চাই না পেটের মধ্যে সমস্ত গোমর নিয়ে লোকটা পটল তুলুক।'

কাপ নামিয়ে রাখল ড্রাগো। 'সুঁইয়ের কাজ শেখার আগে আমি ট্র্যাডিশনাল পদ্ধতিতেই কথা আদায় করতাম। রিল্যাক্স, মি. নাকামুরা। এই লাইনের সেরা লোকের সঙ্গে কথা বলছেন

আপনি। রানার সহ্যশক্তি কতখানি, তা আমার জানা হয়ে গেছে। ভুল করে মেরে ফেলব না। বরং পেট থেকে বের করে নেব সবকিছু।'

'তা হলে তো ভালই।'

আউটার অফিসে ফোন বেজে উঠল। কয়েক সেকেণ্ড পর ইণ্টারকমে ভেসে এল সেক্রেটারির গলা। 'আপনার ফোন, স্যর। মিস ইয়োশিদা।'

ওদিককার কাজকর্ম দেখবার জন্য ইরিকে পানামা সিটিতে রেখে এসেছে নাকামুরা, রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল। 'ইয়েস?'

'অটো-ক্যারিয়ারে ক্যানাল অথোরিটির ইনভেস্টিগেশন শেষ হয়েছে,' ওপাশ থেকে জানাল ইরি। 'রিপোর্ট এখনও জমা দেয়া হয়নি, তবে ওটাতে বলা হয়েছে জাহাজ হাইজ্যাক করবার জন্য হামলা চালিয়েছিল একদল জলদস্যু; ব্ল্যাক মার্কেটে বিক্রি করার জন্য গাড়িগুলো হাত করতে চেয়েছিল ওরা। আইডিয়াটা আমরাই দিয়েছিলাম।'

'গুড,' সন্তুষ্টির হাসি ফুটল নাকামুরার ঠোঁটে। ক্যানাল অথোরিটির ডিরেক্টরকে মোটা টাকার বিনিময়ে কিনে নেবার সুফল পাওয়া গেছে। 'সরকার কী বলছে?'

'ক্যানাল অথোরিটির বক্তব্য মেনে নিয়েছে। রিপোর্ট হাতে পাবার পর অফিশিয়াল স্টেটমেণ্ট দেয়া হবে। শুনলাম ভবিষ্যতে এ-ধরনের ঘটনা এড়াবার জন্য জাহাজগুলোয় সৈন্য মোতায়েন করা যায় কি না, সে-ব্যাপারে চিন্তাভাবনা চলছে।'

'হুম,' একটু চিন্তা করল নাকামুরা, সিদ্ধান্তটা বাস্তবায়িত হলে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে তার। তবে তেমন কিছু দেখতে পেল না। প্রজেক্টের শেষ পর্যায়ে তার জাহাজে দু'চারজন বোকা পানামানিয়ান সৈনিকের উপস্থিতিতে কিছু যাবে-আসবে না। 'অসুবিধে নেই। লেকের খবর বলো।'

'কাজ আবার শুরু হয়েছে। আপনার কথামত বাড়তি লোক পাঠিয়েছি পেরিমিটার সিকিউরিটি বাড়াবার জন্য।' একটু ইতস্তত করল ইরি। 'ইয়ে... আমাদের বোধহয় আরও লোক ভাড়া করা দরকার। এতদিক সামলাতে একটু সমস্যাই হয়ে যাচ্ছে...'

'অসম্ভব,' এক কথায় ওকে মানা করে দিল নাকামুরা। 'যত বেশি লোক, তত বেশি ঝামেলা। ভাড়াটে লোকের উপর পুরোপুরি বিশ্বাসও রাখা যায় না। পারলে বর্তমান টিম থেকেই কিছু ছাঁটাই করে দিতাম।'

'ঠিক আছে, স্যর।'

'আমাদের এখানে ইন্টারোগেশন চলছে। খুব শীঘ্রি জেনে যাব আমাদের পিছনে কারা লেগেছে এবং তাদের উদ্দেশ্য কী। তারপরে ভেবে দেখব কোথায় কতজন ডিপ্লয় করলে ভাল হয়।'

'সরকারের উপরমহলের কারও সঙ্গে কথা বলবেন, লেকে কিছু পানামানিয়ান সৈনিক পাঠানো যায় কি না? সাইটটাকে বৈধ কোনও এক্সপিডিশন হিসেবে দেখাতে পারলে রি-ইনফোর্সমেন্ট পাওয়া যাবে। আমাদের কিছু লোক কমিয়ে তা হলে অন্য জায়গায় পাঠানো যাবে।'

'ভাল আইডিয়া। কিন্তু লেকে নয়, এখানকার জন্য রি-ইনফোর্সমেন্ট চাইব। লেকে বাইরের লোক নেয়া ঝুঁকিপূর্ণ। আর কিছু?'

'ইয়ে, হ্যাঁ... জেমিনি...' গলার স্বর খাদে নামিয়ে কোড ওয়ার্ডটা উচ্চারণ করল ইরি। 'সবকিছু লোড করা হয়েছে। ওরা স্ট্যাণ্ডবাই থাকছে পরবর্তী নির্দেশের জন্য।'

'বুঝতে পেরেছি। এ-নিয়ে ওপেন লাইনে আলোচনার প্রয়োজন নেই। আমি খুব শীঘ্রি পানামা সিটিতে ফিরছি। তখন কথা বলব।'

'ইয়েস, স্যর।'

রিসিভার নামিয়ে ড্রাগোর দিকে ফিরল নাকামুরা। স্থির চোখে তাকে যাচাই করছে লোকটা, যেন বুঝতে চাইছে ওর দুর্বলতা কোথায়। জাত-ইন্টারোগেটরের স্বভাব। দৃষ্টিটা পছন্দ হলো না নাকামুরার। খেঁকিয়ে উঠে বলল, 'এখনও বসে আছ কেন? ফোনে কী কথা হলো, শোনোনি? রানার কাছ থেকে ইনফরমেশনগুলো যত দ্রুত সম্ভব চাই।'

'সুঁইয়ের ধকল কাটাবার জন্য সময় দিচ্ছি ওকে,' শান্ত গলায় বলল ড্রাগো। 'একটু সুস্থ হয়ে না উঠলে টর্চার চালিয়ে লাভ হবে না।' ঘড়ি দেখল। 'এই ধরুন... চার ঘণ্টা। তারপর আবার শুরু করব।'

কাঁধ ঝাঁকাল নাকামুরা। মাথা ধরেছে তার। ইন্টারকমের বোতাম টিপে বলল, 'অ্যাই, আমার জন্যেও এক কাপ কফি নিয়ে এসো।'

দরজার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানা। ঝড়ের বেগে চলছে মগজ। নবটার উপর মনোযোগ। বন্দিশালার প্রকোষ্ঠ নয়, তাই দরজাটার বাইরে কোনও ছিটকিনি নেই... নেই আলগা তালা লাগাবার ব্যবস্থা। হলওয়েতে থাকতেই লক্ষ করেছে সেটা। তালা রয়েছে শুধু নবে। বাইরে থেকে ওটাই লাগিয়ে আটকানো হয়েছে ওকে। কোনোভাবে খোলা যায় না?

কী দিয়ে খুলবে? ঘরের ভিতরে আবারও নজর বোলাল। খাবারের পাত্র আর বালতি ছাড়া কিছু নেই। চামচ-টামচও দেয়া হয়নি যে সেটা ব্যবহার করবে। হঠাৎ বালতিটার দিকে চোখ পড়তেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল দৃষ্টি। কাছে টেনে ঢাকনাটা খুলে ফেলল। আলগা ঢাকনা, বিশেষত্বহীন। ওটা হাতে নিয়ে দরজার উপরের ভেন্টিলেটরের দিকে চাইল। একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়, কিন্তু সেটা কাজে লাগাবার আগে বোঝা দরকার, বাইরে প্রহরী

রাখা হয়েছে কি না।

উঠে দরজার পাশে চলে গেল রানা। হাত মুঠো করে কিল মারল পাল্লায়। একবার, দু'বার, তিনবার। কেউ সাড়া দিল না ওপাশ থেকে। খানিক অপেক্ষা করে আবার কিল মারল, চেঁচিয়ে ডাকল, 'কেউ আছ? দরজা খোলো!'

এবারও নীরবতা। মনে হচ্ছে বাইরে প্রহরী রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি নাকামুরা বা ড্রাগো। ভেবেছে প্রথম দফা নির্যাতনে যথেষ্ট কাহিল করা গেছে ওকে, পালাবার শক্তি আর অবশিষ্ট নেই। নিঃশব্দে হাসল রানা। কত বড় ভুল করেছে ওরা, সেটা টের পাইয়ে দেবে শীঘ্রি।

বালতিটা নিয়ে এসে দরজার সামনে উপুড় করে রাখল ও। উঠে পড়ল ওটার উপরে। হাতের নাগালে চলে এল ভেন্টিলেটর। গ্রিলের ফাঁকে খাড়া করে ঢুকিয়ে দিল ঢাকনাটা, চাড় দিতে থাকল পাশ থেকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হার মানল মরচে পড়া শিক। প্রথমে বাঁকা হলো, তারপর চাপের মুখে খুলে এল গোড়া থেকে। মৃদু শব্দ তুলে আছড়ে পড়ল মেঝেতে।

একটু অপেক্ষা করল রানা ওপাশে কিছু শোনা যায় কি না বোঝার জন্য। হতে পারে প্রহরী আছে, ঘাপটি মেরে বসে আছে ওর পলায়ন-চেষ্টা নস্যাৎ করে দেবার জন্য। কিন্তু কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেলেও তেমন কোনও আলামত দেখা গেল না।

কামরার ভিতরেই লাইটের সুইচ রয়েছে, এবার ওটা টিপে আলো নিভিয়ে দিল রানা। নিকষ অন্ধকারে ডুবে গেল ঘর, কিন্তু তাতে অসুবিধা নেই। কোথায় কী আছে দেখে নিয়েছে আগেই। বালতি নিয়ে চলে গেল কামরার মাঝখানে। আবারও ওটাকে উপুড় করে উপরে উঠে পড়ল। নাগালে পাওয়া বালবটা খুলে নিল সাবধানে। এরপর হ্যাঁচকা টানে বালব হোল্ডারটা ছিঁড়ে ফেলল গোড়া থেকে। বিদ্যুৎবাহী তার উন্মুক্ত হয়ে পড়ল, ভবে

সুইচ বন্ধ করে দেয়ায় শক খাওয়ার ভয় নেই।

ইলেকট্রিক্যাল কণ্ড্যুইটটা আসলে একটা লোহার পাইপ। কামরার ছাত ধরে পিছনের দেয়াল থেকে মাঝ পর্যন্ত এসেছে। ক্ল্যাম্পের সাহায্যে আটকানো হয়েছে ছাতের গায়ে। কোনোমতে পাইপটার মুখে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে টানতে শুরু করল রানা, চাপিয়ে দিল শরীরের পুরো ওজন। খানিক পরেই হার মানল ক্ল্যাম্পগুলো, খুলে এল ছাতের গা থেকে। পাইপটাও খসে পড়ল নীচে।

ফের কয়েক মুহূর্তের সতর্কতা অবলম্বন করল রানা। অবশ্য তার প্রয়োজন ছিল না। ভিতরের আওয়াজ শুনবার জন্য বাইরে নেই কেউ। নিশ্চিন্ত হয়ে পাইপটা তুলে নিল ও। দরজার পাশে গিয়ে ওটা তুলে সজোরে বাড়ি দিল নবে। দুই আঘাতেই ভেঙেচুরে খুলে পড়ল এপাশের নব। গ্রিলের টুকরোটা কোমরে গোঁজা আছে, ওটা হাতে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। ভাঙা নবের ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে পরখ করল লকিং মেকানিজমের খুঁটিনাটি। সন্তুষ্ট হয়ে এবার ফোকরে ঢোকাল গ্রিলের টুকরোটা। সেটা নিয়ে কয়েক মিনিট গুঁতোগুঁতি করতেই খুট করে একটা আওয়াজ হলো। আস্তে আস্তে ফাঁক হয়ে গেল পাল্লা।

সাবধানে বাইরে চোখ রাখল রানা। শূন্য হলওয়ে। দৃষ্টিসীমায় কেউ নেই। বেরুবার আগে সামান্য দ্বিধা করল ও। গায়ে জামাকাপড় নেই, অস্ত্র বলতে শুধু পাইপ আর গ্রিলের সরু শিক। কী অপেক্ষা করছে সামনে কে জানে! কোথায় বন্দি করা হয়েছে ওকে তা-ও জানে না। নিশ্চয়ই নাকামুরার দুর্ভেদ্য কোনও ঘাঁটি... সবখানে তার লোকজন ঘোরাফেরা করছে। তাদের সামনে পড়লে লড়বার মত কিছুই নেই।

তাই বলে বসে থাকাও চলে না। যা থাকে কপালে ভেবে কামরা থেকে বেরিয়ে পড়ল রানা। শিকটা গুঁজল বক্সারের

ইলাস্টিকে, আর পাইপটা মুগুরের মত রাখল কাঁধে। প্রায়-উলঙ্গ অবস্থায়, যেন কোনও আদিম মানুষ, ছোট ছোট কদম ফেলে ছুটতে শুরু করল ও।

মার্কোস পেরেইরার বাসায়... ডাইনিং টেবিলে চুপচাপ বসে আছে ওরা তিনজন। সোহেল, নেফারতিতি আর মার্কোস। কেউ কোনও কথা বলছে না। কাছেই, মেঝেতে বসে মার্কোসের দুই ছেলের সঙ্গে খেলছে পিন্টো, মাঝে মাঝে বিস্মিত চোখে তাকাচ্ছে টেবিলে বসা তিনজনের দিকে, বুঝতে পারছে না সবাই এত মন খারাপ করে আছে কেন। ওর জানা নেই, এর কারণ একটিমাত্র ফোন কল। ওটাই ধূলিসাৎ করে দিয়েছে রানাকে উদ্ধারের সমস্ত আশা।

অথচ এর আগ পর্যন্ত অঁবিন আর মেজর পিনোঁকে নিয়ে পরিকল্পনা সাজানোয় ব্যস্ত ছিল ওরা—ছক কাটছিল টোয়েন্টি ডেভিলস মাইনে হানা দেবার... ওখান থেকে রানাকে বের করে আনবার। সব যখন প্রায় ঠিকঠাক, তখুনি বেজে উঠল অঁবিনের সেলফোন। ফ্রেঞ্চ এম্বাসির অপারেটর তাকে মিলিয়ে দিল সরাসরি ফরাসি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে।

কয়েক মিনিট কথা বলল অঁবিন। তারপর লাইন কেটে দিয়ে সবার উদ্দেশে বলল, 'যা ভেবেছিলাম তা-ই। হারানো ইউরেনিয়ামের খোঁজ পাওয়া গেছে। হারায়নি আসলে। আমাদের ইনভেস্টিগেটররা জাপানের লোডিং ফ্যাসিলিটিতে তদন্ত করে জেনেছে, পুরোটাই অনিচ্ছাকৃত ভুল। ওজন মাপার যন্ত্রে ঠিকমত ক্যালিব্রেশন করা ছিল না, তাই পাঁচশো পাউণ্ড বাড়তি ওজন রেকর্ড হয়েছে। ভুলটা শুধরে দেয়া হয়েছে এখন।'

'এখন তা হলে কী?' জিজ্ঞেস করেছিল সোহেল।

'এখন আর কিছু না। অফিশিয়ালি এই মিশনের টার্মিনেশন

অর্ডার দেয়া হয়েছে আমাকে। সবাইকে রিকলও করা হয়েছে। আমাকে প্যারিসে ফিরে যেতে হবে... আর লিজনেয়ার টিমকে এরিয়ান স্পেসপোর্টে।'

'আর রানা?'

'আমি দুঃখিত,' নীরস গলায় বলল অঁবিন। গলায় আন্তরিকতার ছিটেফোঁটাও নেই। 'ওই খনিতে যেতে রাজি হয়েছিলাম শুধুমাত্র ইউরেনিয়াম লুকানো থাকতে পেরে ভেবে। তেমন সম্ভাবনা এখন আর যেহেতু নেই...'

'তারমানে আপনারা সাহায্য করবেন না?' শঙ্কিত গলায় জিজ্ঞেস করল নেফারতিতি। জানে, ফরাসি টিমটাকে ছাড়া রানাকে উদ্ধার করা ওদের পক্ষে অসম্ভব।

'অফিশিয়াল আদেশ অমান্য করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে,' চাঁছাছোলা গলায় বলে দিল অঁবিন। এই একটা কথা দিয়েই রানার ভাগ্য নির্ধারণ করে দিল যেন।

'মেজর পিনোঁ?' সমর্থনের আশায় লিজনেয়ার কমাণ্ডারের দিকে ফিরল নেফারতিতি।

জবাব না দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল পিনোঁ।

এরপর আর কোনও কথা চলে না। ঝড়ের বেগে সেফহাউস থেকে বেরিয়ে এসেছিল ওরা। ফিরে এসেছে মার্কোসের বাড়িতে। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় কোনও সমাধান খুঁজে পায়নি সমস্যার। নাকামুরার খনিতে হানা দিতে হলে লোকবল ও অস্ত্র প্রয়োজন, কোনোটাই ওদের নেই। একটু সময় পেলে সোহেলের পক্ষে লোক জোগাড় করা সম্ভব—খবর দিলেই রানা এজেন্সির ছেলেরা পাগলের মত ছুটে আসবে... সমস্যা হলো অত সময় নেই হাতে। অন্তত আটচল্লিশ ঘণ্টা লাগবে পানামায় রানা এজেন্সির টিম পৌঁছুতে, ততক্ষণ রানার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ। স্থানীয় লোক ভাড়া করবার কথাও ভেবেছিল... কিন্তু

পানামায় বিশ্বস্ত তেমন কাউকে চেনে না সোহেল; হুয়ান মারা যাওয়ায় নেফিও হারিয়েছে ওর আণ্ডারওয়ার্ল্ড কণ্ট্যাক্ট। সব মিলিয়ে বেশ হতাশাজনক একটা পরিস্থিতি।

রাত দশটা বাজে। নানা রকম আলোচনায় কোনও পথ খুঁজে না পেয়ে ঝিম মেরে বসে আছে তিনজনে। আর কোনও কথা বলছে না। রানার দুশ্চিন্তায় মন আচ্ছন্ন... বিশেষ করে সোহেল আর নেফির। ঠিকমত কিছু চিন্তা করতে পারছে না দুজনে।

হঠাৎ কলিং বেল বেজে ওঠায় সংবিৎ ফিরে পেল ওরা। মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

'কারও আসার কথা?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

মাথা নাড়ল মার্কোস। 'না তো।'

ভিতরের কামরা থেকে বেরিয়ে এল মার্কোসের স্ত্রী মারিনা। 'এত রাতে আবার কে এল?' বলে দরজা খুলল সে। কয়েক মুহূর্ত পর ডাকল, 'অ্যাই, মার্কোস... এরা তোমাদের কাছে এসেছে।'

টেবিল ছেড়ে উঠে এল মার্কোস, সোহেল আর নেফারতিতি। দরজায় গিয়ে চমকে উঠল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি আর কেউ নয়, মেজর পিনোঁ। পিছনে দাঁড়িয়ে আছে তার চারজন সৈনিক।

'আপনারা?' সবিস্ময়ে বলে উঠল নেফারতিতি।

'মসিয়ো অঁবিন জানতে পারলে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দেবে,' অপ্রতিভ গলায় বলল পিনোঁ, 'কিন্তু না এসে পারলাম না। আমার আর কনরাডের জীবন বাঁচিয়েছেন মসিয়ো রানা, তাঁকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ফেলে গেলে বিবেকের কাছে চিরকাল অপরাধী হয়ে থাকব।'

কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল সবাই, কিংকর্তব্য ঠিক করতে পারছে না। তারপরেই ছোট্ট একটা চিৎকার দিয়ে

পিনোঁকে জড়িয়ে ধরল নেফারতিতি।

সোহেলও হাসছে। 'ব্যাপারটা আরও আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিল। অঁবিনের ব্যাপার ভিন্ন... কিন্তু একজন সত্যিকার সৈনিক কখনও সহযোদ্ধাকে যুদ্ধের ময়দানে ত্যাগ করতে পারে না। আমারই দেখছি লোক চিনতে ভুল হয়ে গেছে।'

'বাইরে কেন?' বলে উঠল মার্কোস। 'ভিতরে আসুন। প্লিজ।'

'না, আসব না,' বলল পিনোঁ। 'হাতে সময় কম। য়া করবার আজ রাতেই করতে হবে। প্ল্যান তো আগেই ঠিক করা আছে, গাড়িও আছে আমাদের সঙ্গে। চলুন বেরিয়ে পড়ি।'

'ম্যান অভ অ্যাকশন!' বলল সোহেল। 'এমন লোকই তো চাই। চলুন তা হলে। বাঘের গুহায় হানা দিয়ে দেখা যাক রানাকে মুক্ত করে আনা যায় কি না।'

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

জাপানি টাইকুন

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

টোয়েন্টি ডেভিলস্ মাইনে পা রাখতেই ফাঁদে পড়ল
সোহেল, নেফারতিতি ও ফ্রেঞ্চ লিজনের সৈন্যরা।
রানাকে উদ্ধার করবে কী, নিজেদেরই প্রাণ নিয়ে টানাটানি।
সেখান থেকে বাঁচলেও কি রেহাই আছে?
অপেক্ষা করছে নিত্যনতুন বিপদ।
ধীরে-ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে কেনজি নাকামুরার ভয়াল পরিকল্পনা।
সাহায্য পাবার উপায় নেই। পানামার প্রশাসনকে
টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে ধুরন্ধর জাপানি টাইকুন।
রানার পিছনে লাগিয়ে দিয়েছে তার পোষা খুনে বাহিনী
এখন কী করা?
শেষ পর্যন্ত একাই মাঠে নামল রানা ও তার সঙ্গীরা।
পানামা ক্যানালের বুকে বেধে গেল ভয়াবহ সংঘাত।
আর ইনকাদের হারানো ট্রেজার?
সেটারই বা কী খবর?

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।
বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।
আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।
ই-মেইল যোগাযোগ: alochonabibhag@gmail.com

আনিস-উজ-জামান, মোবা: ০১৭৭২-৬৮৬২০২
২৯২ উত্তর গোড়ান, সিপাইবাগ, ঢাকা ১২১৯।

চিঠির শুরুতেই হলুদ গোলাপ, রজনীগন্ধা, শীতের খেজুরের রসের শুভেচ্ছা জানালাম। মাসুদ রানা সিরিজের নতুন বই 'মৃত্যুদ্বীপ' পড়লাম। কী বলব? এক কথায় 'অসাম'! এ ছাড়া সিরিজের অচেনা বন্দর, দংশন, অগ্নিপুরুষ, মুক্ত বিহঙ্গ পড়লাম। এ বইগুলোও অসাধারণ। কাজীদা, বইগুলোর ব্যাপারে আমার অভিযোগ ও কিছু কষ্ট রয়েছে। জানি, মানুষ মরণশীল, প্রতিটি মানুষের অনিবার্য পরিণতি মৃত্যু। তবু এ বইগুলোতে মাসুদ রানার বন্ধু ও কাছের মানুষগুলোকে মেরে ফেলাতে অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছি। ভয় হয়, কোন্‌দিন না আবার দেখি আমার প্রিয় চরিত্র সোহানা, রূপা, তিশা, সোহেল, গিলটি মিয়া, গগল–এরাও মাসুদ রানার অন্যান্য বন্ধুদের মত...

❋ আপনার কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। যদিও জানি, এটা করলে পাঠকরা তেড়ে এসে আমার অনিবার্য পরিণতি নিশ্চিত করবে।

ফরহাদ
রামপুরা, ঢাকা ১২১৯।

সাইবেরিয়ার বরফ ঢাকা প্রান্তরে প্রাণপণ লড়াই শেষে পনেরো তলা ভবন থেকে লাফিয়ে পড়ে, কঙ্গোর মাউন্ট স্ট্যানলির কয়লার খনিতে রক্তপিশাচ বাবাম্বা ও বাউন্টি হান্টারদের সাথে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে, ভূমধ্যসাগরের উপর হারকিউলিস বিমানের পেট থেকে পড়ে গিয়ে, দ্য গ্রেট

ওশান রোডে রুদ্ধশ্বাস কার রেস ও ফাইটের পরে এবং ফ্রেঞ্চ এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ধ্বংসের পরে, ইংলিশ চ্যানেলে এমভি লোটাসে পৃথিবীকে বাঁচাতে লড়ে এবং তা প্রায় মাথার উপর ধ্বংস হবার পরে, সুয়েজ এবং সৌদি আকাশে শত বাধা সত্ত্বেও মানুষদের বাঁচাতে নাকের কাছে নিউক্লিয়ার মিসাইলের সাথে লড়াই করেও বেঁচে আছি! এ কি স্বপ্ন? নাকি সত্যি?

কাজীদা, 'বাউন্টি হান্টার্স' পড়ার সময় মনে হয়েছে—রানা নয়, আমিই বুঝি লড়ছি! সে ঘোর এখনও কাটেনি। অনন্যসাধারণ রানার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কুয়াশাকে পেয়ে আরও ভাল লাগল। আর তিশাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ধন্যবাদ। সুন্দর প্রচ্ছদের জন্য বিপ্লবদা'কে ধন্যবাদ। 'মৃত্যুদ্বীপ'-এর অপেক্ষায়, ভাল থাকুন সব সময়।

❋ আপনিও ভাল থাকুন। বিপ্লবদা'কে আপনার ধন্যবাদ জানিয়ে দিলাম। মৃত্যুদ্বীপ কেমন লাগল জানাবেন।

সামির শিরাণী রাইন, সদর হাসপাতাল কোয়ার্টার,
রংধনু, ২য় তলা, হাসপাতাল রোড, সদর, লক্ষ্মীপুর।

প্রিয় কাজীদা,

আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? প্রথমেই একটা ঘটনা বলি। স্কুল থেকে বাসায় ফিরছি। রাস্তায় আমাদের বাসার উপরতলার আন্টির সাথে দেখা। বললেন, 'কী খবর, রাইন? ইদানীং প্রেম-ট্রেম করো নাকি?' আমি তো নির্ভেজাল ভালমানুষ, 'না, আন্টি। কী হইছে?' তিনি বললেন, 'ঘরে গিয়ে দেখো।'

মনে ভয়-ভয় একটা ভাব নিয়েই ঘরে ঢুকলাম। আম্মুকে বললাম, 'আম্মু, কী হইছে?' আম্মু বললেন, 'তোর নামে চিঠি আসছে। যা, খুলে দেখ।' খুলে দেখলাম ভিতরে আপনার অটোগ্রাফসহ ফটোগ্রাফ। দুই মিনিট থ হয়ে রইলাম। তারপর এক লাফ। আম্মু বললেন, 'এই, তোর কী হইছে? থাম, লাফালাফি থামা।' আমি তো লাফিয়েই চলেছি। বললাম, 'আম্মু, আমি কী পাইছি জানো?' আম্মু বললেন, 'কী পাইছস?' আমি বললাম, 'আরে আম্মু, সোনার হরিণ পাইছি, সোনার হরিণ।' তার পরদিন অটোগ্রাফ আর ফটোগ্রাফটি দেখিয়ে স্কুলের সবাইকে ঈর্ষান্বিত করতে খুব মজা লাগছিল। সব রানা ভক্তকে একদম চমকে দিয়েছিলাম।

যাই হোক, এতদিন লিখতে পারিনি বলে দুঃখিত। আপনি আবার ভাববেন না, অটোগ্রাফ নিয়ে আমি চম্পট দিয়েছি। আর হ্যাঁ, আরেকটা বিষয়—লক্ষ্মীপুর শহরে একমাত্র টাউন লাইব্রেরি ছাড়া অন্য কোনও লাইব্রেরিতে সেবার বই আসে না। গত দুই-তিনমাস ধরে টাউন লাইব্রেরিতেও বই আসছে না। আশা করি, সমস্যাটার সমাধান করবেন।

※ সমস্যার সমাধান আমাদের নয়, লাইব্রেরিয়ানদের হাতে। তাঁরা চাইলেই আমরা বই পাঠাই, না চাইলে পাঠাবার নিয়ম নেই। অটোগ্রাফ পেয়ে তুমি খুব খুশি হয়েছ জেনে আমিও খুশি হলাম। শুভাশিস রইল।

এ.বি.এম. তামিম, আসমা ভবন, ৪র্থ তলা,
সৈয়দ শাহ রোড, কে.বি. আমান আলী রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম।

কাজীদা,

কেমন আছেন? এইমাত্র 'ক্লাইম্বার' পড়ে শেষ করলাম। খুব ভাল লেগেছে, মাসুদ রানাকে দেশে-বিদেশে ঘুরতে দেননি। সত্যিই খুব ভাল লেগেছে বইটি। আচ্ছা কাজীদা, আপনার স্ত্রী কঁয়জন? যেহেতু 'টার্গেট নাইনে' জো-র কথাগুলো খুব যুক্তি দিয়ে বোঝানো হয়েছে। তাই বললাম আরকী! ক্লাইম্বারের ২৩ নম্বর পৃষ্ঠায় নীচে...'এরপর তিনজনে মেতে উঠল আড্ডায়'—এখানে তিনজনের স্থলে চারজনে হবে মনে হয়, জানাবেন। আর নঈমদাকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন, তাঁর 'নিশানা' অনেক-অনেক ভাল লেগেছে। নঈমদাকে এ ধরনের আরও বইয়ের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আচ্ছা কাজীদা, রানার কাছ থেকে অনেক শিখলাম, এবার এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করে দিন। আমাকে না হয় এ ধরনের কোনও এজেন্সিতে ভর্তি করে দিন...আপনার উত্তরের অপেক্ষায় থাকব। উত্তর না আসা পর্যন্ত আমাকে অনিদ্রা রোগে আক্রমণ করবে।

রানাকে নিয়ে আবার চট্টগ্রামে আসার অনুরোধ জানিয়ে, সেবা'র সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মত বিদায়, দোয়া করবেন। খোদা হাফেজ।

※ আমিও জো-র যুক্তি মানি কি না জানতে চাইছেন? ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তর কেন দেব? ...ক্লাইম্বারের ২৩ পৃষ্ঠায় ওটা সত্যিই আমাদের ভুল—চার জনই হবে। ...নঈমদাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে দিলাম। ...দোয়া রইল।

এস. এম. মাহবুব আলম, মোবা: ০১৮২৪-৬৬৬৫৭২
গ্রাম: দরগারবন্দ, পোস্ট: দুলালপুর, থানা: শিবপুর, জেলা: নরসিংদী।

নীলক্ষেতে 'চারিদিকে শত্রু' বইটির খোঁজ করছিলাম। পেয়েও গেলাম এক দোকানদারের কাছে। কিন্তু চারিদিকে শত্রু বইটির দুটি খণ্ডই ছিল পুরানো। কিন্তু আমি নতুন বইয়ের খোঁজ করায় দোকানদার আমাকে বলল যে, রিপ্রিন্ট বইগুলোতে নাকি কাহিনি সংক্ষেপ করা হয়। অর্থাৎ, কাহিনি সংক্ষেপ করে রিপ্রিন্ট করা হয়। আপনি কী বলেন?

※ কথাটা ঠিক নয়। দাম-কম রাখার জন্য ছোট টাইপে ছাপা হয়, সেজন্য বই ছোট দেখায়। তাই তিনি মনে করেছেন কাহিনিই সংক্ষেপ করা হয়েছে বুঝি

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে বাকি টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজার বরাবর লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।** বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ভি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ৫০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪-৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছুলেই বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

১/১২/১৪ অদেখা ভুবনের সে+প্যালেস থিয়েটার-রহস্য+সময়ের চাবি-রহস্য (তিন গোয়েন্দা ভলিউম-১৩৩) শামসুদ্দীন নওয়াব

অদেখা ভুবনের সে/শামসুদ্দীন নওয়াবঃ তিন গোয়েন্দার বন্ধু মার্ক। তার মৃত যমজ ভাইয়ের প্রতিচ্ছবি হঠাৎ করে ফুটে উঠল আয়নায়। তারপর থেকে ঘটতে শুরু করল নানা ধরনের অঘটন। বন্ধুর বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল তিন গোয়েন্দা।

প্যালেস থিয়েটার-রহস্য/শামসুদ্দীন নওয়াবঃ প্যালেস থিয়েটার প্রাচীন এক স্থাপনা। কনসার্ট শুনতে ওখানে হাজির ছিল তিন গোয়েন্দা আর জিনা। হঠাৎ করে শুরু হলো ভূতের উপদ্রব। ফলে তদন্তে নামতে বাধ্য হলো ছেলে-মেয়েরা।

সময়ের চাবি-রহস্য/শামসুদ্দীন নওয়াবঃ সময়ের চাবির পাঁচটা টুকরো জোগাড় করতে পেরেছে কিশোর আর হিরু চাচা। এবার বেরিয়েছে ছ'নম্বর টুকরোটার খোঁজে। ওটা পেলেই পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে চাবিটা, নিরাপদ হবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। কিন্তু অশুভ শক্তিরও যে চাই ওটা। কাজেই চাচা-ভাতিজার সঙ্গে বেধে গেল দ্বন্দ্ব।

আরও আসছে

৮/১২/১৪ ঈশ্বরী (রোমাঞ্চ-হরর কাহিনি) তৌফির হাসান উর রাকিব

মাসুদ রানা

জাপানি টাইকুন

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্যারিসের এক অকশন হাউস থেকে পুরনো
এক ডায়েরি কিনেই মস্ত বিপদে পড়ল মাসুদ রানা।
সশস্ত্র তিনজন খুনি ধাওয়া করল ওকে,
কেড়ে নেবার চেষ্টা করল ডায়েরিটা। **কিন্তু কেন?**

পাঠক, এ-প্রশ্নের জবাব পাবার জন্য রানার সঙ্গে পানামার
গহীন জঙ্গলে ছুটে যেতে হবে আপনাকে, যেখানে রয়েছে
ছয়শো বছরের পুরনো ইনকা-গুপ্তধনের ভাণ্ডার।
ভয়ঙ্কর এক ষড়যন্ত্র চলছে সেই গুপ্তধনকে ঘিরে,
আর আড়াল থেকে তাতে কলকাঠি নাড়ছেন
প্রতিহিংসাপরায়ণ, অর্ধোন্মাদ এক জাপানি ধনকুবের।
ভাবছেন আবারও ট্রেজার হান্টের গল্প শোনাতে চলেছি?
উঁহুঁ, এ-কাহিনি তারচেয়ে অনেক... অনেক জটিল।
শুধু এটুকু জেনে রাখুন, এবারের অ্যাসাইনমেন্ট
রানার ক্যারিয়ারের কঠিনতম অ্যাসাইনমেন্টগুলোর একটি।
বিশ্বাস করুন।

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০